জঙ্গম

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়

বনফুল

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাড়ে চার টাকা

জঙ্গম

জঙ্গম

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

শিরীষবাবুর বাড়ির অন্তঃপুরে বসিয়া মুকুজ্জেমশাই, শিরীষবাবু এবং শিরীষবাবুর পত্নী সুশীলাসুন্দরী কথাবার্তা বলিতেছিলেন। সুশীলাসুন্দরী অবশ্য বিশেষ কোন কথাবার্তা বলিতেছিলেন না, তিনি একটু দূরে বসিয়া মাথায় আধ-ঘোমটা টানিয়া সুপারি কাটিতেছিলেন এবং ইঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। গুরুজনদের সম্মুখে অকারণে বাচালতা প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ এবং স্বভাবতই তিনি নীরবপ্রকৃতির। সব কিছু মন দিয়া শোনেন, কিন্তু বেশি কিছু বলেন না।

চিন্তিতমুখে শিরীষবাবু বলিলেন, আপনি যাবেন না, তা হ'লে কি ক'রে হবে? আমার পক্ষে একা—

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, হ'লেই বা একা, তারা তো বাঘ-ভালুক নয় যে, তুমি গেলেই টপ ক'রে খেয়ে ফেলবে। তুমি মেয়ের বাপ, তুমি না গেলে চলবে কেন?

শিরীষবাবু মুখটা উঁচু করিয়া চিবুকের তলাটা চুলকাইতে লাগিলেন। মুকুজ্জেমশাই সহাস্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ছেলেটিকে একবার দেখাও হবে, আর ভদ্রলোকের মনোভাবও খানিকটা বোঝা যাবে। চিঠিপত্রে তিনি খোলাখুলি কিছু বলতে চান না, সে তো দেখছ।

শিরীষবাবু চিবুক চুলকানো শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং জানালা দিয়া মাথাটা বাহির করিয়া সশব্দে নাকটা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। কোঁচা

দিয়া নাকটা মুছিতে মুছিতে বলিলেন, সর্দিও করেছে, ভাবছি, ট্রেনে আবার এক্সপোজার লাগবে। পরের শনিবারে গেলে কেমন হয়? রাজমহলে কদিন লাগবে আপনার?

আদালতের ব্যাপার তো, ঠিক বলা যায় না। সাক্ষী-কাক্ষিগুলোও সব ঠিক করতে হবে, তা ছাড়া, মনু হয়তো ছাড়তে চাইবে না, অনেক দিন যাই নি।

সুশীলাসুন্দরী চকিতে একবার মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া আবার সুপারি কুঁচানোতে মন দিলেন।

মনু অর্থাৎ মনোরমা নামক বিধবাটির সহিত মুকুজ্জেমশাইয়ের প্রকৃত সম্পর্কটা যে কি, কেহ তাহা জানে না। সম্পর্ক একটা নিশ্চয়ই আছে, কারণ মুকুজ্জেমশাই তাহার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। মনোরমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, খুব নিষ্ঠাবতী বিধবা। মুকুজ্জেমশাই যদিও তাঁহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন, কিন্তু কখনও নিকটে রাখেন না। নানা স্থানে মুকুজ্জেমশাইয়ের পরিচিত লোকের অভাব নাই, কাহারও না কাহারও পরিবারে মুকুজ্জেমশাই মনোরমাকে রাখিয়া দিয়া নিজে অন্যত্র চলিয়া যান। সাধারণত যে সকল পরিবার মুকুজ্জেমশাইয়ের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করে, সেই সব পরিবারেই মনুকে তিনি রাখিয়া থাকেন। সম্প্রতি মনোরমা রাজমহলে যে পরিবারে রহিয়াছে, সেই পরিবারের কর্তাটি জেলে গিয়াছেন, আপিসের টাকা ভাঙিয়াছেন—এই তাঁহার অপরাধ। মুকুজ্জেমশাইয়ের ধারণা—লোকটি নিরীহ, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। তিনি এই অপবাদ খণ্ডন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। উকিল ব্যারিস্টার দ্বারা যতটা করা সম্ভব সবই করিয়া দেখিবেন ঠিক করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি অমিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোথাও নড়িবেন না ঠিক করিয়াছিলেন; কিন্তু গতকল্য মনুর একখানি পত্র আসিয়াছে যে অন্তত দুই-একদিনের জন্য রাজমহলে আসা তাঁহার নিতান্ত দরকার, না

আসিলে মকদ্দমার ক্ষতি হইবে। সেই জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুকুজ্জেমশাইকে যাইতে হইতেছে।

শিরীষবাবু অকূল পাথারে পড়িয়া গিয়াছেন।

শিরীষবাবু মুখের উপর হাতটা একবার বুলাইয়া বলিলেন, আপনি ঘুরে আসুন, তারপর যাওয়া যাবে। এতদিন যখন গেছে, তখন দু-চার-দশ দিনে আর কি এমন এসে যাবে! তা ছাড়া, যতই তাড়াতাড়ি করুন, বোশেখের আগে তো আর বিয়ে হচ্ছে না।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, হাতে কি খুব বেশি সময় আছে মনে কর তুমি? তিরিশটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম, চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রে তো জন পনেরোকে বাতিল করা গেছে, কুষ্ঠির মিল জন-ছয়েকের সঙ্গে হ'ল না। বাকি আছে ন জন, এদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যতটা হবার হয়েছে, এইবার দেখাশোনা করা দরকার। সব কটিই সুপাত্র। ন জনের সঙ্গে দেখা করতে তোমার অন্তত ন সপ্তাহ লাগবে, তোমার তো শনি রবি ছাড়া ছুটি নেই।

শিরীষবাবুকে স্বীকার করিতে হইল, ছুটি নাই। কিন্তু তিনি অবুঝের মত বলিলেন, ন জনকেই দেখতে না হতে পারে। এই শঙ্কর ছেলেটিকেই আমাদের পছন্দ, শঙ্করের বাবা অম্বিকাবাবু আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও। সেজদার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কি যেন সম্পর্ক আছে ওঁদের। ওইখানেই হয়তো হয়ে যাবে। কুষ্ঠি অনুসারে তাই হওয়া উচিত।

ধর, যদি না হয়!

শিরীষবাবু অবশ্য ধরিতে রাজী নহেন, কিন্তু যুক্তির আবশ্যকতা অস্বীকার করা মুশকিল। ও-পথে না গিয়া সুতরাং তিনি বলিলেন, বুঝছেন না, আপনি সঙ্গে না থাকলে বেশ জোর পাওয়া যায় না, তা ছাড়া আপনিই সব করেস্‌পন্‌ডেন্‌স করেছেন। আপনি ঘুরে আসুন, তারপর যাওয়া যাবে। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। একা একা এসব ব্যাপারে যাওয়া ঠিক নয়, আমি এর ভাল-মন্দ তেমন বুঝিও না। তা ছাড়া নিজের দায়িত্বে একটা কিছু ক'রে ফেলে শেষে যদি গোলমাল হয়, সুশীলা আমাকে—

কথাটা শিরীষবাবু শেষ করিলেন না, সুশীলার দিকে একবার চাহিয়া উঠিয়া গিয়া পুনরায় নাকটা ঝাড়িলেন। মুকুজ্জেমশাই ও সুশীলা পরস্পরের দিকে তাকাইয়া সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

অগত্যা স্থির হইল, মুকুজ্জেমশাই রাজমহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিরীষবাবুকে লইয়া অম্বিকাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। তৎপূর্বে কিছুই হইবে না।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, যাই, তা হ'লে মন্নুকে একটা চিঠি লিখে দিই, কাল সকালের ট্রেনেই যাব।

মুকুজ্জেমশাই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলে সুশীলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন ও বলিলেন, সত্যিই তোমার শরীরটা খারাপ হয়েছে না কি? দেখি—

কি দেখবে?

সুশীলা উঠিয়া স্বামীর কপালে হাত দিয়া দেখিলেন।

শিরীষবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, ও তেমন কিছু নয়, সামান্য একটু সর্দির মত।

গা-টা কিন্তু ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে, আজ বরং ভাত খেয়ে কাজ নেই, রুটি দুখানা ক'রে দিই, শুকনো-শাকনা খেয়ে থাকাই সর্দির ওষুধ—সাবধান হওয়াই ভাল, মোজা পায়ে দাও।

শিরীষবাবু মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। সুশীলা আলনা হইতে গরম মোজা আনিয়া দিলেন। শিরীষবাবু মোজা পরিতে পরিতে বলিলেন, রুটি কিন্তু খাব না, বুঝলে?

তোমার কথা শুনছি কিনা আমি!

সুপারির ডালা লইয়া সুশীলাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন।

শিরীষবাবু মুখবিকৃতি করিয়া গরম মোজাকে গোড়ালি পার করাইতে লাগিলেন। এ কি বিপদে পড়িয়া গেলেন তিনি!

রান্নাঘর হইতে অমিয়াকে দেখিয়া সুশীলা মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, ঠাকুর, ওর শিব-পূজো যেন সার্থক হয়, শঙ্করের সঙ্গেই ওর যেন বিয়ে হয়।

অমিয়া উঠানের ও-ধারে মাটির শিব গড়িয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছিল। যদিও মুকুজ্জেমশাই শিব লইয়া যখন-তখন তাহাকে ঠাট্টা করেন, তবু সে শিব-পূজা ছাড়ে নাই। তাহার মনের গহনে যে চিরন্তনী উমা বসিয়া আছে, তাহার তপস্যায় বাধা দিবার সামর্থ্য তাহার নিজেরও নাই।

২

বেলা মল্লিকের বাসায় প্রফেসর গুপ্ত বসিয়া ছিলেন।

বেলা বাড়িতে নাই, বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। জনার্দন সিংহের 'জেরাসে ঠাহর যাইয়ে হুজুর' এই কথাগুলির উপর নির্ভর করিয়া প্রফেসর গুপ্ত বাহিরের ঘরটাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেলার নিকট আসিবার একটা অজুহাত অবশ্য প্রফেসর গুপ্তের আছে, সর্বদাই থাকে, এবং সে অজুহাতগুলি যে যুক্তিসহ নহে, তাহাও প্রফেসর গুপ্ত এবং বেলা উভয়েই জানেন। কিন্তু না-জানার ভান করেন। আজ প্রফেসর গুপ্ত আসিয়াছিলেন বেলাকে জানাইতে যে, তাঁহার কন্যা মানতু মামার বাড়ি গিয়াছে, আজ আর বেলার সন্ধ্যাকালে পড়াইতে যাইবার দরকার নাই। এ খবরটা কোন চাকরকে দিয়া পাঠাইলেই চলিত, কিন্তু—

আধ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, বেলা দেবীর দেখা নাই। কখন যে তিনি ফিরিবেন, তাহা জনার্দন ঠিক বলিতে পারিল না। বোস সাহেবের পত্নীকে বেলা সকালের দিকে এস্রাজ শিখাইতে যান, তাহা প্রফেসর গুপ্ত জানেন। সেখানে এতক্ষণ দেরি হইবার কথা নয়। প্রফেসর গুপ্ত আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, আর একবার হাতঘড়িটা দেখিলেন, অবশেষে হতাশ হইয়া এক টুকরা কাগজে তাঁহার আগমনবার্তা এবং আগমনের হেতু লিখিয়া জনার্দনের হাতে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার 'কার'টা যখন

গলি হইতে বাহির হইয়া গেল এবং সাত নম্বরের বাড়ির দ্বিতলের বাতায়ন হইতে বেলা যখন তাহা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনিও নামিয়া আসিলেন।

এই গলির সাত নম্বরের বাড়ির বাসিন্দাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে বেলার ভারি সুবিধা হইয়াছে। প্রফেসার গুপ্তের সান্নিধ্য এড়াইবার প্রয়োজন যখনই ঘটে (এবং সে প্রয়োজন অধুনা প্রায়ই ঘটিতেছে), বেলা সাত নম্বরের বাড়িতে আত্মগোপন করেন এবং যতক্ষণ না প্রফেসর গুপ্তের 'কার'টা চলিয়া যায়, ততক্ষণ সেখানে বসিয়া গল্পগুজব করিতে থাকেন। একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যতীত সাত নম্বরের বাড়িতে পুরুষ কেহ নাই। বেলার সমবয়সী একজন এবং বেলার চেয়ে ছোট তিনজন মেয়েকে লইয়া বিপত্নীক বৃদ্ধ হলধরবাবু সাত নম্বরে বাস করেন। হলধরবাবু পিতৃভাবাপন্ন, মেয়েগুলি মিশুকপ্রকৃতির, বেলার সহিত বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। বড় মেয়েটি কলেজে এবং বাকি মেয়েগুলি স্কুলে পড়ে। বড় মেয়েটি বেলাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে এবং বেলা তাহাকে গান বাজনা শিখিতে সহায়তা করিবেন, এরূপ একটা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

আজ শৈলদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া গলিতে ঢুকিয়াই প্রফেসর গুপ্তের 'কার'খানা চোখে পড়িতেই বেলা সোজা সাত নম্বরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। 'কার' চলিয়া গেলে নিশ্চিন্ত চিত্তে নামিয়া আসিলেন এবং জনার্দন সিংহের নিকট হইতে প্রফেসর গুপ্তের গমন ও আগমন সংবাদটা এমনভাবে শুনিলেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না। প্রফেসর গুপ্তের লেখা কাগজখানাও অত্যন্ত নির্বিকারভাবে দেখিলেন।

আজ রবিবার, তাড়াতাড়ি স্নানাহারটা সারিয়া কোথাও বাহির হইয়া পড়িতে হইবে, তাহা না হইলে আবার কেহ হয়তো দয়া করিয়া আসিয়া জুটিয়া যাইবেন। বিগত কয়েকটি রবিবারের অভিজ্ঞতা হইতে বেলা দেবী স্থির করিয়াছেন যে, রবিবারটা তিনি বাহিরেই কাটাইবেন। একের পর এক পুরুষ-বন্ধুর অভ্যাগম, আর কিছু না হউক, দৃষ্টিকটু।

স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বেলা দেবী বাহির হইতে যাইবেন, এমন সময়ে প্রিয়বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকের শুষ্ক মুখ, চুল উস্কখুস্ক, চোখে এমন একটা দৃষ্টি যাহা অল্প কথায় বর্ণনা করা শক্ত। ভয় এবং মরিয়া ভাব, ভালবাসা এবং রাগ, বিশ্বাস এবং অনিশ্চয়তা প্রিয়বাবুর চকিত দৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ছিল।

দাদা যে হঠাৎ?

প্রিয়বাবু নীরবে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভেতরে চল, বলছি।

উভয়ে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রিয়বাবু ইতিপূর্বে নিজে বেলার নিকট আসেন নাই, তিনি এই প্রথম আসিয়াছেন। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া এবং বেলার ঘরখানি পরিপাটিরূপে সজ্জিত দেখিয়া তিনি কেমন যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন। মনে মনে বেলার যে দৈন্য-নিপীড়িত অবস্থা তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে বাস্তবের কিছুমাত্র মিল নাই দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন না, ভয় পাইয়া গেলেন। বেলা তো বেশ সুখেই আছে! আর যাই থাক্, বেলার আধিভৌতিক কোন দুঃখ নাই, তাহা ঠিক।

তাঁহার চিন্তাধারায় বাধা দিয়া বেলা প্রশ্ন করিলেন, তিন মাস পরে আজ হঠাৎ এসে পড়লে যে? বিয়ের নেমন্তন্ন করতে নাকি?

প্রিয়বাবুর সহসা যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল, চোপ রও, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

প্রিয়বাবু ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। প্রিয়বাবুর ক্রোধের আকস্মিকতা ও অযৌক্তিকতার পরিচয় বেলা ইতিপূর্বে বহুবার পাইয়াছেন, সুতরাং তিনি বিস্মিত হইলেন না, একটু মৃদু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রিয়বাবু কিছুক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ তিনি এ কি করিয়া বসিলেন! আসিয়াছেন বেলাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য, তাঁহার সহিত ঝগড়া করিবার জন্য নয়; কিন্তু হঠাৎ তিনি এ কি

বলিয়া ফেলিলেন। রাগারাগি করিবার জন্ত তো তিনি আসেন নাই! নিকটেই একখানা চেয়ার ছিল, তাহার উপর বসিলেন এবং নিস্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন; আত্মধিকারে তাঁহার সমস্ত মন যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই খাপছাড়া রাগের জন্ত জীবনে তাঁহাকে বহুপ্রকারে বহুবার লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বভাব বদলাইল না। হঠাৎ পাশের ঘরে স্টোভ জ্বালার শব্দে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বেলা স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইতেছে।

তুমি ওই ঘরেই ব'স, চা ক'রে নিয়ে যাচ্ছি এখুনি।

কোনও কথা না বলিয়া প্রিয়বাবু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, মেয়েটার শরীর রক্ত-মাংসের, না, পাথরের?

একটু পরে বেলা রেকাবিতে কিছু জলখাবার এবং এক বাটি চা আনিয়া তাঁহার সামনে একটি ছোট টিপয়ে সাজাইয়া দিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, খাও।

খাব? আমি কি এখানে খাবার জন্যে এলাম?

বেলা এক গ্লাস জল আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলেন, খাবার জন্যে কেউ কারও বাড়িতে যায় নাকি? তবে অতিথি এলে চা জলখাবার দেওয়াটা ভদ্রতার একটা অঙ্গ।

আমি কি অতিথি নাকি যে, আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে?

বেলা কিছু না বলিয়া পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন এবং একটা ডিসে কয়েক খিলি পান লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আগে আমার কথার একটা জবাব দে, তা না হ'লে কিছু খাব না আমি।

বল।

আমার কাছে ফিরে যাবি কি না?

না।

রাগের মাথায় একটা কথা ব'লে ফেলেছি, সেইটেকেই বড় ক'রে দেখতে হবে?

বড় ক'রে দেখতাম না, যদি সেটা সত্যি কথা না হ'ত। আমি ভেবে দেখেছি, তুমি সেদিন যা বলেছিলে, সেটা খুব বড় সত্যি কথা, তার জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি।

কি সত্যি কথা?

মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি ব'লেই যে চিরকাল তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে—এর কোনও মানে নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা মানুষ মাত্রেরই থাকা উচিত—তা সে মেয়েমানুষই হোক বা পুরুষমানুষই হোক।

তার মানে?

তার মানে, আমি স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।

আমার কাছে থাকা মানে তা হ'লে কি পরাধীনতা বলতে চাও? আমি কি তোমার পর?

পর কেন হতে যাবে, কিন্তু আমি মেয়েমানুষ ব'লেই চিরকাল তোমার উপার্জনে ভাগ বসাব কেন? তাতে আমারও সম্মান নেই, তোমারও সম্মান নেই।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

চা-টা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চায়ের দিকে মনোযোগ না দিয়া প্রিয়বাবু বলিলেন, বেশ তো, রোজগার করতে চাও রোজগার কর, কিন্তু আমারই কাছে থাক, আলাদা বাসা করবার দরকার কি?

আলাদা থাকলে যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, একসঙ্গে থাকলে তা সম্ভব নয়। পরস্পরের স্বাধীনতা খর্ব ক'রে একসঙ্গে বাস করার কোন সার্থকতা দেখতে পাই না আমি।

খুব লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস তো!

বেলা কোনও উত্তর দিলেন না।

যাবে না তা হ'লে ফিরে?

না।

প্রিয়বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

উঠলে যে, খাবে না?

খাবার জন্যে আমি আসি নি। চললাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া প্রিয়বাবু পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আমার মনে এই যে কষ্ট দিচ্ছ, এর ফল ভাল হবে না, জেনে রেখো। শুধু আমার মনে নয়, অনেকের মনে কষ্ট দিয়েছ তুমি, লক্ষ্মণবাবুর মত ছেলে তোমারই জন্যে আত্মহত্যা করেছে। এ সবের ফল কখনও ভাল হয় না—কখনও না, কখনও না। এই তেজ বেশি দিন থাকবে না।

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে গিয়া প্রিয়বাবুর মাথাটা চৌকাঠে ঠুকিয়া গেল, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

বেলা নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লক্ষ্মণবাবুর তরুণ বিহ্বল মুখচ্ছবিটা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

খুট করিয়া শব্দ হইল।

বেলা চাহিয়া দেখিলেন, শঙ্কর দাঁড়াইয়া আছে।

শঙ্করবাবু যে, আসুন।

শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল।

শঙ্কর আসাতে বেলা যেন অনেকটা আত্মস্থ হইলেন। হাসিয়া বলিলেন, এমন অবস্থা কেন আপনার? চান করেন নি নাকি?

শঙ্কর সত্যই কয়েকদিন স্নান করে নাই। কাপড় ময়লা, গরম জামার পিছন দিকটায় দেওয়ালের চুন লাগিয়াছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, চুল উস্কখুস্ক।

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিল, শরীরটা ভাল নেই, জ্বর হয়েছে বোধ হয়।

সেইজন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

একটা ভীষণ দরকারে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি। কিছু টাকা চাই—ধার।

ওমা, টাকা ধার চাইবার আর লোক পেলেন না আপনি? ক টাকা?

গোটা দশেক হ'লেই আপাতত চলবে।

এখন দশ টাকা তো আমার হাতে নেই। কাল শৈলদি মাইনে দেবেন, কাল বরং দিতে পারি।

শৈলদি কে?

মিসেস এল. কে. বোস। তিনি তো আপনাকে চেনেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, সে কি গান শিখছে আজকাল আপনার কাছে?

গান নয়, বাজনা আর একটু একটু ইংরিজী।

আপনার সঙ্গে যে আলাপ আছে আমার—সে কথা বলেছেন শৈলকে?

না, বলি নি।

বলবেন।

ব'লে চাকরিটি খোয়াই আর কি!

তার মানে?

আপনার সঙ্গে আর কারও ভাব থাকতে পারে—এ শৈলদির পক্ষে অসহ্য।

শঙ্কর একটু হাসিল।

বেলা বলিলেন, চা খাবেন?

খেতে পারি।

প্রিয়বাবুর চা ও জলখাবারটা বেলা শঙ্করকে বসাইয়া খাওয়াইলেন।

খাইতে খাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, শৈলর মনোভাবটা কি ক'রে বুঝলেন আপনি?

অনেক কথা আমরা—মেয়েরা—বুঝতে পারি।

তবু বলুন না একটু, শুনি।

তা হ'লে চলুন, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। আমাকে এক জায়গায় বেরোতে হবে, কাজ আছে।

রাস্তায় বাহির হইতেই শঙ্কর বলিল, এইবার বলুন।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, এই ধরুন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। রিনির সঙ্গে আপনার বিয়েটা যখন ভেঙে গেল, তখন শৈলদি ভারি খুশি। একমুখ হেসে বললেন—শঙ্করদাকে জানি তো ছেলেবেলা থেকে, ওর নাড়ীনক্ষত্র সব জানি, রিনির মত মেয়েকে দেখে গ'লে পড়বার ছেলেই ও নয়। আমার তখুনি মনে হয়েছিল, ওসব বাজে গুজব, শঙ্করদা বিয়ে করবে রিনিকে—তবেই হয়েছে!

এই পর্যন্ত বলিয়া বেলা দেবী থামিলেন, চকিতে একবার শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল কেন বলুন তো?

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না, নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

বেলা দেবী এই নীরবতা-প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পাশের একটি গলি হইতে একটি সুদৃশ্য মোটরকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল এবং একবার হর্ন দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মোটরের দালাল অচিনবাবু গাড়ির ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া শঙ্করকে সম্বোধন করিলেন, নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনাকেই খুঁজছি কদিন থেকে।

আমাকে? কেন বলুন তো?

অচিনবাবু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং স্মিত মুখে বলিলেন, হস্টেলে যাচ্ছিলাম, আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল আমার।

তাহার পর বেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইনি কি আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন? চলুন না, কিছু যদি মনে না করেন, লিফ্‌ট দিয়ে দিই আপনাদের।

বেলা বলিলেন, না, ধন্যবাদ, আমি অন্য জায়গায় যাব। শঙ্করবাবু, আপনি যান ওঁর সঙ্গে, আমি একাই যাচ্ছি।

সকলেই যখন কি করিবেন ইতস্তত করিতেছেন, তখন অচিনবাবু শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ইনি কি প্রফেসর মিত্রের কেউ হন নাকি? মিষ্টিদিদির ওখানে ওঁকে দেখেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না।

শঙ্কর পরিচয় করাইয়া দিল।

না, মিষ্টিদিদির কেউ হন না ইনি। ইনি হচ্ছেন মিস বেলা মল্লিক, গান-বাজনা খুব ভাল জানেন, অনেককে শিখিয়েও থাকেন। আর ইনি হচ্ছেন অচিনবাবু, মোটরকারের দালালি করেন।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার করিলেন।

অচিনবাবু নামটা শুনিয়া বেলা মনে মনে একটু উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকই তাহা হইলে শিক্ষয়িত্রীর বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন এবং ইঁহারই আশ্রয় পরিহার করিয়া চলিতে প্রফেসর গুপ্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন! অচিনবাবু বেলা দেবীকে এক নজর আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, কিছুদিন আগে আপনিই কি আমার কাছে শিক্ষয়িত্রীর একটা পোস্টের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন? বেলা মল্লিক নামটা মনে পড়ছে যেন।

প্রথম প্রথম অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছিলাম, আপনার কাছেও হয়তো ক'রে থাকব।—বেলা দেবী হাসিয়া উত্তর দিলেন।

অচিনবাবু বলিলেন, বাইরে—মানে, কলকাতার বাইরে মেয়ের সঙ্গে থাকবার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রীর দরকার আমার একজন বন্ধুর। ভাল লোক পাই নি এখনও তেমন। আপনি যান তো এখনও যোগাড় ক'রে দিতে পারি। মাইনে পঞ্চাশ থেকে শুরু, একশো পর্যন্ত হবে। রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল জমিদার-ফ্যামিলি—

না, ধন্যবাদ। আমার আর দরকার নেই।

একটু থামিয়া বেলা দেবী বলিলেন, আপনারা যান তা হ'লে। আমি চললাম, আমার একটু কাজ আছে, নমস্কার।

বেলা দেবী চলিয়া গেলেন।

তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া অচিনবাবু বলিলেন, বেশ সপ্রতিভ মহিলাটি।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ।

শঙ্কর অচিনবাবুর মোটরে চড়িয়া বসিল, অচিনবাবু স্টার্ট দিলেন। কিছুদূরে গিয়া অচিনবাবু বলিলেন, হস্টেলেই ফিরবেন এখন? চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসা যাক, সন্ধ্যেবেলা হস্টেলে পৌঁছে দেব আপনাকে।

চলুন।

কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, দরকারটা কি?

চলুন, বলছি।

শঙ্কর কিন্তু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় মুক্তোর সহিত দেখা করিতেই হইবে। অচিনবাবুর পাল্লায় পড়িয়া আবার দেরি না হইয়া যায়।

গড়ের মাঠের কাছাকাছি আসিয়া অচিনবাবু গাড়ির গতিবেগ কমাইলেন এবং নির্জন একটা স্থান দেখিয়া গাড়ি থামাইলেন। সিগারেট-কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া শঙ্করকে দিলেন ও নিজে খাইলেন।

চলুন, একটু বসা যাক।

উপবেশন করিলে শঙ্কর বলিল, ব্যাপার কি বলুন তো?

ভন্টুবাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে?

আছে।

মৃন্ময়বাবু ব'লে ভন্টুবাবুর একজন বন্ধু আছেন, জানেন আপনি?

জানি।

মৃন্ময়বাবু লোকটি ইন্‌টেলিজেন্স্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন, তিনি অকারণে আমার পেছনে লেগেছেন।

আপনার পেছনে? কেন, কারণটা কি?

কিছুই কারণ নয়, পুলিসের লোকেদের কারণের অভাব থাকে নাকি, খাড়া করলেই হ'ল একটা।

একটু নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আমাকে কি করতে হবে?

আপনি ভন্টুবাবুকে ব'লে একটু ইন্‌ফ্লুয়েন্স্‌ করতে পারেন যদি, বড় ভাল হয়।

বেশ বলব আমি ভন্টুকে।

তাহার পর হাসিয়া শঙ্কর বলিল, এই ব্যাপারের জন্যে এত! আগে বললেই হ'ত।

অচিনবাবু সিগারেটের ছাইটা ঝাড়িয়া বলিলেন, না, আর একটা কথাও আছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া অচিনবাবু বলিলেন, একটা গুজব শুনেছিলাম—রিনির সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে; এখন আবার গুজব শুনছি—হচ্ছে না। কোন্‌টা সত্যি বলুন তো?

দুই-ই সত্যি, হবে ঠিক হয়েছিল, এখন ভেঙে গেছে।

ভেঙে গেল কেন?

সে অনেক কারণে।

অচিনবাবু প্রশ্ন করিলেন, ভেঙে গেছে—এটা ঠিক?

ঠিক।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এসব কথা জিজ্ঞেস করবার মানে?

আমার একটা উপকার করবেন?

কি বলুন?

আমরা স্বজাতি, আমার একটি মেয়ে আছে নেবেন তাকে? দেখতে সে সুশ্রী, পণও আমি যথাসাধ্য দেব। ওই আমার এক মাত্র মেয়ে, আর আমার কেউ নেই। আপনার মত ছেলের হাতে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই।

আমার মত ছেলের হাতে! আমার কতটুকু জানেন আপনি?

যা জানি, তাই যথেষ্ট। আপনি রাজী কি না বলুন, আপনি মত দিলে আপনার বাবাকে চিঠি লিখব।

আমি বিয়েই করব না।

একেবারেই না ?

একেবারেই না। তবে আপনার মেয়ের জন্তে অন্ত পাত্র চেষ্টা করতে পারি। মেয়েটি কোথা ?

মেয়েকে দেশে রেখেছি মশাই, এ কলকাতা শহরের যা কাণ্ডকারখানা, তাতে মেয়েকে এখানে রাখতে ভরসা পাই না। দেশে আছে সে দরকার হ'লে আনতে পারি।

ওরই জন্তে কি শিক্ষয়িত্রী খুঁজছিলেন নাকি ?

না, ওর জন্তে নয়, আমি অত টাকা কোথায় পাব বলুন ? ও আর একজনের জন্তে।

অচিনবাবু সিগারেটে আর একটা টান দিয়া বলিলেন, আপনি বিয়েই করবেন না ঠিক ক'রে ফেলেছেন ?

হ্যাঁ।

কারণটা জানতে পারি কি ?

শঙ্কর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, আমাদের মত ভাল ছেলের পক্ষে বিয়ে ক'রে গোল্লায় যাওয়া উচিত নয়। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র আমাদের আহ্বান করছে।

অচিনবাবু একটু হাসিলেন।

বিবাহ-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। নানা রকম মামুলী কথাবার্তা চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে তাহাও বন্ধ হইল। নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল মুক্তোর কথা; এবং অচিনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, বেলার সহিত তিনি আর একবার দেখা করিবেন কি না, করিলে কি ভাবে কোথায় করিবেন।

৩

শ্রীমৎ মুক্তানন্দ স্বামী ওরফে উমেশচন্দ্র অতিশয় চিন্তিত বিব্রত ভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বুকের ভিতরটা ধড়াস-ধড়াস করিতেছিল। চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার, বাহিরে খরস্রোতা গঙ্গার অবিরাম কল-কলধ্বনি, রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন ছন্দ লাভ করিয়াছে। মুক্তানন্দ একা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া কিছুদিন হইল তিনি হরিদ্বারে কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আতিথ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশবাস দেখিয়া পাণ্ডাজী তাঁহাকেই ভক্তিভরে আশ্রয় দিয়াছেন। মুক্তানন্দ সুখেই ছিলেন, বেশ সুন্দরই লাগিতেছিল, এমন কি মনে মনে কল্পনাও করিতেছিলেন যে, অবশিষ্ট জীবনটা এইখানেই বোধ হয় অতিবাহিত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। নিকটস্থ চণ্ডীপাহাড়ে বা অন্য কোন নির্জন স্থানে একটা আস্তানা বানাইয়া ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী নাম-জপ করিয়া বাকি জীবনটা বেশ সুখেই কাটিয়া যাইবে। বিশ্বাস্ মহাশয় নামক স্থানীয় ভক্ত ব্যক্তিটি এ বিষয়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ কি হইল, একটা সামান্য স্বপ্ন দেখিয়া সমস্ত মন বিকল হইয়া গেল।

স্বপ্নে তিনি দেখিলেন, ভন্টু যেন প্রকাণ্ড একটা রোলারের তলায় চাপা পড়িয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। রোলারের চাপ এত ভীষণ যে, ভন্টুর মুখ দিয়া, নাক দিয়া, এমন কি চোখ দিয়া রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতেছে। পথ দিয়া জনতার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কেহই ভন্টুর দিকে দৃক্‌পাত করিতেছে না। ভন্টু আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, তাহার রক্তে রাস্তার খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে, কাহারও কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় ঠাকুর আসিলেন, ভন্টুর দিকে চাহিয়া একবার হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, আমি কি করিব বল, তোমার নিজের লোকই যখন তোমাকে

ছাড়িয়া মুক্তির জন্য দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন আমি আর কি করিতে পারি?

ঠাকুর চলিয়া গেলেন, ভনুটু আর্তনাদ করিতে লাগিল। এ রকম স্বপ্নের মানে কি? স্বপ্নের কি কোন অর্থ আছে? এ স্বপ্নের কি অর্থ হইতে পারে? সত্যই ভনুটু বিপন্ন নয় তো? বিমূঢ়ের মত একা বসিয়া মুক্তানন্দ আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। কলনাদিনী গঙ্গার কলকলধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

৪

পরদিন দ্বিপ্রহর।

শঙ্কর মুক্তোর বিছানায় চুপচাপ একা শুইয়া ছিল। মুক্তো ঘরে ছিল না। মুক্তোর ঘরখানি ছোট, কিন্তু বেশ গোছানো। দুইখানি তক্তাপোশ রহিয়াছে, একখানি অপেক্ষাকৃত নীচু ও ছোট, অপরটি উঁচু ও বড়। বড় খাটটিতে পুরু গদি, ফরসা চাদর, ফরসা বালিশ। শঙ্কর ইহারই উপর শুইয়া ছিল। শুইয়া শুইয়া সে বহুবার-দেখা আসবাব-পত্রগুলি পুনরায় দেখিতেছিল। ছোট গ্লাস-কেসটি বেশ পরিচ্ছন্ন, নানা রকম রঙিন শাড়ি পাট করা রহিয়াছে অনেক। দেওয়ালে নানা রকম ছবি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, মেম-সাহেব, কালীঘাটের পট, পুরীর জগন্নাথ। গত কার্তিক-পূজার কার্তিকের ময়ূরের পালকগুলি এক কোণে টাঙানো আছে। এক ধারে একটি আলনা। আলনায় মুক্তোর নিত্য-ব্যবহার্য কাপড়-জামা এবং তাহারই এক ধারে একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি ঝুলিতেছে। মুক্তোর বাঁধা বাবুর লুঙ্গি ও গেঞ্জি। তিনি প্রত্যহ রাত্রি দশটায় আসেন, সমস্ত রাত্রি থাকেন। মুক্তোর সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত খুব পাকাপাকি রকম। রাত্রি দশটা পর্যন্ত মুক্তো ইচ্ছা করিলে অপর লোক বসাইতে পার, কিন্তু দশটার পরে মুক্তোর কক্ষে অপর কাহারও প্রবেশ নিষেধ। তবে যদি কোন দিন কোন কারণে আসিতে না পারেন, সেদিন মুক্তোর

ছুটি এবং সে ছুটি মুক্তো নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে। ওরিজিনাল ওয়ার্কে দশরথবাবু ব্যবসায়ী ব্যক্তি এবং খাঁটি লোক, সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থায় কোন রকম খুঁত নাই। দশরথবাবুর বয়স হইয়াছে, তিনি রোজ যে আসেন তাহা নয়; কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা এইরূপ। বলা বাহুল্য, মুক্তোর সহিত তাঁহার হৃদয়ঘটিত কোন ঝামেলা নাই, সম্পর্কটা নিতান্তই আধিভৌতিক। প্রথম দিনই আসিয়া শঙ্করের চোখে পড়িয়াছিল, আজও আবার পড়িল, কবে কে যেন দেওয়ালের উপর লাল পেন্সিল দিয়া লিখিয়া গিয়াছে, 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়!' কে এই দার্শনিক? এমন মর্মান্তিক একটা বচন এমন মর্মান্তিক স্থানে লিখিয়া গিয়াছে! রোজই শঙ্কর লেখাটি পড়ে। মুক্তোকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, লেখকটি কে? মুক্তো বলে, জানি না বাবু, কত লোক আসে যায়, কে কখন লিখেছে, অত খেয়াল করি নি। বলে আর মুচকি মুচকি হাসে।

অদ্ভুত মেয়ে এই মুক্তো! এতদিন ধরিয়া শঙ্কর এখানে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু মেয়েটির স্বরূপটি যে কি, তাহা আজও সে বুঝিতে পারে নাই। কিছুতেই যেন ধরা-ছোঁয়া দেয় না। হাসে, নাচে, গান গায়, মদ খায়, বৈকালে গা ধুইয়া চুল বাঁধিয়া চোখে কাজল দিয়া রঙিন শাড়িটি কায়দা করিয়া পরিয়া গালে ঠোঁটে রঙ মাখিয়া খোঁপায় ফুলের মালা পরিয়া রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়ায়, ভঙ্গীভরে সিগারেট টানে, কথায় কথায় খিলখিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে, চটিয়া গেলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে, অন্ধ-আতুর দেখিলে পয়সা দেয়, গঙ্গাস্নান করিতে যায়, মেনি বিড়ালকে আদর করে, দশরথের জন্য প্রত্যহ হাঁসের ডিমের ডালনা ও পরোটা বানায়, সামনের চপ-কাটলেটওয়ালাটার সঙ্গে দুই-এক পয়সার জন্য ইতরের মত কলহ করে, ঘরে লুকাইয়া মদের বোতল রাখে এবং তাহা সুযোগমত শাঁসালো কাপ্তেনের নিকট দুর্মূল্যে বিক্রয় করে। কিন্তু শঙ্করের মনে হয়, আসল ব্যক্তিটি অন্তরালে আছে, সে কখনও ভুলিয়াও পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে না। তাহাকে একটু একটু যেন চেনা যায়, যখন সে দুপুরে

ফালি বারান্দাটুকুতে বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকায়। মনে হয়, উহাই যেন তাহার জীবনের সত্য আকাঙ্ক্ষা, ও যেন আর কিছু চায় না, নিশ্চিন্ত চিত্তে নিজের ঘরের দাওয়াটিতে বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সুখদুঃখের আলোচনা করিতে চায়।

শঙ্কর উঠিয়া বসিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, মুক্তো বারান্দায় বসিয়া চুল শুকাইতেছে কি না! দেখিল, মুক্তো নাই। তাহার চোখে পড়িল, উষা নাম্নী ওধারের ঘরের মেয়েটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া মৃদু হাসিয়া নিজের ঘরের জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল। মুক্তো কোথায় আছে, কে জানে! রোজই দুপুরে শঙ্করকে নিজের ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া মুক্তো বাহিরে চলিয়া যায়, কাছে বসিতে চায় না। অথচ শঙ্কর কলেজ পলাইয়া আসে তাহারই সঙ্গ-কামনায়। কিন্তু মুক্তো কেমন যেন ধরা-ছোঁয়া দিতে চায় না। আসছি, বসুন।—বলিয়া অঙ্গ দোলাইয়া সে বাহির হইয়া যায় এবং পাশের ঘরে হাসি-গল্প করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইয়া তবে আসে। আসিয়াই আবার কোন ছুতায় বাহির হইয়া যাইতে চায়। দশরথের সহিত মুক্তোর সম্পর্কটা যেরূপ সুনির্দিষ্ট, শঙ্করের সহিত মুক্তোর সম্পর্কটা এখনও সেরূপ হয় নাই। শঙ্কর মুক্তোকে একদিন দশটা টাকা জোর করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু খোলাখুলিভাবে দর-কষাকষি করিতে তাহার যেন বাধ-বাধ ঠেকে। তা ছাড়া শঙ্করের সামর্থ্যই বা কতটুকু? তাহার বাবা মাসে মাসে তাহাকে যাহা পাঠাইয়া থাকেন, তাহাই তাহার সম্বল। বলা বাহুল্য, তাহা এসব ব্যাপারের পক্ষে মোটেই প্রচুর নয়। এমনিই তো হস্টেলের অনেকের কাছে ধার জমিয়া আছে। কি করিয়া শঙ্কর যে কি করিবে, তাহা সে নিজেই জানে না। অতিশয় আঁকা-বাঁকা বিপদসঙ্কুল পথে অন্ধ নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া সে চলিয়াছে। নিজের দুর্দম বাসনার আবেগই তাহার শক্তি, আর কোন সম্বল তাহার নাই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই পতিতা নারীটির মধ্যেই সে মানসীকে খুঁজিতেছে!

মানুষের কত দ্রুত পরিবর্তন হয়! দুপুরে কলেজ হইতে পলাইয়া

গণিকা-পল্লীতে আসিয়া একটি গণিকার বিছানায় সে শুইয়া থাকিবে—কিছুদিন পূর্বে ইহা কি তাহার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল? রিনিকে ঘিরিয়া যখন সে তাহার স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করিতেছিল, তখন কোথায় ছিল এই মুক্তো? মুক্তোর মত মেয়ের সান্নিধ্য সে কি তখন কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারিত? কিন্তু ঘটনাচক্রের আবর্তে সে আর মুক্তো কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে এবং পাশাপাশি ভাসিয়া চলিয়াছে। রিনি কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। শঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছে, রিনির সংস্পর্শে তাহার মনের তন্ত্রীতে যে সুর বাজিয়াছিল, মুক্তোর সংস্পর্শে আসিয়াও ঠিক সেই সুরই বাজিতেছে। মুক্তো অশিক্ষিতা গণিকা বলিয়া সে সুর কিছুমাত্র কম উন্মাদনার সৃষ্টি করিতেছে না। প্রথম দুই-চারি দিন তাহার তথাকথিত ভদ্র-অন্তঃকরণে একটু দ্বিধা জাগিয়াছিল, কিন্তু সে দুই-চারি দিন মাত্র। প্রথম প্রথম নিজের প্রতি ধিক্কার হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রথম প্রথমই। এখন শঙ্করের কাছে মুক্তো গণিকা—এই কথাই বড় নয়, মুক্তো নারী—এই কথাই বড়। শুধু নারী নয়, লাঞ্ছিতা অবনমিতা নারী। সমাজের অত্যাচারে, পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উদরান্নের জন্য দেহ-বিক্রয় করিতেছে। উহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনীকে আহরণ করিয়া প্রেমের পূত মন্দিরে নির্মাল্য রচনা করিতে হইবে। মুক্তোকে তাহার চাই, একান্তভাবে চাই, তাহার চরিত্রের সমস্ত মলিনতা সত্ত্বেও চাই। আর কেহ তাহার কাছে আসিতে পাইবে না—যেমন করিয়া হোক দশরথকে তাড়াইতে হইবে। সমস্ত কলুষ সত্ত্বেও মুক্তোর নারীত্ব অক্ষুণ্ণ আছে এবং সে নারীত্বের সম্মান শঙ্কর যদি না করে, তাহা হইলে বৃথাই তাহার শিক্ষা। ক্ষুধা—মানুষের এই আদিম ক্ষুধাটা মানুষকে কত স্বপ্নই না দেখায়! রিনির জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে মোহ যেন ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। তাহাকে না পাইলে সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে মনে হইত, এখন তো আর তাহা মনে হয় না। অথচ মাত্র দুই মাস কাটিয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছে, যেন অতি দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে, রিনি যেন অতিদূর বিগত জীবনের একটা

সুখ-স্মৃতি মাত্র, আর কিছু নয়। মিষ্টিদিদি? মিষ্টিদিদির সম্বন্ধে ঘৃণা ছাড়া আর কোনও মনোভাব শঙ্করের নাই। মুক্তো গণিকা বটে, কিন্তু মুক্তোকে দেখিয়া তো ঘৃণা করিতে প্রবৃত্তি হয় না! সে রূপোপজীবিনী, ওই তাহার পেশা। মিষ্টিদিদির মত ছদ্মবেশী ঘৃণ্য জীব সে নয়। আর একটু তলাইয়া দেখিলে শঙ্কর বুঝিতে পারিত, যে কারণে মুক্তো অ-ছদ্মবেশী, সেই কারণেই মিষ্টিদিদি ছদ্মবেশী। নিরপেক্ষ বিচারে মুক্তো ও মিষ্টিদিদির কোন তফাত নাই। কিন্তু মানুষের মন বিচিত্র জিনিস; সে নিরপেক্ষতার ভান করে, কখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে না, হইলে সে কখনও ভালবাসিতে পারিত না।

শঙ্কর একা শুইয়া শুইয়া মুক্তোর কথা ভাবিতেছিল, মুক্তো পাশের ঘরের জানালার ফুটো দিয়া নির্নিমেষ নয়নে শঙ্করকে দেখিতেছিল। গণিকাজীবনে অনেক রকম লোক সে দেখিয়াছে, কিন্তু এমনটি আর কখনও দেখে নাই। এত অসহায়! মুখের দিকে চাহিয়া থাকে ঠিক যেন ভিখারীর মত। আজ পর্যন্ত যত লোকের সংস্পর্শে মুক্তো আসিয়াছে, সকলেই ঝনাৎ করিয়া টাকা ফেলে, গায়ের জোরে দাবি করে—এ তো সে রকম নয়! এ অন্য জাতের মানুষ। অমন বলিষ্ঠ দেহ, কিন্তু শিশুর মত অসহায়; লাজুকও কম নয়, মুখ ফুটিয়া সহজে কিছু বলিতে চায় না; যদিই বা কিছু বলে, তাও এমন ভদ্র ভাষায়, শুনিলে হাসি পায়। নিশ্চয় বিদ্বান খুব, সেদিন একখানা বই হাতে করিয়া আনিয়াছিল, কত মোটা আর কত ভারী—আগাগোড়াই ইংরেজী। অথচ কথাবার্তা যেন ছেলেমানুষের মতন, কে বলিবে অত লেখাপড়া জানে! অমন লোকের এসব আঁস্তাকুড়ে আসা কেন বাপু? মাসীটিকে তো চেনে না! সেদিন তো মাসী তাহাকে বলিয়াই দিয়াছে, ওসব কাব্যি-মার্কা ছোঁড়াকে যেন আমল না দেয় সে। অথচ মাসী নিজের মুখেই তাহাকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এখন বলিতেছে বিদায় করিয়া দিতে! কোন্‌দিন হয়তো মুখের ওপর কি বলিয়া বসিবে! হঠাৎ খোঁপায় টান পড়িল।

ফিরিয়া দেখিল, টিয়া। এটি তাহারই ঘর।

টিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, ঢঙ দেখে আর বাঁচি না! ঘরে গিয়ে নয়ন ভ'রে দেখ্ না! উঁকি দেওয়া কেন?

মুক্তো উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া বলিল, খোঁপাটা খুলে দিলি, জড়িয়ে দে ভাল ক'রে।

আর জড়িয়ে দেয় না, এলো-খোঁপাতেই বেশ দেখাচ্ছে। এমনিতেই গ'লে পড়েছে, কিছু করতে হবে না, যা।

সবাই তো আর তোর মালবাবু নয়।—মুচকি হাসিয়া খোঁপাটা জড়াইতে জড়াইতে মুক্তো বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, অতিথির খবর কি, চা আনাব?

শঙ্কর শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল।

না, চা দরকার নেই।

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, আমাকে তুমি অতিথি ব'লে ডাক কেন বল তো?

অতিথিকে অতিথি বলব না তো কি বলব, আপনি তো খদ্দের নন ঠিক।

শঙ্কর ইহা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া পড়িল। ইহার উত্তরে ঠিক কি বলা উচিত, সহসা তাহার মাথায় আসিল না।

একটু পরে বলিল, খদ্দের মানে কি?

মুক্তো গা দোলাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর'—এই কথা যাকে বলতে পারা যায়, সেই হ'ল খদ্দের।

আমাকে সে কথা বলতে পার না?

মুক্তো বলিল, নিশ্চয় পারি, আজ না পারি কাল না পারি একদিন পারতেই হবে, রোজগার করতে বসেছি, দানছত্র তো খুলি নি।

মুক্তো বাহিরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর বলিল, একদিন না একদিন আপনাকেও খদ্দের হতে হবে। ওই দেখুন, একজন খদ্দের ঘুরঘুর করছে। আপনি কি থাকবেন এখন? না থাকেন তো রোজগার করি কিছু।

শঙ্কর জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিল, আবক্ষ-কাঁচাপাকা-দাড়ি এক ব্যক্তি সতৃষ্ণ নয়নে মুক্তোর দিকে চাহিয়া আছে।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল।

উঠছেন নাকি সত্যি সত্যি?

অগত্যা উঠতে হবে বইকি, টাকা যখন সঙ্গে নেই—

মুক্তো বিস্ময়ের সুরে বলিল, সত্যি? আজ এতক্ষণ ব'সে আছেন দেখে আমি ভাবলাম বুঝি—

মুক্তো মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর কোন দিকে না চাহিয়া সোজা বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেই মুক্তোর মুখের হাসি নিবিয়া গেল। দাড়িওয়ালা লোকটি একমুখ হাসি লইয়া আগাইয়া আসিতেছিল। মুক্তো তিক্ত কণ্ঠে বলিল, এখন এখানে হবে না।

সহসা তাহার নজরে পড়িল, শঙ্কর আবার ফিরিয়া আসিতেছে। মুক্তো তাহা দেখিয়া দাড়িওয়ালা লোকটিকে পুনরায় আহ্বান করিল, আচ্ছা, আসুন আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ঢুকিতেই মুক্তো ঘরে খিল দিল। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া শঙ্কর বলিল, আমার বইখানা ফেলে গেছি।

কোনও উত্তর আসিল না। শঙ্কর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর মুক্তো বইখানার পাতা উল্টাইতেছিল, সাড়া দিল না। তাহার মনে হইল, ভালই হইয়াছে, বইখানার জন্যও অন্তত আর একবার আসিবে। কি অন্যমনস্ক লোক বাপু!

৫

সকাল হইতে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সমস্ত দিনে বৃষ্টি ছাড়িবে বলিয়া আশা হয় না। শুধু বৃষ্টি নয়, এলোমেলো হাওয়াও বেশ জোরে বহিতেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ ছুটির দিন নয়, ভন্‌টু বেচারাকে আপিস যাইতেই হইবে। তা ছাড়া নানা স্থানে ঘুরিতেও হইবে। একটা গুজব শুনিতেছে, মেজকাকা নাকি পুনরায় আসিয়াছেন এবং গোয়াবাগানে সেই বন্ধুটির বাসায় অবস্থান করিতেছেন। সেখানে একবার যাওয়া দরকার। আস্‌মি-দার্জির পিতা নিবারণবাবু নাকি অসুস্থ, সেখানে একবার না গেলে অন্যায় হইবে। তৃতীয়ত, তাহারই আপিসের একজন সহকর্মী তাহাকে অনেক করিয়া ধরিয়াছেন, বক্‌সি মহাশয়কে দিয়া তাঁহার কোষ্ঠীখানা গণনা করাইয়া দিতে হইবে, তিনি গরিব মানুষ, দুই টাকার বেশি দিতে পারিবেন না। ভন্‌টু প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, চেষ্টা করিবে, সুতরাং বক্‌সি মহাশয়ের নিকটেও যাইতে হইবে। চতুর্থত, চাম গ্যান্‌ঢঅ শঙ্করের বহুদিন কোন খবর নাই, সে ছোকরার কি হইল তাহা জানিবার জন্যও মনটা ছটফট করিতেছে। পঞ্চমত, দাদার কাল একটি পত্র আসিয়াছে, লিখিয়াছেন, তাঁহার একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছে। বউদিদির নিকটে সংবাদটি সে সযত্নে গোপন রাখিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারও একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্তত পক্ষে ধীরেন ডাক্তারের সহিত একটা পরামর্শ করা দরকার। ধীরেন ডাক্তার তো পাড়াতেই থাকে, এখনই পর্বটা সারিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। পাশের ঘরে ছেলেরা তারস্বরে পড়া করিতেছে। ভন্‌টু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ছেলেদের পড়ার চাড় ভয়ানক বেশি, একটু অন্যমনস্ক হইলে এবং কাকা তাহা দেখিতে পাইলে রক্তারক্তি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভন্‌টু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, এক মিনিটের জন্য তাহারা পড়া বন্ধ করে না। ভন্‌টুর মনে হইল, ধীরেনবাবু ডিস্পেন্সারিতে আছেন

কি না একবার খোঁজ লওয়া দরকার। এই বাদলার বাজারে যদি তাঁহার পুরাতন ওয়াটার-প্রূফটাও আজিকার মত বাগাইতে পারা যায় মন্দ হয় না।'

শনুটু!

শনুটু শুনিতে পাইল, কিন্তু এক ডাকে সাড়া দিলে পড়ায় মনোযোগ দেখানো হয় না। সে আরও জোরে পড়িতে লাগিল—The boy stood on the burning deck, whence all but—

শনুটু!

আজ্ঞে?

ভাল মানুষটির মত শনুটু আসিয়া দাঁড়াইল। বেশি মনোযোগ দেখাইলে অন্যরূপ বিপদ ঘটিয়া যাইবে হয়তো।

কটা বেজেছে দেখ্ তো।

শনুটু ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিল, পৌনে আটটা।

চট ক'রে দেখে আয় তো একবার, ধীরেন ডাক্তার ডিস্পেন্সারিতে আছে কি না!

শনুটু চলিয়া গেল।

ভনুটু উঠিয়া বউদিদির ডিপার্টমেণ্ট অর্থাৎ রান্নাঘরের দিকে গেল। গিয়া দেখিল, বউদিদি সশব্দে ডালে ফোড়ন সংযোগ করিয়া নাক-মুখ কুঁচকাইয়া হাঁড়ির ভিতর হাতা সঞ্চালন করিতেছেন। ভনুটুও অনুরূপভাবে নাক-মুখ কুঁচকাইয়া বউদিদির পিছনে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বউদিদি মুখ ফিরাইতেই বলিল, বাকুর কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না আজ! লেটেস্ট্ বুলেটিন কি?

বাবার আজ সকাল থেকে হাঁফটা বেড়েছে, ঠাণ্ডার জন্যে বোধ হয়।

উপায়?

খাওয়া-দাওয়া চুকলে সরষের তেল আর কর্পূর গরম ক'রে বুকে পিঠে মালিশ ক'রে দেব। ওষুধ তো উনি খাবেন না কিছুতে।

চা খান নি এখনও আজ?

এইবার ক'রে দেব। বলেছেন আথনির চা ক'রে দিতে।

বউদিদি একটু হাসিলেন।

ভন্টুও হাসিয়া বলিল, লর্ড বাকু কি সোজা চিজ! আমাকেও এক ঢোঁক দিও।

বাকুর সর্দি হইলে তিনি সাদা জলে চা খান না। এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি পোলাওয়ের মসলা জলে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহার পর তাহাতে চায়ের পাতা দিয়া চা প্রস্তুত করিতে হয়। ডালের হাঁড়িটা নামাইয়া বউদিদি বলিলেন, দাঁড়াও, একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

ভন্টুকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বউদিদি চলিয়া গেলেন।

ভন্টু মসলার থালা হইতে কিছু মসলা লইয়া চিবাইতে লাগিল। বউদিদি ফিরিয়া আসিলেন ও বলিলেন, আদার রস মিশিয়ে দিলে একটু উপকার হ'ত—তা কিছুতে রাজী নন।

ইউস্‌লেস অ্যাফেয়ারের একটি গুরুমশাই তুমি। এতদিনেও তুমি বাকুকে চিনলে না! হিজ এক্সেলেন্সি লর্ড বাক্‌লাণ্ড্ চা-ও চান না, আদাও চান না, উনি চান—লিকুইড পোলাও।! বাকুর কুর কুর কুর।

বলিতে বলিতে ভন্টু শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে লাগিল।

আদার রস দিলে সর্দিটার একটু উপকার হ'ত। ভয়ানক ঝামরে রয়েছেন।

আদার ফাদার এলেও ঝামরানো কমবে না।

একটু থামিয়া ভন্টু পুনরায় বলিল, হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল মোজাজোড়া দেখে চটেন নি তো, একটু 'চিপিস' অ্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম, তাও বারো গণ্ডা পয়সা সাফ হয়ে গেল।

বউদিদি একটা ফরসা ন্যাকড়ায় আথনির জলের মসলাগুলি বাঁধিতেছিলেন। এই কথায় মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উল্টে-পাল্টে দেখলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। বলেন নি কিছু।

তার মানেই চটেছেন। পছন্দ হ'লে বলতেন।

শন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল যে, ধীরেন ডাক্তার ডিস্পেন্সারিতেই আছেন।—বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই চীৎকার শুরু করিল—The boy stood on the burning deck—

ভন্টু উঠিয়া পড়িল এবং বলিল, তুমি চা-টা ততক্ষণ কর, চট ক'রে আমি ধীরেন ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসি।

ধীরেন ডাক্তারের কাছে কেন?

আসল সত্যটা গোপন করিয়া ভন্টু বলিল, দেখি যদি ওয়াটার-প্রূফটা বাগিয়ে আনতে পারি। কিন্তু বাই দি বাই, বিড্ডিকার, একটু তাড়াতাড়ি ভাত চাই আজ।

এই বাদলায় সকাল সকাল বেরিয়ে কি হবে?

অনেক জায়গায় খজলাখজলি করতে হবে আজ।

খজলাখজলি কি?—বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

এই কথাটা ভন্টু নূতন সৃষ্টি করিয়াছে, বউদিদি ইতিপূর্বে কথাটা শোনেন নাই।

ফইজৎ।—বলিয়া ভন্টু বাহির হইয়া গেল।

বউদিদি কেৎলিতে জল দিয়া তাহাতে মসলার পুঁটুলিটি দিলেন এবং সেটি উনানে চড়াইয়া দিলেন। তাহার পর ক্ষণকাল ভাবিয়া চারটি পোস্ত বাহির করিলেন এবং তাহা বাটিতে লাগিলেন। ডাল ভাত হইয়া গিয়াছে, তরকারি যদি না-ও হইয়া উঠে, কয়েকটা পোস্তর বড়া ভাজিয়া দিলে ঠাকুরপোর খাওয়া হইয়া যাইবে।

জীর্ণ ওয়াটার-প্রূফটা গায়ে দিয়া ভন্টু একটু সকাল সকালই বাহির হইল। উদ্দেশ্যটা ছিল, যাইবার মুখে গোয়াবাগানটা একটু ঘুরিয়া মেজকাকার সন্ধানটা লইয়া যাওয়া। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই সে দেখিতে পাইল, শঙ্কর ভিজিতে ভিজিতে ও-ধারের ফুটপাথ দিয়া যাইতেছে। শঙ্কর তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ভন্টু বাইক ঘুরাইল।

চাম গ্যানচেঞ্জ! চাম গ্যানচেঞ্জ!

শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

এ রকম অগাধ জলে ডুব মেরে ব'সে আছিস, ব্যাপার কি তোর?

শঙ্কর একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, ভন্টুকে সে এতদিন ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া চলিতেছিল। হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হইয়া যাওয়ায় কি যে বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। একটু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু হাসি অনেক সময় মানুষকে কথা কহিবার দায় হইতে রক্ষা করে।

ভন্টু বলিল, মিছিমিছি ভিজে লাভ কি, চল্, ওই গাড়ি-বারান্দাটার তলায় দাঁড়ানো যাক। থাম্ থাম্, সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে দেবে এক্ষুনি।

একটা মোটর বেগে বাহির বাহির হইয়া গেল।

নির্বিঘ্নে গাড়ি-বারান্দার তলায় পৌঁছিয়া ভন্টু বলিল, তোর ব্যাপার খুলে বল্ দিকিন। ডিটেলে ঢুকিস নি, সংক্ষেপে শাঁসটুকু দে।

অকস্মাৎ শঙ্করের সন্দেহ হইল, ভন্টু বোধ হয় জানিতে পারিয়াছে।

বলিল, ব্যাপার মানে?

মানে, তোর টিকি আন্‌ট্রেসেব্‌ল্। কোথা থাকিস আজকাল তুই?

প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যায়।

রাত্তির নটা-দশটা পর্যন্ত প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস? কাকে ধাপ্পা মারছিস তুই!

শঙ্কর বলিল, এখন তুই যা, পরে সব বলব তোকে। এখন আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি এক জায়গায়। যাব একদিন তোদের বাড়ি।

আসছে রবিবারে আসিস। মেজোকাকা আবার ফিরেছেন।

তাই নাকি?

শুনছি তো। উঠেছেন গোয়াবাগানে, সেখানেই যাচ্ছি আমি।

গোয়াবাগানে কেন?

ঘোড়েল বাবাজীর কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

এ সংবাদ দুই মাস আগে শঙ্করের মনে আর কিছু না হোক কৌতূহল

উদ্রিক্ত করিত, এখন তেমন কিছুই করিল না। আচ্ছন্নের মত ভন্টুর মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আশ্চর্য তো!

ভন্টু বাইকে চড়িয়া বলিল, এখন চললাম আমি, আসিস।

ভন্টু চলিয়া গেল। শঙ্কর যাইতেছিল প্রফেসর গুপ্তের নিকট টাকার চেষ্টায়। কিছু টাকার যোগাড় না করিতে পারিলে মুক্তোর নিকট আর মান থাকে না। ভিজিতে ভিজিতে সে প্রফেসার গুপ্তের বাসার উদ্দেশে চলিতে লাগিল।

ভন্টু গোয়াবাগানে গিয়া শুনিল যে, উমেশবাবু আসিয়াছেন বটে; কিন্তু এখন বাড়িতে নাই, কখন ফিরিবেন তাহারও কোন স্থিরতা নাই। প্রত্যাবর্তন করিতে করিতে ভন্টু ভাবিতে লাগিল, বাবাজী আসিয়াছেন তাহা হইলে! কিন্তু নিজের বাড়িতে না গিয়া বন্ধুর বাড়িতে অধিষ্ঠান ক'রিবার মানে কি? এ রহস্যের উদ্ভেদ ভন্টু করিতে পারিল না। বাবাজী আসিলে গব্যাদ্য প্রভৃতির জন্য খরচ বেশ একটু বাড়ে, বাবাজী বন্ধুগৃহে অবস্থান করাতে খরচের দিক দিয়া ভন্টুর কিছু সুরাহা হইয়াছে, তথাপি ভন্টুর আত্মসম্মানে কেমন যেন আঘাত লাগিল। বাবাজীর এ কি ব্যবহার? রাস্তার একটা ঘড়িতে সে দেখিল, সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে। ইচ্ছা করিলে নিবারণবাবুর খবরটাও এ বেলা সে লইতে পারে। বখেড়া মিটাইয়া রাখাই ভাল; ও-বেলা করালীচরণের ওখানে যাইতে হইবে। সে খপ্পর হইতে সহজে বাহির হওয়া মুশকিল।

সারপেনটাইন লেনে নিবারণবাবুর বাড়িতে গিয়া ভন্টু বিস্মিত হইল। কাল দোকানে মাস্টারের মুখে শুনিয়াছিল যে নিবারণবাবু ভয়ানক অসুস্থ, শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ ভন্টু দেখিল, ভদ্রলোক তো দিব্যি বসিয়া আছেন, অসুখের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভন্টুকে দেখিয়া নিবারণবাবুর মুখে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আসুন আসুন ভন্টুবাবু, তারপর—হঠাৎ অকাল বোধন যে! এমন সময় তো আসেন না কোন দিন। আপিসে রেনি-ডে হয়ে গেল নাকি?

বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিতে রাখিতে ভন্‌টু বলিল, ভুলে যান সেসব কথা। আপনি কেমন আছেন তাই বলুন আগে।

যেমন রেখেছেন তেমন আছি। আমাদের আর থাকাথাকি কি, দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলেছি।

ওসব তো মামুলী লদ্‌কালদ্‌কি। অসুখ করেছে শুনলাম, কেমন আছেন তাই বলুন।

হাস্য-স্নিগ্ধ চক্ষে ভন্‌টুর প্রতি চাহিয়া নিবারণবাবু বলিলেন, মাস্টার বলেছেন বুঝি ?

হ্যাঁ। কাল আর আসবার সময় পাই নি, আজ আপিস যাবার মুখে ভাবলাম, খবর নিয়ে যাই।

বেশ করেছেন এসেছেন, বসুন। খিচুড়ি খাবেন ?

আমি ইটিং আপিস খুলে তবে বেরিয়েছি।

ইটিং আপিস মানে ?

বিরাট ইটিং আপিস খুলেছি, আজ বউদিদি খুলিয়ে তবে ছেড়েছেন।

ইটিং আপিস কি মশাই ?

খেয়ে বেরিয়েছি। তবু আনতে বলুন একটু খিচুড়ি, পুনরায় আপিস খোলা যাক। প্লেটে ক'রে সামান্য একটু আনতে বলুন, চেখে দেখা যাক। আপনার গিন্নীর হাতের রান্না খাই নি কখনও। এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।

গিন্নীর রান্না নয়, তিনি বাতের ব্যথায় কাতর, আজ ঠাণ্ডায় আরও আউরেছে। রেঁধেছে আস্‌মি।

ভিতর হইতে আস্‌মির উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আমায় অমন টিকটিক ক'রো না ব'লে দিচ্ছি, পোড়া কড়া মেজে গা-গতর টাটিয়ে গেছে আমার, ব্যাসনটা তুমিই ফেনাও না, শেলাই-ফেলাই পরে ক'রো।

নিবারণবাবু হাঁকিলেন, ওরে আস্‌মি, শোন্ এদিকে।

তাহার পর অনুচ্চকণ্ঠে ভন্‌টুকে বলিলেন, আজ আবার ঝি-মাগী আসে নি, সব ওকেই করতে হচ্ছে, দার্জিটা তো কুটোটি পর্যন্ত নাড়বে না।

আস্‌মি দ্বারপ্রান্তে উঁকি মারিল।

খিচুড়ি হয়েছে তোর ?

আস্‌মি মাথা নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

আর কি হয়েছে ?

মাছভাজা।

একটু খিচুড়ি আর মাছভাজা নিয়ে আয় ভন্‌টুর জন্যে।

আস্‌মি চলিয়া গেল।

ভন্‌টু বলিল, আপনার অসুখের খবরটা সর্বৈব ভুয়ো তা হ'লে ?

ওই ছুতো ক'রে দিনকতক রেহাই নিয়েছি। কাঁহাতক আর সেতার বাজাই মশায় !

নিবারণবাবুর হাসি আবার আকর্ণবিশ্রান্ত হইয়া উঠিল, ভন্‌টু হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

আহা-হা, আবার বাই চাগল দেখছি !

ভন্‌টু স্মিত মুখে নীরব রহিল।

একটু পরেই নিবারণবাবু বলিলেন, কাল ফের দু ব্যাটা জলখাবার খেয়ে সরেছে মশায়। এর একটা বিহিত করুন। মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে ফ্যাসাদ হয়ে দাঁড়াল দেখছি।

আস্‌মি খিচুড়ি ও মাছভাজা লইয়া প্রবেশ করায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

৬

বৃষ্টি ছাড়ে নাই। আকাশে মেঘের উপর মেঘের স্তর জমিতেছে, বাতাসের বেগ বাড়িতেছে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে এমন দিনে লোক ঘরের বাহির হয় না, কোষ্ঠিগণনা করাইতে কে আসিবে ! করালীচরণ বক্‌সির হাতে আজ কোন কাজ নাই, এমন দিনে কাজ আসিবার সম্ভাবনাও নাই।

একটা সিগারেট ধরাইয়া একচক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তিনি কর্দমাক্ত গলিটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজেকে নিতান্ত রিক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমন কর্মহীন দিন তাঁহার জীবনে বহুকাল আসে নাই। প্রতিদিন একটা না একটা কাজ হাতে থাকে এবং তাহা লইয়াই সমস্ত দিনটা কাটিয়া যায়। বিগত তিন-চার বৎসরের মধ্যে একদিনও তাঁহার অবসর ছিল না; আজ এই মেঘমেদুর দিনের পরিপূর্ণ অবসরটা লইয়া তিনি যে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, টেবিলের উপর হইতে বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন, আর কতটা বাকি আছে! দেখিলেন, আধ বোতল রহিয়াছে। বোতলে মুখ লাগাইয়াই খানিকটা পান করিলেন এবং হাতের উল্টা পিঠ দিয়া মুখটা মুছিয়া সিগারেটটায় আরও গোটা-দুই টান দিলেন।

এইবার? এইবার কি করা যায়? মদ খাওয়া এবং সিগারেট খাওয়া দুইটাই তো হইল। অতঃপর?

সহসা করালীচরণের কানে আসিল, সামনের খোলার বাড়িতে যে কোচোয়ান-দম্পতি বাস করে, তাহারা উচ্চকণ্ঠে কলহ শুরু করিয়াছে। উভয় পক্ষই চোখা চোখা ভাষা ব্যবহার করিতেছে। বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে তো! বাই নারায়ণ! সাগ্রহে কান পাতিয়া করালীচরণ তাহাদের অশ্লীল ভাষার গালাগালিগুলি শুনিতে লাগিলেন। অসভ্য বুড়ো কোচোয়ানটাকে তাঁহার হিংসা হইতে লাগিল। আর যাই হোক, সময় কাটাইবার জন্য বুড়োকে পরের উপর নির্ভর করিতে হয় না, ঘরের সঙ্গিনীটিই আসর জমাইয়া রাখিয়াছে। সঙ্গিনী! সঙ্গিনীর কথায় করালীচরণের অজ্ঞাতসারেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল। সকলেরই তো একটা না একটা সঙ্গিনী আছে, তাঁহার বেলাতেই বিধাতা-পুরুষ এমন কৃপণ হইলেন কেন? বিবাহের বয়স তাঁহার এখনও পার হইয়া যায় নাই বোধ হয়। নিজের বয়সটা ঠিক কত তাহা তাঁহার জানা নাই, কারণ নিজের জন্মসময়ই ঠিক তিনি জানেন না।

এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় মায়ের নিকট হইতে বয়সের একটা খবর আনিতে হইয়াছিল, সে হিসাবে তাঁহার বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর। কি আর এমন বয়স! এমন বয়সে কত লোকই তো বিবাহ করিতেছে। বিবাহের কথা মনে হওয়ায় তাঁহার মুখে একটু হাসি ফুটিল। কে এমন নিষ্ঠুর মেয়ের বাপ আছেন, যিনি সজ্ঞানে তাঁহার মত কানা কালো কুৎসিত একটা মাতালের হাতে স্বেচ্ছায় কন্যা সম্প্রদান করিবেন! রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া যাহারা দেহ বিক্রয় করে, তাহারাও তাঁহাকে চাহে না। অর্থই যাহাদের পরমার্থ, করালীচরণের অর্থ তাহাদের নিকটও নিরর্থক।

অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে! ভনুটুবাবুর পাস-বুকে কত টাকা জমিল একবার খোঁজ লইতে হইবে। যেমন করিয়া হোক, দ্রাবিড়ে গিয়া করকোষ্ঠিগণনার চূড়ান্ত করিয়া নিজের অদৃষ্টলিপিটা পাঠ করিতে হইবে।

সহসা কোচোয়ান-দম্পতির কলহ থামিয়া গেল। আকাশের মেঘ ঘনতর হইয়া উঠিল। দমকা বাতাসে ওদিককার জানালাটা খুলিয়া গিয়া সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। জানালাটার ছিটকানি নাই, সকাল হইতে ক্রমাগত ওইরূপ হইতেছে।

করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আর একটি সিগারেট ধরাইলেন। ভনুটু কয়েকদিন হইতে আসে নাই, হাতে গোটা-পনেরো টাকা জমিয়া গিয়াছে। মদ এবং সিগারেট যাহা আছে, তাহাতে খানিকক্ষণ চলিবে। কিন্তু তাহার পরই মুশকিল। ফুরাইলে এই বর্ষায় আনিয়াই বা দেয় কে? পাশেই একটা ছোঁড়া বিড়ির দোকান খুলিয়াছে, ইদানীং তাহাকেই দুই-চারি আনা পয়সা দিয়া করালীচরণ ফাই-ফরমাশ খাটাইয়া থাকেন। কিন্তু এই বর্ষায় সেও আসে নাই। করালীচরণের অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল। বাই নারায়ণ! সমস্ত দিনটা আজ কাটিবে কি করিয়া?

সিগারেটে টান দিতে দিতে করালীচরণ আলমারি ও তাকের বইগুলির দিকে চাহিলেন। সমস্তই পড়া, একবার নয়—বহুবার। তবুও যদি উহারই মধ্যে এই দিনের মত কোন খোরাক পাওয়া যায়! করালীচরণ

আলমারি খুলিয়া বইগুলি নামাইতে লাগিলেন। পাঁজি, পাঁজি, ক্যাল্‌কুলাস, Tale of two Cities, পাঁজি, Scarlet Lady, Statics, পাঁজি, পাঁজি, পাঁজি, Paradise Lost, Race tips, রুবাইয়াৎ, আরব্য উপন্যাস, Astronomy, পাঁজি— বিরক্তিকর! বইয়ের গাদা ঠেলিয়া দিয়া করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নজরে পড়িল, বইগুলার পিছন হইতে একজোড়া টিকটিকি বাহির হইয়া দেওয়ালে উঠিয়াছে। ইহারা করালীচরণের আলমারিতে বহুকাল হইতে আছে। অপরিচিত নয়, চেনা। আজ কিন্তু করালীচরণ ইহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলেন। ইহারা দম্পতি। টিকটিকিদের পর্যন্ত দম্পতি আছে!

টেবিলের উপর হইতে আয়নাটা তুলিয়া লইয়া করালীচরণ নিজের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঠোঁট দুইটা আজকাল আরও হাজিয়া গিয়াছে। সহসা খেয়াল হইল, পাথরের চোখটা আর একবার পরিয়া দেখা যাক না, দিনের আলোতে কোন দিন পরিয়া দেখা হয় নাই। চোখটা পরিয়া আয়নার দিকে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তিনি চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল, নিদারুণ ক্রোধে ও ঘৃণায় আয়নাটা নামাইয়া রাখিয়া তিনি চোখটা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পাথরের চোখে কখনও মানুষ ভোলে! ওটা পরিলে চেহারাটা আরও যেন বীভৎস হইয়া উঠে। করালীচরণ উঠিয়া বোতলে মুখ লাগাইয়া আরও খানিকটা সুরা পান করিলেন এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়ার বিরাম নাই, সমস্ত গলিটাময় প্যাচপেচে কাদা। বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু বর্ষার মহিমা নাই। শতছিন্ন মলিন কাপড় পরা একটা ভিখারিণী বুড়ী যেন দুঃখের ভারে অবনমিত হইয়া পথ চলিতেছে, মাঝে মাঝে দুই-চারি ফোঁটা অশ্রু উদ্গত হইয়া উঠিতেছে, দুই-একটি বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। শ্রীহীন বেদনার মূর্তি। পাশের বাড়ির ঘড়িটা বাজিয়া উঠায় করালীচরণের হুঁশ হইল, বেলা বাড়িতেছে। বারোটা বাজিয়া গেল।

যে হোটেলটায় তিনি রোজ আহার করেন, সে হোটেলটা আজ খুলিয়াছে কি না কে জানে! খুলিয়াছে নিশ্চয়ই।

করালীচরণ উঠিলেন, কোটটা গায়ে দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

হোটেলে গিয়া কিন্তু তাঁহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। ইহারা মানুষ, না, পশু! এমন বর্ষার দিনেও সেই সনাতন কলায়ের ডাল, বড়িচচ্চড়ি, শাকভাজা, উরগুনি মাঝের ঝোল! অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, ওই অখাদ্যগুলাই দুই-চারি গ্রাস মুখে পুরিতে হইল। কিন্তু নাঃ, অসম্ভব; ক্ষুধা সত্ত্বেও করালীচরণ উঠিয়া পড়িলেন।

দাম দিতে দিতে হঠাৎ চোখে পড়িল, সেই পানওয়ালীটা তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে এবং হাসিতেছে। হোটেল এবং পানওয়ালীর দোকান ঠিক সামনাসামনি। করালীচরণ এতক্ষণ পানওয়ালীকে লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু পানওয়ালী করালীচরণের সমস্ত আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল। তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। পানওয়ালীর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া হনহন করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। নিরুদ্দিষ্ট ভাবে খানিকক্ষণ চলিয়া অবশেষে একটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া করালীচরণ ভিড় দেখিতে লাগিলেন। তিনিই শুধু কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না, বাহিরের পৃথিবীর তো ব্যস্ততার সীমা নাই! মোটর, ট্রাম, রিক্শ, ঘোড়ার গাড়ি, পদাতিক—সকলে মিলাইয়া কাদা ছিটাইয়া চৌরাস্তাটাকে যেন মথিত করিয়া ফেলিতেছে। সকলেরই কাজ আছে। থাকিবে না কেন? তাঁহার মত—। করালীচরণ আবার ফিরিলেন, মদ কিনিতে হইবে। এক বোতল মদ ও কিছু সিগারেট কিনিয়া ফেলা অবিলম্বে দরকার। ভন্টুবাবু কখন যে হানা দিয়া টাকাগুলি লইয়া যাইবেন স্থিরতা নাই।

ভিড় ঠেলিয়া পিছল কর্দমাক্ত ফুটপাথ দিয়া প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে করালীচরণ মদের দোকানের উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিলেন, যেন কোন জরুরী দরকারে ট্রেন ধরিতে ছুটিয়াছেন।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে কর্দমাক্ত করালীচরণ মদ ও সিগারেট লইয়া ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, ঘরের কপাট খোলা, হাঁ-হাঁ করিতেছে। মনে পড়িল, যাইবার সময় বন্ধ করিয়া যান নাই। ঘরে ঢুকিতেই নজরে পড়িল, টেবিলের উপর একটা থালায় কি যেন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। কি এ! আগাইয়া গিয়া ঢাকা খুলিয়া দেখিলেন, কয়েকখানা পরোটা ও হাঁসের ডিমের ডালনা। কে রাখিয়া গেল! পর-মুহূর্তেই কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রে কে যেন তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এক টানে থালাটা রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কপাটে খিল বন্ধ করিয়া তিনি বলিলেন, হারামজাদী! যাহারা তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, তাহাদের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। একদিন দুর্মতি হইয়াছিল, ওই ডাকিনীদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। বেশ্যারা আবার মানুষ! দুই-চারি টাকার জন্য যাহারা—। করালীচরণ পূর্বেকার নিঃশেষিতপ্রায় বোতলটাতে মুখ লাগাইয়া বাকি মদটুকু ঢকঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। মাগীর তাড়কা রাক্ষসীর মত চেহারা, সোহাগ জানাইতে আসিয়াছে! একটুও যদি রূপ থাকিত, দেমাকে মাটিতে পা পড়িত না, আমাকে দেখিয়া তখন হয়তো মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইত। এখন বোধ হয় কেউ পোঁছে না, তাই আমার কাছে ভিড়িয়াছে। এবার আসিলে চাবকাইয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলিব।

ঘরে খিল দেওয়ায় ঘরটা অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছিল। করালীচরণ মোমবাতির সন্ধান করিয়া দেখিলেন, মোমবাতি নাই। বাই নারায়ণ! আবার বাহির হইতে হইবে। করালীচরণ তালাটা খুঁজিতে লাগিলেন, এবার তালা দিয়া যাইতে হইবে। তালাটা লাগাইতে লাগাইতে করালীচরণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, থালাটা কে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। কিছুদূর গিয়া চোখে পড়িল, ওই দিকের গলিতে কতকগুলা ছোঁড়া একটা দাঁড়কাক

ধরিয়াছে এবং তাহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে নানা রকম যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ পাইতেছে। করালীচরণ খানিকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া মোমবাতির দিকে চলিয়া গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ভন্টু আপিসের ফেরত করালীচরণের বাসার দরজা পর্যন্ত আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুনিতে পাইল, করালীচরণ উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া চলিয়াছেন—It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair—we had everything before us, we had nothing before us—

ভন্টু দরজা ঠেলিয়া ঢুকিতেই করালীচরণ বইটা বন্ধ করিলেন।

বাহ্ নারায়ণ! সমস্ত দিন কোথায় ছিলেন আপনারা? একা একা পাগল হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছি—'টেল অফ টু সিটিজ'-খানা পড়ছিলাম, কি আর করি!

ভন্টু কাজের কথা পাড়িল।

আমাদের আপিসের একজন বড্ড ধরেছে, তার ছকটা যদি একটু দেখে দেন। বেচারা ভারি-গরিব, দু টাকার বেশি—

ছকটা এনেছেন? কই?

করালীচরণ উন্মুখ হইয়া উঠিলেন।

ভন্টু ছকটা বাহির করিতেই করালীচরণ তাহার হাত হইতে তাহা প্রায় ছিনাইয়া লইলেন ও তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া দেখিতে শুরু করিলেন।

ভন্টু স্মিতমুখে করালীচরণের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটা খড়খড় শব্দ শুনিয়া আলমারির মাথার উপর নজর পড়িতেই বিস্মিত হইয়া গেল।

ওটা কি আবার?

করালীচরণ চকিতে একবার সেদিকে চাহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, পুষলাম।

কি পাখি ওটা?

দাঁড়কাক।

দাঁড়কাক! কোথা থেকে পেলেন?

রাস্তার ছোঁড়াগুলোর কাছ থেকে কিনলাম এক টাকা দিয়ে। একটা সঙ্গী না হ'লে চলে না মশাই, একা একা আজ জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

ভন্‌টু আলমারিটার নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, মস্ত একটা দামী খাঁচায় সত্যই একটা দাঁড়কাক রহিয়াছে। করালীচরণের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি তন্ময় হইয়া গণনায় মন দিয়াছেন। ভন্‌টু আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

৭

মানুষ ভাবে এক রকম, হইয়া যায় আর এক রকম। পথের নেশায় মাতিয়া মানুষ পথটাকেই বড় মনে করে, লক্ষ্যের কথা ভুলিয়া যায়। লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে পথকে সে আশ্রয় করে, সেই পথই শেষে তাহাকে পাইয়া বসে, পথ-চলার উন্মাদনায় সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

মৃন্ময়েরও তাহাই হইয়াছিল। মজফ্‌ফরপুরগামী একটা ট্রেনের কামরায় বসিয়া বসিয়া মৃন্ময় সহসা অনুভব করিল, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। হারানো পত্নীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সে পুলিসে চাকুরি লইয়াছিল, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আজ সহসা সে অনুভব করিল যে, সে উদ্দেশ্যটা গৌণ হইয়া গিয়াছে, চাকরিই এখন মুখ্য। কই, সে তো বিগত এক মাসের মধ্যে স্বর্ণলতাকে একখানি চিঠিও লেখে নাই! কাজের চাপ পড়িয়াছে সত্য কথা, কিন্তু কাজের চাপই কি একমাত্র কারণ? তাহার

লিখিতেছে। হাতের লেখাটা তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া ফেলিতে হইবে। কবে সে স্বামীকে ভাল করিয়া চিঠি লিখিতে পারিবে? ও-বাড়ির কুসুম কেমন সুন্দর করিয়া স্বামীকে চিঠি লেখে, স্বামীর কত সুন্দর চিঠি পায়।

অতিশয় মনোযোগসহকারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সম্মুখে প্রসারিত লিখন-প্রণালী দেখিয়া হাসি হাতের লেখা লিখিতে লাগিল। দুপুরবেলায় ঘুমানো তাহার বহুদিনকার অভ্যাস; মাঝে মাঝে হাই উঠিতেছে; কিন্তু না, কিছুতেই না, হাতের লেখাগুলি শেষ করিয়া ফেলিতেই হইবে। একখানি কম হইলে চিন্ময় ঠাট্টার চোটে অস্থির করিয়া তুলিবে। এমনিই তো তাহার লেখাকে কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ নাম দিয়াছে। হাসি ঝুঁকিয়া লিখিতেছিল, এই কথা মনে হওয়াতে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া নিজের হস্তাক্ষরগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ কেন হইবে? আগেকার চেয়ে তো অনেকটা ভাল হইয়াছে। আবার সে ঝুঁকিয়া লিখিতে শুরু করিল।

৯

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

নিবারণবাবু ও মাস্টার দোকানে গিয়াছে, আসমি কাজকর্ম সারিয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, মা পাশের ঘরে নিদ্রিত। দার্জি ওরফে শ্যামলী একা বসিয়া একটি কাপড়ে রঙিন সুতা দিয়া ফুল তুলিতেছে আর ভাবিতেছে, সকলে তাহাকে ইহার জন্য এত বকে কেন? সকলের ইহা খারাপ লাগে, অথচ তাহার ইহা ভাল লাগে কেন? বাবা বকে, মা বকে, আসমি বকে; সে কিন্তু কিছুতেই ইহা ছাড়িতে পারে না। তাহার ফুলিপিসীর কথা মনে পড়ে। ফুলিপিসীই প্রথমে তাহাকে সেলাইয়ের কাজ শিখাইয়াছিল। বেচারী মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার হাতের কাজ কার্পেটের আসনটা এখনও আছে। সেই কার্পেটটার

প্রতি ফুলে ফুলে রঙিন হইয়া ফুলিপিসী এখনও বাঁচিয়া আছে। ফুলিপিসীও তাহারই মত কুৎসিত ছিল, বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামী-সুখ কখনও পায় নাই। সুন্দরী দেখিয়া স্বামী আর একজনকে বিবাহ করিয়াছিল। ফুলিপিসী চিরকাল বাপের বাড়ির লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছে। ফুলিপিসীর দুঃখের অন্ত ছিল না। কিন্তু শত দুঃখের মধ্যেও সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিত, যখন সে তাহার সেলাই লইয়া বসিত। ওই ছিল তাহার একমাত্র মুক্তির ক্ষেত্র।

দার্জি সেলাই করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, তাহার কি বিবাহ হইবে? কত সুন্দরী মেয়ের বিবাহ হইতেছে না, তাহাকে বিবাহ করিবে কে? কত লোকই তো আসিল, দেখিল, চলিয়া গেল—কই, কেহই তো পছন্দ করিল না! আস্‌মিটাকে বরং দুই-একজন পছন্দ করিয়াছে। আস্‌মি যদিও কালো, কিন্তু তাহার মুখ-চোখ হাব-ভাবে লোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু তাহার বিবাহ না হইলে তো আস্‌মির বিবাহ হইবে না। তাহাকে কে বিবাহ করিবে? কোথায় সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, যে তাহার বাহিরটাকে তুচ্ছ করিয়া ভিতরটা দেখিতে পাইবে? কোথায় সে?

দার্জি ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ক্ষণিকের জন্য তাহার মানসপটে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একটি মুগ্ধ যুবকের অজানা মুখ ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সে আবার সুতা দিয়া ফুল তুলিতে লাগিল।

১০

নানা স্থান হইতে ঋণ করিয়া শঙ্কর কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং তাহা লইয়া দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতেছে। এ কয়দিন সে মুক্তোর কাছে যাইতে পারে নাই। সেদিনকার সেই ঘটনার পর শূন্যহস্তে সেখানে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কয়েকদিন ক্রমাগত ঘুরিয়া পঞ্চাশটা টাকা অনেক কষ্টে

সংগৃহীত হইয়াছে। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে, গিয়াই টাকাগুলি মুক্তোর হাতে দিয়া বলিতে হইবে, তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতি আমি করিতে চাহি না, নোটগুলি ভাল করিয়া গনিয়া দেখিয়া লও। মনে করিও না, আমি তোমার ভালবাসার মূল্য দিতেছি। টাকা দিয়া ভালবাসা ক্রয়ও করা যায় না, বিক্রয়ও করা যায়, না আমি তাহা জানি। কিন্তু আমি ইহাও জানি, অর্থ-হীন ভালবাসাবাসি করিবার সঙ্গতি তোমার নাই। সেইজন্য তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কিছু আনিয়াছি। কয়েকদিনের জন্য অন্তত ব্যবসাটা বন্ধ কর। তুচ্ছ টাকার অজুহাতে আমাকে ফিরাইয়া দিবে, তাহা আমি সহ্য করিব না। টাকাটাই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় জিনিস নয়। এতকাল টাকা চিনিয়াছ, এইবার মানুষ চিনিতে শেখ। সামান্য টাকার জন্য এমন করিয়া নিজেকে যেখানে সেখানে বিলাইয়া দিও না। নিজেকে চেন।

কে, শঙ্কর নাকি? আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকেই খুঁজছি।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, ভনুটুর মেজকাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে স্মিতমুখে আগাইয়া আসিতেছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শঙ্করকে দাঁড়াইতে হইল।

আমাকে ডাকছেন?

তোমাকে ছাড়া আর কাকে ডাকব ভাই? তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করার দরকার আছে। তোমার মাথা যে কত সাফ, সে তো আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।

ইহা কিসের ভূমিকা বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুক্তানন্দ বলিলেন, চল, স্কোয়ারটার ভেতর বসা যাক।

বেশি দেরি হবে কি? আমার একটু দরকারী কাজ ছিল।

না না, বেশি দেরি হবে না, দুটো কথা খালি।

কলেজ স্কোয়ারে ঢুকিয়া একটা নির্জন জায়গা বাছিয়া মুক্তানন্দ বলিলেন, অঙ্কের ব্যাপার ভাই; তুমি ঠিক পারবে। ন্যায়সঙ্গতভাবে একটা মূল্য-নির্ধারণ ক'রে আমাকে রেহাই দিয়ে দাও তোমরা। ব'স।

উপবেশন করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, কিসের মূল্য-নির্ণয়

আমার।

আপনার! মানে?

মানে-টানে কিছু নেই, আমারই।

শঙ্কর কিছু বুঝিতে পারিল না। একবার মনে হইল, হয়তো বাবাজী বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং নিজের বাজার-দর কত হওয়া উচিত, তাহাই তাহার কাছে জানিয়া লইতে চান। কিন্তু মুক্তানন্দের প্রশ্নে এ ধারণা অচিরেই অপনোদিত হইল।

অ্যাভারেজ বাঙালীর পরমায়ু কত ধরতে চাও তুমি? পঞ্চাশ! পঞ্চাশের কমই বরং হবে, বেশি নয়।

শঙ্কর বলিল, না।

আমার বয়স এখন বিয়াল্লিশ চলছে, বাকি রইল তা হ'লে আট বছর। এই আট বছরে কত উপার্জন করতে পারি আমি, একটা হিসেব কর দিকি। খুব বেশি ক'রে ধরলেও গড়-পড়তা মাসে ত্রিশ টাকার বেশি নয়। আট বছরে তা হ'লে কত হচ্ছে?

তিরিশ ইনটু বারো মিনটু আট—

ওসব ইনটু-ইনটু ছাড়, থোক্ টাকা কত হয় তাই বল।

শঙ্কর মনে মনে গুণ করিয়া বলিল, দু হাজার আট শো আশি টাকা।

আচ্ছা, এইবার ওর থেকে আমার খাই-খরচ কাপড়-চোপড়ের খরচ সব বাদ দাও।

শঙ্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

বাবাজী বলিয়া চলিলেন, অ্যাভারেজ কত ধরবে? আমি মাছ মাংস খাই না অবশ্য, কিন্তু আলো চাল গাওয়া ঘি আমার চাই, কাপড়ও কম ক'রে বছরে খান-দশেক, জামা অন্তত খোটা চারেক ধর, তার পর ধর টুকিটাকি নানা রকম খরচা, বাঁচতে গেলেই হরেক রকম বখেড়া আছে তো!

আপনার উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারছি না আমি।

পারবে, পারবে গো। তুমি পারবে না তো পারবে কে? আগে অঙ্কটা ক'ষে ফেল দিকি, আমার নিজের পার্সোনাল খরচ কত ধরতে চাও তুমি?

শঙ্কর যদিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না, তথাপি আজকালকার হিসাবে একটা লোকের খাওয়া-পরার খরচ ন্যূনকল্পে কত পড়িবে তাহা আন্দাজে বলিল, মাসে দশ টাকা ধরুন।

বাবাজী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

দশ টাকায় কি চলে আজকালকার দিনে! সস্তাগণ্ডার দিন কি আর আছে!

তাহার পর সস্মিতমুখে শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বলিলেন, বেশ, দশ টাকাই ধর, তোমার কথা ঠেলব না আমি। দশ টাকা ধ'রেই হিসেব কর। তা হ'লে কিন্তু থাকারও একটা খরচ ধর। কলকাতা শহরে অমনই তো কেউ থাকতে দেবে না, মেসে থাকলেও সীট-রেণ্ট্ দিতে হবে। সেটাও ইনক্লুড কর। কত ধরবে সেটা—পাঁচ টাকা?

বেশ, পাঁচ টাকাই ধরুন। হ্যাঁ, পনেরো টাকার কমে চলে না একজনের আজকাল—

তা কি চলে কখনও! অথচ ভন্টু কথাটা কিছুতে বুঝছে না। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস ধরতে ভুল হয়েছে—দুধ। দৈনিক অন্তত আধ সের ক'রে দুধ দরকার আমার। মাসে তা হ'লে কত হ'ল?

পনেরো সের।

টাকায় চার সের হিসেবে ধরলে—

প্রায় টাকা চারেক।

তা হ'লে পনেরো আর চারে উনিশ হ'ল?

হ্যাঁ।

তা হ'লে এইবার অঙ্কটা ক'ষে ফেল দিকি। ত্রিশ টাকা ক'রে মাসে আয়, উনিশ টাকা ক'রে খরচা, বাঁচছে তা হ'লে—

মাসে এগারো টাকা ক'রে।

আট বচ্ছরে কত হয়, সেটা হিসেব কর এবার।

এগারো ইন্‌টু বারো ইন্‌টু আট—

মোটমাট কত বল, ইন্‌টু কেন?

শঙ্কর পুনরায় মনে মনে হিসাব শুরু করিল।

এক হাজার ছাপান্ন টাকা।

মোটে! অথচ আমার নিজের অংশেই যে বিষয় রয়েছে, পৈতৃক নয়, মায়ের দিক থেকে পেয়েছি আমি, তার দামই অন্তত তিন হাজার টাকা। আমি অবশ্য সে বিষয়টা বন্ধক দিয়ে আমার গোয়াবাগানের সেই বন্ধুটির কাছ থেকে শ-পাঁচেক টাকা নিয়েছি, তবু তো আড়াই হাজার টাকা থাকে। ভন্‌টু মাসে মাসে কিছু কিছু দিয়ে পাঁচ শো টাকা শোধ ক'রে ফেলে বিষয়টা নিয়ে নিক, ওর নামে আমি লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি। আমাকে রেহাই দিক, এসব কচকচি আমার ভালই লাগে না।

এ রকম ব্যবস্থা করতে চাচ্ছেন কেন আপনি?

নিজের বিবেকের কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। ভন্‌টু কষ্ট ক'রে সংসার চালাচ্ছে, আমি তার কাকা— আর তা ছাড়া, স্নেহও করি আমি ওকে, আমার উচিত তার কিছু ভার লাঘব করা। কিন্তু তুমিই তো হিসেব ক'রে দেখলে ভাই, বর্তমান বাজারে ওই এক হাজার ছাপান্ন টাকার বেশি সাহায্য করা আমার সাধ্যাতীত—তাও যদি আমি ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি পাই এবং এক-নাগাড়ে আট বচ্ছর খাটতে পারি। তার চেয়ে অত হাঙ্গামার দরকার কি, আমার মামার বাড়ির তরফ থেকে যে বিষয়টুকু আমি পেয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, নিয়ে আমায় রেহাই দাও। মাসে মাসে কিছু ফেলে দিলেই পাঁচশো টাকা দেখতে দেখতে শোধ হয়ে যাবে, তখন তিন হাজার টাকার বিষয় স্বচ্ছন্দে ভোগ কর না তুমি।

মামার বাড়ির বিষয়টা কি আপনার একার?

নিশ্চয়ই। ভন্‌টুর বাপ আর আমি তো সহোদর ভাই নই, বৈমাত্রেয় ভাই। আমার মায়ের বিষয় আমি পেয়েছি, ওতে আর কারও হক্ নেই। দাদামশাই ওটা মাকে দিয়েছিলেন আলাদা ক'রে।

কোথায় আছে বিষয়টা?

আমার মামার বাড়িতে—হুগলী থেকে কিছুদূর ইন্‌টিরিয়রে।

ভনুটু কি বলছে?

'ওসব হাঙ্গামার মধ্যে আমি যেতে চাই না।' এতে হাঙ্গামাটা কি, তুমি বল তো ভাই?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আপনিই বা অত জোর-জবরদস্তি করছেন কেন?

ওই যে বললাম, নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি তা হ'লে। একটা পেছটান থাকলে তো ধর্মে কর্মে মন বসে না। হরিদ্বারে দিব্যি একটি আস্তানা পেয়েছিলাম, কোথাও কিছু নেই, এক স্বপ্ন দেখে বসলাম। স্বপ্নের দোষ নেই, কর্তব্যে খুঁত ছিল, স্বপ্নে তার আভাস পেলাম। ফিরে আসতে হ'ল। এবার ভাবছি, কর্তব্যের জড় মেরে তবে বেরুব। কিন্তু ভনুটু বাগড়া লাগাচ্ছে। হিসেব-টিসেব তুমি তো দেখলে ভাই, একটু বুঝিয়ে ব'লো তাকে।

আচ্ছা।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। মনে মনে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তানন্দও উঠিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, ভনুটুর মাথায় গোবর পোরা, হিসেব-টিসেব ও কিছু বোঝে না, তুমি একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিও ভাই। তোমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে, বল তো?

কোথায় আছেন আপনি?

আমি আছি গোয়াবাগানেই। ভনুটুর ওখানে উঠি নি, দাদা আমাকে দেখলে বড় বিচলিত হয়ে পড়েন, তা ছাড়া, ওদের টানাটানির সংসার, আমি গেলে বাড়তি একটা খরচ হবে তো। তার চেয়ে বিনোদের বাসাতেই আছি ভাল। দুজনেই একতন্ত্রের লোক।

বিনোদবাবুও কি সন্ন্যাসী?

না, ঠাকুর তাকে ঘরে থেকেই সাধনা করতে আদেশ দিয়েছেন। তেল মাখতে মানা খালি—

শঙ্কর অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, আমি তা হ'লে চলি এবার!

এস।

রাত্রি আটটা হইবে। শঙ্কর গিয়া দেখিল, মুক্তো নিজের ঘরে নাই। শুনিল, আঙুরের ঘরে একজন বড়লোক বাবু বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। সেখানে আমোদের এবং মদের স্রোত বহিতেছে। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য দশ-বারোজন নর্তকীর প্রয়োজন হওয়াতে পাড়ার যত নাচনেওয়ালী সেইখানে আহূত হইয়াছে। মুক্তোও সেখানে আছে। সংবাদটি দিয়া কালোজাম বলিল, আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি তাকে।

শঙ্কর অনুভব করিল, খবর দিলে মুক্তো আসিবে না। বলিল, আঙুরের ঘর কত দূর এখান থেকে, চলুন না, সেইখানেই যাওয়া যাক।

কালোজামকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া শঙ্কর বলিল, আমাকে সেখানে যেতে দেবে না?

কালোজাম মুচকি হাসিয়া বলিল, ওদের কারুর এখন মানা করবার ক্ষমতা নেই, চারটে থেকে ক্রমাগত মদ খাচ্ছে সবাই। তবে পরের ঘরে বিনা নেমন্তন্নে যাওয়াটা ঠিক নয়।

মুক্তো কি করছে, একবার দেখতে ইচ্ছে করছে ভারি।

দেখাতে আমি পারি। জানলা খোলা আছে, ওদিকের ওই বারান্দার কোণটায় দাঁড়ালে সব দেখা যাবে। আসুন তা হ'লে চুপিচুপি।

চুপি চুপি! শঙ্করের আত্মসম্মানে একটু যেন আঘাত লাগিল। কিন্তু ইহা লইয়া অধিক বিশ্লেষণ করিবার সময় ছিল না। কালোজাম বলিল, আসুন।

সে অনুসরণ করিল।

কালোজাম তাহাকে লম্বা সরুগোছের বারান্দার একটা অন্ধকার কোণে লইয়া গিয়া একটা খালি উপুড়-করা কেরোসিন-কাঠের বাক্স দেখাইয়া বলিল, বসুন তা হ'লে এইখানে। র‍্যাপার দিয়ে পা-টাগুলো একটু ঢেকে বসুন,

মশা কামড়াবে না হ'লে। জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখছি, দাঁড়ান, গিয়ে খুলে দিয়ে আসি।

কালোজাম চলিয়া গেল। নিটোল কালোজামের মত এই মেয়েটির সহৃদয়তায় শঙ্কর মুগ্ধ হইল।

সামনে একটু ছোট উঠানের মত, তাহার ও-পারেই আঙুরের ঘর। সেখান হইতে বাজনার আওয়াজ আসিতেছে। হার্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা পুরা দমে চলিতেছে। কালোজাম গিয়া আঙুরের ঘরে উঁকি দিতেই অভ্যর্থনাসূচক একটা হৈ-হৈ হল্লা উঠিল। কালোজাম ঘরে প্রবেশ করিল, এবং মিনিট-পাঁচেক পরে জানালাটা খুলিয়া গেল।

শঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিল, মুক্তো নাচিতেছে। মাথার উপর একটা মদের গ্লাস রাখিয়া অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে সর্বাঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া তবলার তালে তালে মুক্তো নাচিতেছে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া শঙ্কর চাহিয়া রহিল; মুক্তোর এমন রূপ তো সে দেখে নাই, কল্পনাও করে নাই। চক্ষু দুইটি আবেশময়, প্রতি অঙ্গ হইতে রূপ যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। কয়েকটা মাতাল লুব্ধদৃষ্টিতে বসিয়া দেখিতেছে, একটা মোটাগোছের লোক মদ খাইতেছে, জড়িতস্বরে কি যেন বলিতেছে এবং নাচের তালে তালে বীভৎসভাবে গা দোলাইতেছে।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া সে কি করিত বলা যায় না; কিন্তু কালোজাম আসিয়া পড়িল এবং বলিল, চলুন, ভেতরেই বসবেন, এখানে যা মশা! মুক্তোকে চুপিচুপি ব'লে এসেছি, সে আসবে এখুনি।

শঙ্কর ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কালোজামের পিছু পিছু আসিয়া মুক্তোর ঘরে প্রবেশ করিল।

কালোজাম বলিল, আপনি এইখানেই বসুন একটু, আমি যাই, আমার লোক এসেছে।

লোকে যেমন নির্বিকার ভাবে আপিস-ঘরে ঢোকে, তেমনিই

নির্বিকার ভাবে কালোজাম নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। শঙ্কর বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। মুক্তোর নাচ দেখিয়া সে কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

হঠাৎ আঙুরের ঘর হইতে একটা খুব হাসির হররা উঠিতেই শঙ্কর বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুতপদে গিয়া বারান্দার সেই অন্ধকার কোণটায় পুনরায় হাজির হইল। দেখিল, মুক্তো নয়, আর একটি মেয়ে উঠিয়া নাচিতেছে। বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য! মেয়েটি আসন্নপ্রসবা। পুরুষের মত মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, পুরুষের জুতা পায়ে দিয়া নাচিতেছে। তাহার গালের হাড় উঁচু, চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এত মদ খাইয়াছে যে পা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না, তথাপি নাচিতেছে, এবং তাহার নাচ দেখিয়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিতেছে, মেয়েটিও হাসিতেছে। হঠাৎ শঙ্করের মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল। সে বারান্দা হইতে নামিয়া আঙুরের ঘরের দিকে যাইবে বলিয়া পা বাড়াইতেছে, এমন সময়ে মুক্তো আসিয়া দাঁড়াইল এবং হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া বলিল, ও-দিকে কোথা যাচ্ছেন? আমার ঘরে চলুন। এতদিন পরে আজ এলেন যে?

শঙ্করের আর প্রতিবাদ করিবার শক্তি রহিল না। মুক্তোকে কাছে পাইয়া আসন্নপ্রসবা-নর্তকী-সমস্যার তীক্ষ্ণতা সহসা ভোঁতা হইয়া গেল, মুক্তোর পিছু পিছু সে মুক্তোর ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

মুক্তো আঁচলের ভিতর হইতে এক ডিশ মেটেচচ্চড়ি বাহির করিয়া বলিল, খান।

শঙ্কর স্থিরদৃষ্টিতে মুক্তোর পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তো মদ খাইয়াছে, চোখ মুখ লাল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। চোখে মুখে অপূর্ব একটা মদির প্রার্থনা!

নিন, এইগুলো খান।

শঙ্কর বলিল, খিদে নেই।

তবু খান।

খেতে আমি আসি নি, আমি এসেছি তোমার কাছে। সম্ভব হ'লে এই নরক থেকে তোমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাব আমি।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মুক্তো বলিল, নরক!

নরক নয় তো কি?

আস্পর্ধা তো কম নয় আপনার! এ নরকে এসে আমাদের উপকার করবার জন্যে কে পায়ে ধ'রে সেধেছিল আপনাকে, শুনি? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? নরক! আপনাদের সগ্‌গে আপনারাই থাকুন গিয়ে, আমরা সেখানে যেতে চাই না, সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছি আমরা।

মুক্তোর চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

নিন, খান।

খাব না।

আশ্চর্য লোক আপনি! এই সেদিন ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছিলেন—তোমায় ভালবাসি মুক্তো, আজ বলছেন—এখানটা নরক! এত বাজে কথাও বলতে পারেন আপনারা!

সত্যি আমি তোমাকে ভালবাসি।

সত্যি?

ফিক করিয়া মুক্তো হাসিল এবং বলিল, তা হ'লে খান এগুলো।

আমি খাব না।

লক্ষ্মীটি।

অতিশয় স্নেহভরে গায়ে মাথায় হাত দিয়া মুক্তো শঙ্করকে বিছানায় বসাইল এবং নিজে মেঝেতে বসিয়া খাইবার জন্য তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল, মা যেমন অবাধ্য ছেলেকে ভুলাইয়া খাওয়ায়।

শঙ্কর বলিল, আমাকে তুমি ভালবাস না? সত্যি ক'রে বল তো।

খান আগে, তারপর বলছি।

শঙ্কর আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, খাইতে লাগিল।

খাওয়া শেষ হইতেই মুক্তো উঠিয়া পড়িল। বলিল, আমি যাই এবার ও-ঘরে।

না, ওখানে যেতে দেব না আমি।

সে কি হয়? টাকা নিয়েছি—

টাকা ফেরত দাও, এই নাও।

পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া শঙ্কর মুক্তোর হাতে দিল। মুক্তো স্মিতমুখে নোটগুলি গনিয়া দেখিতেছিল—শঙ্কর বাধা দিয়া বলিল, আমাকে ভালবাস কি না বল আগে।

সত্যি কথা শুনবেন?

বল।

মুচকি হাসিয়া মুক্তো বলিল, একটুও না। আপনার মত গঙ্গাজলমার্কা ছেলে দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে।

তবে আমাকে আসতে দাও কেন?

ভদ্রতার খাতিরে। অত সগ্‌গ-নরক বিচার করে যারা, তাদের আমরা ভালবাসতে পারি না। আপনারা জাপানী ফানুষ, দুদিন একদিনই দেখতে বেশ।

তাহার পর নোটগুলি গনিয়া বলিল, এ কটা টাকায় আমার কি হবে? ওদের সাত দিন মাইফেল চলবে, এক শো টাকা অগ্রিম দিয়েছে, বকশিশটা-আশটাও মিলবে। নিন আপনার টাকা, আপনি বাড়ি যান। গরিবের ছেলের এসব ঘোড়ারোগ কেন বাপু? সোন্দর দেখে বিয়ে করলেই পারেন একটা। মুখ টিপিয়া হাসিয়া কোমর দোলাইয়া মুক্তো বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিল।

মুক্তো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু চলিয়া গেল না। বারান্দায় দাঁড়াইয়া জানালার ফুটা দিয়া শঙ্করকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। শঙ্কর কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া যখন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল, মুক্তোর ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহাকে ডাকিয়া ফিরায়। কিন্তু পর-মুহূর্তেই

সে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং আঙুরের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এইবার নতুন ধরনের নাচ দেখাব একটা, তিনটে গেলাস চাই, মাথায় একটা নেব, দু হাতে দুটো।

এই নূতন প্রস্তাবে বাবুরা হৈ-হৈ করিয়া উঠিলেন।

মুক্তো পুনরায় নাচ শুরু করিল।

শঙ্কর ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল, একটু দূরে ওরিজিনাল দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি নীচের ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁটটাকে চাপিয়া চক্ষু দুইটি ছোট করিলেন এবং তাহার পর গরম-জামার বুক পকেট হইতে একটি বৃহদাকৃতি নিকেলের ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, দশটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। তাঁহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী গোঁফ-দাড়ি অন্তর্নিরুদ্ধ আলোড়নে সংক্ষুব্ধ হইল, মনে হইল, যেন এখনই বোমার মত সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া পড়িবেন; কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। এই নাবালকটার সহিত বিতণ্ডা করিয়া নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল না। শঙ্করের প্রতি একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া তিনি সোজা মুক্তোর ঘরে ঢুকিয়া গেলেন এবং সশব্দে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

উদ্‌ভ্রান্ত শঙ্কর ফুটপাথের উপর দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতেছিল। অপমানে, অক্ষমতায়, বিরাগে, অনুরাগে, হতাশায়, ক্ষোভে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহার ভাষা নাই। মুক্তো তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সে কিন্তু মুক্তোকে তো মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছে না! সেই নৃত্যপরা তন্বীকে—

মেমসায়েব আপনাকে ডাকছেন।

শঙ্কর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মেমসায়েব? কোন্ মেমসায়েব?

ওই যে গাড়িতে ব'সে রয়েছেন।

শঙ্কর দেখিল, রাস্তার ওপারে একটি মোটরকার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইতেই শৈল জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, এস শঙ্করদা, তুমি এমন সময়ে এখানে যে?

শঙ্কর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুই এখানে হঠাৎ?

আমি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেলাম, তাই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। তুমিও থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলে নাকি?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ঠিক ধরেছিস তো! তোর কাছে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

আহা!

সহাস্য সকোপ কটাক্ষে চাহিয়া শৈল ভ্রূলতা আকুঞ্চিত করিল। তাহার পর বলিল, চল, তোমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে যাই। এই রাত্তিরে ঠাণ্ডায় অতটা দূর হেঁটে যেতে হবে তো আবার!

হাঁটা আমার খুব অভ্যেস আছে, তুই যা।

অতটা অহঙ্কার ভাল নয়, এস।

তুই যা না।

এস বলছি, ভাল হবে না।

শঙ্কর গাড়িতে না উঠিয়া পারিল না, উঠিয়া গিয়া শৈলর পাশে বসিল এবং ড্রাইভারকে হস্টেলের ঠিকানাটা বলিয়া দিল। শৈল বলিল, 'শিরিফরহাদ' কেমন লাগে?

চমৎকার!

বড্ড আজগুবি কিন্তু।

এটা শৈলর মুখের কথা। আসলে সে 'শিরিফরহাদ' দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল বলিল, রাগ করেছ আমার ওপর কেন বল তো?

বিস্মিত শঙ্কর বলিল, রাগ করব কেন ?

নিশ্চয় রাগ করেছ, একবারও তো যাও না আজকাল। আমি কে: এস্রাজ বাজাতে শিখেছি, তোমায় শোনাতে ভারি ইচ্ছে করে, কিন্তু তুমি ে আজকাল যাওয়াই ছেড়েছ। কেন যাও না শঙ্করদা, একবারটি গেলে পড় কি এমন ক্ষতি হয় বল তো ?

রিনির কথা শৈলর মনে পড়িল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে প্রসঙ্গ ে তুলিল না।

শঙ্কর বলিল, যাব একদিন।

তোমাকে চিনি না আমি, যাবে যা তা আমি জানি।

হস্টেলের নিকট গাড়ি থামিল।

শঙ্কর নামিতে নামিতে বলিল, ঠিক যাব।

কবে ?

উত্তরের জন্য শৈল সাগ্রহে শঙ্করের মুখের পানে চাহিল।

তা ঠিক বলতে পারি না এখন।

শৈল কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল আগেকার মত শঙ্করদা বলিবে, কালই যাব নিশ্চয় এবং তাহার নিশ্চয়তার অনিশ্চয়তা লইয়া শৈল তাহাকে একটু ঠাট্টা করিবে। কিন্তু শঙ্করদা বেশ ওজন করিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে। আগে তো শঙ্করদা এমন ছিল না !

এস একদিন, বুঝলে ?

যাব।

গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর পিছনের লাল বাতিটার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুদূর গিয়াই গাড়ি মোড় ফিরিল। শঙ্কর তবুও দাঁড়াইয়া রহিল। নির্জন পিচ-ঢালা রাস্তাটা রহস্যময় ভাষায় তাহাকে কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছে।

রাজমহলে মুকুজ্জেমশাই তাঁহার স্বাভাবিক রীতি-অনুযায়ী একদল ছেলে জুটাইয়া খেলায় মত্ত ছিলেন। এ খেলাটা অবশ্য বাঘ-বক্রি নয়, কলসী-ভাঙা খেলা। বাঘ-বকরি অপেক্ষা অধিক উত্তেজনাজনক। মাঠের মাঝে একটা খালি কলসী উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে। এক-একটি বালকের চোখে কাপড় বাঁধিয়া তাহাকে বেশ দুই-চারি পাক ঘুরাইয়া তাহার হাতে একটি লাঠি দেওয়া হইতেছে। চোখ-বাঁধা অবস্থায় যদি সে কলসীটিকে গিয়া লাঠির ঘায়ে ভাঙিতে পারে, তাহাকে নগদ এক টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে—মুকুজ্জেমশাই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বেশ একদল বালক জুটিয়া জটলা করিতেছে। মুকুজ্জেমশাই এক-একজনের চোখ বাঁধিয়া ছাড়িতেছেন এবং বসিয়া বসিয়া মজা দেখিতেছেন। কেহ ঠিক বিপরীত মুখে চলিয়া যাইতেছে, কেহ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া কেবল ইতস্তত করিতেছে, কেহ কলসীর পাশ ঘেঁষিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ বারম্বার দিক পরিবর্তন করিতেছে, কেহ অভিযোগ করিতেছে যে চোখ বড় বেশি জোরে বাঁধা হইয়াছে,—নানা বালক নানা রকম করিতেছে, কিন্তু কেহই কলসী ভাঙিতে পারিতেছে না। মুকুজ্জে-মশাই হাসিতেছেন।

একে একে অনেকগুলি বালকই চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না। পারিলে মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষে ভাল হইত, এক টাকার বেশি খরচ হইত না। কিন্তু সকলেই ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে সকলকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন মুকুজ্জেমশাই অনুভব করিলেন এবং নিকটেই একটি ময়রার দোকান থাকায় তাহা অসম্ভবও হইল না।

মোট কথা, মহানন্দে খেলা-পর্ব শেষ হইয়া গেল।

মুকুজ্জেমশাই যে বাড়িটাতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাড়িরই সম্মুখে অবস্থিত খোলা মাঠটাতে এই সব হইতেছিল। মুকুজ্জেমশাই বাসায় ঢুকিতে

যাইবেন, এমন সময় দুই-তিনটি বালক আসিয়া তাঁহাকে ধরিল যে, আজ কিছুতেই তাঁহার যাওয়া হইবে না। গতকল্য ক্লিওপেট্রার যে গল্পটা রাত্রে তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেটা শেষ করিয়া যাইতে হইবে।

মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া বলিলেন, আজ আমাকে যেতেই হবে, উপায় নেই।

তবে আপনি গল্প আরম্ভ করলেন কেন?

অত্যন্ত অভিমান-ভরে আট-নয় বছরের একটি বালক ঠোঁট ফুলাইল। মুকুজ্জেমশাই ভারি বিপদে পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বলিলেন, আচ্ছা, আমি গিয়েই একটা ভাল বই পাঠিয়ে দেব তোমাদের। তাতে ক্লিওপেট্রার গল্প আছে, আরও অনেক ভাল গল্প আছে।

পরশুদিন সেই যে জাহাজ-ডুবির গল্পটা বললেন, সেটাও আছে?

ওটা তো গল্প নয়, সত্যি কথা।

না, আপনি আজকের দিনটি থালি থেকে যান।

কলকাতায় আমার বড্ড দরকার আছে যে কাল। না গিয়ে উপায় নেই। তা না হ'লে তোমাদের ছেড়ে কি আমার যেতে ইচ্ছে করছে কলকাতার সেই ভিড়ে?

আবার কবে আসবেন আপনি?

আবার শিগগিরই আসব।

কথাটা বলিয়াই মুকুজ্জেমশাইয়ের মনে পড়িল, সেবার অর্থাৎ প্রায় বৎসর খানেক পূর্বে তিনি সাহেবগঞ্জে গিয়াছিলেন, তখনও একদল বালক-সঙ্গী তাঁহার জুটিয়াছিল এবং আসিবার সময় তাহাদেরও তিনি আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলেন যে শীঘ্রই ফিরিবেন। কর্মের আবর্তে পড়িয়া তাহাদেরও বিস্মৃতই হইয়াছেন, যাওয়া দূরের কথা।

তথাপি তিনি হাসিয়া আবার বলিলেন, শিগগিরই আসব আবার।

ছেলের দল ক্ষুব্ধ মনে চলিয়া গেল।

মুকুজ্জেমশাই বাসায় ঢুকিতেই মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইল এবং শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আজই তো আপনি যাবেন?

মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে তাহার পানে একবার চাহিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। মনোরমা মুকুজ্জেমশাইয়ের এ হাসি চেনে, বুঝিল, আজই তিনি যাইবেন।

মনোরমার বয়স যদিও চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখিয়া তাহা মনে হয় না। ছিপছিপে গড়নের চেহারা। এই বয়সে মেয়েরা সাধারণত একটু মোটা হয়, কিন্তু মনোরমা তাহাও হয় নাই, এখনও সে তন্বী আছে। সৃষ্টিকর্তা মনোরমা-নির্মাণে অদ্ভুত সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। মনোরমার অঙ্গে কোথাও এতটুকু বাহুল্য নাই। ঠোঁট দুইটি এত পাতলা, দাঁতগুলি এত ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্মাগ্র, চোখ দুইটি বড় বড় না হইয়াও এমন শ্রীসম্পন্ন, চিবুকটি ছোট হইয়াও এমন মানানসই, সমস্ত দেহটা লঘু হইয়াও এত লালিত্যময় যে, বিধাতাকে তারিফ না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু এই তন্বী নারীটির সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া অদৃশ্য কি যেন একটা আছে, তাহার মুখের দিকে বেশিক্ষণ চাহিয়া থাকা যায় না, দৃষ্টি আপনিই ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে। সমস্ত মুখচ্ছবিতে যেন একটা নীরব নিষেধ লেখা রহিয়াছে। যেন বলিতেছে, এদিকে চাহিও না। তাহার পরিমিত আলাপে, শান্ত কণ্ঠস্বরে, ধীর গমন-ভঙ্গিমায় তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, যে ধারণার প্রতিবাদ তাহার কঠিন মুখভাবে, সূক্ষ্ম নাসার সূক্ষ্মতর কম্পনে, দৃঢ়নিবদ্ধ পাতলা ঠোঁট দুইটিতে এবং সর্বোপরি তাহার কালো চোখের দৃষ্টিতে যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। শান্তকণ্ঠে তাহার মৃদু কথাগুলি শুনিলে মনে হয়, তাহার মনে কোন ক্ষোভ বা অশান্তি নাই, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিলেই বুঝিতে দেরি হয় না যে, প্রাণপণ শক্তিতে সে একটা বিরাট আর্তনাদের কণ্ঠ রোধ করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্তরের এই নিদারুণ দ্বন্দ্বকে গোপন করিতে গিয়াই তাহার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। জোরে কথা কহিবার অথবা চলিবার ক্ষমতাও যেন আর অবশিষ্ট নাই। দৈনিক জীবনযাত্রার অনিবার্য প্রয়োজনে যদি বলিতে অথবা চলিতে না হইত, সে নির্বাক নিশ্চল হইয়া নির্জনে বসিয়া থাকিত। কিন্তু সমাজে বাস করিতে হয়, সমাজ তো নির্জন নয়।

বালবিধবা মনোরমাকে তাই চলিতে হয়, বলিতে হয়, কাজকর্ম করিতে হয়। কিন্তু সে এত সংক্ষিপ্ততার সহিত এগুলি করে যে, দেখিলে বিস্ময় জন্মে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, সঙ্গোপনে কি একটা গোপন বেদনাকে সে সর্বদা পালন করিতেছে এবং পাছে কেহ তাহা বুঝিতে পারে—এই আশঙ্কায় নিরুদ্বেগের একটা মুখোশ পরিয়া আছে। তাই কেহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিলে সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, তাহার চোখে মুখে এমন একটা জ্বালা প্রকটিত হইয়া উঠে, দর্শককে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হয়।

মনোরমার জীবন দুঃখময়। সেই কবে, কতদিন আগে বাল্যকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় সে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিতে পারে নাই, ফুলশয্যার রাত্রেও লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া ছিল, তাহার পর আর স্বামীর সহিত দেখা হইবার সুযোগ হয় নাই। তিনি ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলাতে চলিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে জাহাজ-ডুবি হইয়া মারা গিয়াছেন। স্বামীর মুখ মনোরমার মনে নাই। যখন বিবাহ হইয়াছিল, কতই-বা তাহার বয়স! দশ বৎসরও নয়। হিন্দু-বিধবাজীবনের নিষ্ঠুর নিষ্ঠার চাপেও কিন্তু মনোরমার যৌবন নিষ্পিষ্ট হইয়া যায় নাই, এবং যায় নাই বলিয়াই সমাজের চক্ষে সে পতিতা। কিন্তু কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা ঠিক নয়। গুণ্ডায় তাহাকে হরণ করে নাই। সে স্বেচ্ছায় তারাপদের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা তারাপদকে সত্যই ভালবাসিয়াছিল এবং আত্মীয়স্বজনেরা যদি পুলিসের হাঙ্গামা না তুলিতেন, হয়তো তারাপদর সঙ্গেই তাহার জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইত। (যাইত কি?—মাঝে মাঝে এখন তাহার নিজেরই সন্দেহ হয়।) পুলিসের ভয়ে তারাপদ অন্তর্ধান করিল। আত্মীয়স্বজনেরা মনোরমাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন; কিন্তু ক্ষমা করিলেন না। পদস্খলিতাকে ক্ষমা করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তবু বাপ মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন মনোরমা সংসারের মধ্যে কোন রকমে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। বাপ-মার মৃত্যুর পর তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল।

ভাইদের সংসারে ভ্রাতৃজায়াদের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও হয়তো মনোরমা ভিটা আঁকড়াইয়া কোনক্রমে পড়িয়া থাকিতে পারিত; কিন্তু যখন সে শুনিল যে, সে থাকাতে তাহার ভাইঝিদের বিবাহ হইতেছে না, তাহার অতীত কলঙ্কটা তাহাকে ঘিরিয়া এখনও সজীব হইয়া আছে এবং তাহাদের বিবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, তখন সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক করিল, দুই চক্ষু যেখানে লইয়া যায় সেইখানেই সে চলিয়া যাইবে, দাসীবৃত্তি করিয়া জীবনযাপন করিবে, ভাইদের সংসারে আর থাকিবে না। যৌবন তখনও অটুট ছিল, দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত রূপও ছিল, কাশীধামে উপনীত হইয়া মনোরমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য একাধিক ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। দুইজন গুণ্ডা গোছের লোক, একটি বিপত্নীক কাশীবাসী প্রৌঢ় এবং গুটিচারেক ছোকরার বল-বিক্রম-দরদ-অনুরোধ-ইঙ্গিতের আবর্তে পড়িয়া সে যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সহসা মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখা দিলেন। মুকুজ্জেমশাই লোকটি কে, কেন তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে চাহিতেছেন, কি করিয়া তাহার খবর পাইলেন, মনোরমা কিছুই জানিত না। তিনি আসিয়া বলিলেন, শুনলাম, তুমি বিপদে পড়েছ, যদি আমার সঙ্গে আসতে চাও আসতে পার।

মুকুজ্জেমশাইয়ের চোখে মুখে কথায় বার্তায় মনোরমা কি দেখিল তাহা মনোরমাই জানে, সে নির্ভয়ে রাজী হইয়া গেল। কেবল বলিল, আমাকে নিয়ে আপনি কোথায় যাবেন?

তা এখনও ঠিক করি নি। আমি কোথাও বেশি দিন থাকি না, তবে তোমাকে ভালভাবে রাখবার বন্দোবস্ত করব কোথাও না কোথাও।

সেই হইতে মনোরমা মুকুজ্জেমশাইয়ের আশ্রয়ে আছে এবং এ যাবৎ যত পুরুষের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই মুকুজ্জেমশাইই একমাত্র লোক, যিনি তাহার রূপ যৌবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার; তাহার ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন, ভদ্রপরিবারে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সর্বপ্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট—

কিন্তু কথনও তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে র
মনে পড়ে না। প্রায় বারো-তেরো বৎসর মুকুজ্জেমশাইয়ের আশ্রয়ে; কি
মুকুজ্জেমশাই সেই একরকম—সৌম্যমূর্তি, সদাহাস্যমুখ, কর্তব্যপরায়
পরোপকারী, সদাচঞ্চল ব্যক্তি।

ধীরপদে ঘরে প্রবেশ করিয়া মনোরমা দেখিল, মুকুজ্জেমশাই নিজে
জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছেন।

শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল, খাবার এনে দিই তা হ'লে?

এবেলা আর খাব না, খিদে নেই, ওবেলাই যা খাওয়া হয়েছে তা হজ
হয় নি এখনও।

মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইল। ক্ষণকাল নীর
থাকিয়া মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, মকদ্দমার কি বুঝলেন?—ভবেশবা
স্ত্রী জিজ্ঞেস করতে বললেন।

ভবেশ ছাড়া পাবে।

মুকুজ্জেমশাই পুঁটুলি বাঁধিতে লাগিলেন, মনোরমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল
একটু পরে ইতস্তত করিয়া মনোরমা পুনরায় আর একটি প্রশ্ন করি
আচ্ছা, ওঘরে কাল যে জাহাজ-ডুবির গল্পটা বলছিলেন, সেটা কি সত্যি?

মুকুজ্জেমশাই চকিত দৃষ্টিতে মনোরমার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত কণ্
বলিলেন, তুমি কি ক'রে শুনলে?

আমি বারান্দায় ছিলাম। ওটা গল্প, না, সত্যি?

মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল নীরবে মনোরমার দিকে চাহিয়া রহিলেন
তাহার পর বলিলেন, সে কথা জেনে তোমার লাভ?

মনোরমা কিছু না 'বলিয়া আনতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। মুকুজ্জেমশাই
হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন জানতে চাইছ, বল না?

এমনই।

উত্তর না দিয়া মুকুজ্জেমশাই আর একটু হাসিলেন। বলিলেন, এবারে
যেতে হবে, ট্রেনের বেশি সময় নেই। ভবেশের স্ত্রীকে ডাক।

মনোরমার দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর সামান্য যেন একটু কম্পিত হইল, সে কিন্তু কিছু বলিল না। মুকুজ্জেমশাইকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে অবগুণ্ঠনবতী একটি বধূ আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মুকুজ্জেমশাইকে প্রণাম করিল।

কোন ভয় নেই মা, ভবেশ ঠিক ছাড়া পাবে।

মুকুজ্জেমশাই বাহির হইয়া গেলেন।

১২

গতকল্য শঙ্করের নামে যে মাসিক পত্রিকাটি আসিয়াছিল, তাহাই সে একা বসিয়া পড়িতেছিল। নিজের লেখাটাই বার বার করিয়া পড়িতেছিল। ছাপার অক্ষরে নিজের প্রথম রচনা। অনেক দিন আগের লেখা একটা কবিতা। সোনাদিদির কথা মনে পড়িল। সোনাদিদিই লেখাটা কাগজে পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটি রিনির উদ্দেশ্যে লেখা, কিন্তু লাইনগুলার ফাঁকে ফাঁকে সোনাদিদির মুখখানা যেন উঁকি দিয়া যাইতেছে। সেদিনের কথাটা শঙ্করের মনে পড়িল, যেদিন সে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া মিষ্টিদিদি এবং সোনাদিদির শরণাপন্ন হইয়াছিল। সলজ্জ স্নিগ্ধ সংযতশ্রী রিনির মুখখানি এখনও মনে আঁকা রহিয়াছে, একটুও মলিন হয় নাই। মনের যে সুনিভৃত মণিকোঠায় বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি টাঙানো থাকে, রিনির ছবিও সেইখানে টাঙানো রহিয়াছে। রিনির নিকট হইতে কতটুকু বা সে পাইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে সেইটুকুই সুন্দর করিয়া কখন যে তাহার মন সাজাইয়া রাখিয়াছে, তাহা সে এতদিন জানিতেই পারে নাই। স্মৃতিপটে অঙ্কিত রিনির আলেখ্যের পানে চাহিয়া শঙ্কর একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। রিনির জন্য মন আর উন্মুখ নহে, উন্মুখ হইবার অধিকার তাহার নাই এবং সেজন্য দুঃখও আর নাই। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, ভালই হইয়াছে। নিজের যে পরিচয় সে ক্রমশ পাইতেছে তাহাতে মনে হয়, রিনিকে সে সুখী করিতে

পারিত না। তাহার মনের কলুষ একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া সমস্ত গ্লানিময় করিয়া তুলিতই। কলুষ তাহারই মনের মধ্যে ছিল, এখনও আছে। মিষ্টিদিদি উপলক্ষ মাত্র। তিনি না থাকিলেও অন্য উপায়ে ইহা ঘটিত। রিনি নষ্ট হইয়া যাইত, রিনির সম্বন্ধে তাহার স্বপ্নটাও ভাঙিয়া যাইত, বাস্তবের রূঢ় আঘাত সে সহ্য করিতে পারিত না।

বাস্তবের রূঢ় আঘাত সহ্য করিয়াও আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া থাকিতে পারে মুক্তো। শঙ্করের মাংসলোলুপ অথচ স্বপ্নবিলাসী মনকে আশ্রয় দিতে পারে সে-ই। অপর কাহারও পক্ষে, বিশেষত শঙ্করের সুনীতি-শৃঙ্খলিত সভ্য রমণীর পক্ষে তাহা অসম্ভব। কোন ভদ্রমনা নারীই পশুটাকে সহ্য করিতে পারে না, অন্তত না পারার ভান করে। মুক্তোর পশু লইয়াই কারবার, সুতরাং সে বিষয়ে কোনরূপ ভণ্ডামি বা ছদ্মবেশ তাহার নাই। পশুদের হাটে নিজেকে সে নিলামে চড়াইয়া দিয়াছে, যে ক্রেতা সর্বোচ্চ মূল্য দিবে সে বিনা দ্বিধায় তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। এই নিছক কেনা-বেচার অন্তরালেও কিন্তু একজন আছে, যাহাকে টাকা দিয়া কেনা যায় না, যাহাকে অনুভব করা যায় কিন্তু ধরা যায় না, তাহাকে ঘিরিয়াই শঙ্করের স্বপ্ন রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিয়া বেশ কিছু টাকা যোগাড় করা যায়! এক-আধ শো টাকা নয়, বেশ কিছু মোটা টাকা, যাহার বিনিময়ে সে মুক্তোকে পাইতে পারিবে। নিজের দৈন্যে নিজের উপরই তাহার ঘৃণা হইতে লাগিল। সামান্য টাকার জন্য এই অপমান, এই বঞ্চনা, এই আত্ম-অসম্মান! যেমন করিয়া হউক, উপার্জন করিতে হইবে, বড়লোক হইতে হইবে। অকারণে ফিজিক্স মুখস্থ করিয়া এম. এস.-সি. পাস করার কোন সার্থকতা নাই। ওরিজিনাল মূর্খ কিন্তু ধনী, সেইজন্যই মুক্তোর উপর তাহার ন্যায্য অধিকার বেশি।

সহসা শঙ্করের মনে হইল, মুক্তো কি পড়িতে পারে? এই মাসিক-পত্রিকাটা তাহাকে দিয়া আসিলে কেমন হয়? এ কবিতা কি মুক্তো বুঝিতে পারিবে?

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। দুইখানিই খামের চিঠি। একটি বেশ মোটা, হাতের লেখা দেখিয়াই শঙ্কর বুঝিল সুরমার চিঠি। ইদানীং অনেক দিন সে সুরমার কোন চিঠি পায় নাই। দ্বিতীয় চিঠিখানি বাবার। বাবার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। সংক্ষিপ্ত চিঠি, প্রয়োজনীয় কথার বেশি আর কিছু নাই। লিখিয়াছেন, মা ভাল আছেন আজকাল, শঙ্কর আগামী মাসে যেন একবার বাড়ি আসে, তাহার বিবাহ-সংক্রান্ত কথাবার্তা তিনি শেষ করিয়া ফেলিতে চান। লিখিয়াছেন, তুমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবে বলিয়াছিলে। আশা করি, এতদিন চিন্তা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছ এবং তাহা অসাধারণ কিছু নহে। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় শিরীষবাবুর কন্যার সহিত কথাবার্তা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। দেনা-পাওনার কথা এখনও অবশ্য কিছুই ঠিক হয় নাই। সে দিক দিয়া তাঁহাদের তরফে যদি কোন বাধা না উঠে, তাহা হইলে অন্য কোন আপত্তির কারণ দেখিতে পাইতেছি না। যতদূর শুনিয়াছি এবং ফোটোতে যতদূর দেখিয়াছি, মেয়েটি সুশ্রী। তুমি যদি ইচ্ছা কর, পাত্রীটিকে দেখিয়া আসিতে পার। কলিকাতাতেই তাহারা থাকে। তোমার পত্র পাইলে শিরীষবাবুকে লিখিব, তোমার সহিত দেখা করিয়া মেয়ে দেখার বন্দোবস্ত করিতে। তুমি আগামী মাসে নিশ্চয় একবার আসিবে।

শঙ্কর ড্রয়ার খুলিয়া একখানা পোস্টকার্ড বাহির করিল এবং তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিল যে, সে ঠিক করিয়াছে, বিবাহ করিবে না। ইহা লইয়া তাহাকে যেন আর অনুরোধ করা না হয়। বিবাহ করা তাহার পক্ষে এখন অসম্ভব। চিঠিখানা লিখিয়া চাকরটাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ সেটা রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিতে বলিল। এক কাপ চা-ও ফরমাশ করিল।

সুরমার চিঠিটা খুলিতেই কতকগুলি ফোটো বাহির হইয়া পড়িল। নানা রকম ফোটো। একটা কুকুরের, একটা ফুলের, একটা ক্রন্দনাকুল একটি শিশুর, একটা মেঘের, একটা সমুদ্রের, আরও কয়েকটা নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য। সুরমা লিখিতেছে।—

শঙ্করবাবু,

অনেকদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখছি। অর্থাৎ আপনার চিঠিখানা পাওয়ার পর এতদিন কেটে গেছে যে, চিঠিখানাও আর খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজে পাচ্ছি না ব'লে যেন মনে করবেন না, যেখানে সেখানে অবহেলাভরে ফেলে রেখেছিলাম এবং অবশেষে তা ওয়েস্ট্-পেপার-বাস্কেট-বাহিত হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। মোটেই তা নয়। বরং পাছে হারিয়ে যায় এই ভয়ে অত্যধিক যত্ন ক'রে সেটা রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন্ অ্যাটাচি কেসের কোন্ পকেটে, কোন্ টেবিলের কোন্ ড্রয়ারে অথবা কোন্ বাক্সের কোন্ খোপে যে সেই সযত্নরক্ষিত চিঠিটি আত্মগোপন ক'রে রইল, উত্তর দেবার সময় কিছুতেই তা আবিষ্কার করা গেল না। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। চিঠির উত্তরে আমরা যখন চিঠি লিখি, তখন সব সময়ে আমরা যে চিঠির উত্তরই লিখি তা নয়, উত্তর দেবার উপলক্ষ্য ক'রে নিজের লিপিকুশলতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করি। সব সময়ে তাতে প্রশ্নের উত্তর থাকে না, আবার অনেক সময় অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নেরও অযাচিত উত্তর থাকে। কারও চিঠি পেলে মনে যে সাড়া জাগে, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমরা যা করি তাই তার উত্তর। অনেক সময় নীরবতাই হয় শ্রেষ্ঠ উত্তর। অনেক সময় আবার আসল উত্তরটাকে আড়াল করবার জন্যই অবান্তর বাগ্‌বিস্তার করতে হয়; অনেক সময় পাতার পর পাতা লিখলেও উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, আবার অনেক সময়—। কিন্তু এ আমি করছি কি! আপনি কবি মানুষ। আপনাকে এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া যে নিউ-কাস্‌ল শহরে কয়লা বহন করার চেয়েও হাস্যকর। আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ মুচকি মুচকি হাসছেন। ভাবছেন বোধ হয়, এতদিন পরে চিঠির উত্তর এল—তাও আবোল-তাবোল?

সুতরাং আর নয়, ও-প্রসঙ্গ এইখানেই চাপা দিলাম। এতদিন আপনার চিঠির যে উত্তর দিই নি, তার প্রধান এবং একমাত্র কারণ এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন। ফোটোগ্রাফিতে আমাকে পেয়ে বসেছে। দিনরাত ওই নিয়েই আছি। দিনে ফোটো তুলি, রাত্রে ডেভেলপ করি। কয়েকটা নমুনা

পাঠালাম, কেমন লাগল সত্যি ক'রে জানাবেন তো? খুব কঠোর হয়ে বিচার করবেন না তা ব'লে। এই আমার প্রথম হাতে-খড়ি, সেটা মনে রাখবেন। ছোট ছেলেটির কান্নার ছবিটি খুব মিষ্টি, নয়? একটি পার্সী ভদ্রমহিলার ছেলে এটি। ভদ্রমহিলার সঙ্গে সম্প্রতি ভাব হয়েছে, বেশ মেয়েটি। রবীন্দ্রনাথের একজন গোঁড়া ভক্ত। ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রায় কণ্ঠস্থ। আপনার সেই কবিতাটাও ওঁকে অনুবাদ ক'রে শুনিয়েছি, খুব ভাল লেগেছে ওঁর। ভাল কথা, আপনি কি কবিতা লেখা ছেড়েই দিলেন না কি? কই, কোন লক্ষণই তো দেখতে পাই না! লিখলে নিশ্চয় কোথাও দেখতে পেতাম।

আপনার বন্ধুর কোন খবর কি পেয়েছেন ইদানীং? আমি অনেকদিন কোনও খবর পাই নি। পত্রলেখক-হিসাবে বোধ হয় কোনকালেই ওঁর প্রসিদ্ধি ছিল না। আপনিই ভাল বলতে পারবেন, কারণ আপনারা বাল্যবন্ধু। আমার সঙ্গে পরিচয় যদিও অল্পদিনের (আমি তো আগন্তুক বললেই হয়), কিন্তু এই অল্প পরিচয় সত্ত্বেও এ কথাটা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, পত্রলেখক-হিসাবে ওঁকে প্রথম শ্রেণীতে দূরের কথা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দিতেও ইতস্তত করা উচিত। অত্যন্ত কাজের মানুষ অর্থাৎ প্র্যাকটিকাল লোক যাঁরা, শুনেছি, অপব্যয় করবার মত সময় নেই তাঁদের এবং যে চিঠি দু কথায় লেখা যায় তার জন্যে দু শো কথা লেখাটা অত্যন্ত অন্যায় ব'লে মনে করেন তাঁরা। দু শো কথা একসঙ্গে লেখবার ক্ষমতা আছে কি না, সে প্রশ্ন না তুলেও এটা বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, দু শো কথা লেখবার ধৈর্য ওঁদের নেই। আপনার বন্ধুটির প্রথম প্রথম যা-ও বা একটু ধৈর্য ছিল, আজকাল তার থেকেও চ্যুত হয়েছেন তিনি। হয়তো পড়ার চাপ, নয়তো বা আর কিছু। অনেক সময় প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়।

কবিরা এখনও নারীদেরই প্রহেলিকা ব'লে থাকেন, আমার মনে হয়, খুব সম্ভব সেটা প্রথার খাতিরে। এককালে হয়তো নারীরা সত্যিই প্রহেলিকা ছিল এবং বিস্মিত পুরুষদের মন একদা তার সমাধানেই ব্যস্ত ছিল ব'লেই

কাব্যে তার এত উল্লেখ দেখা যায়। যুগ যুগ ধ'রে পুরুষদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে নারী কিন্তু আর প্রহেলিকা নেই, নারী-সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যাই তাঁরা সমাধান করেছেন। নারীদের ছলা-কলা হাব-ভাব লীলা-চাপল্য অর্থাৎ নাড়ী-নক্ষত্র আজকাল পুরুষজাতির নখদর্পণে। তবু কিন্তু পুরুষদের দৃষ্টির সম্মুখে এখনও নারীরা নিজেদের রহস্যময়ীরূপে প্রকট রাখবার চেষ্টা করেন, এবং আমার বিশ্বাস, পুরুষেরা জেনে শুনেও মুগ্ধ হবার ভান করেন। অর্থাৎ আজকাল বিজ্ঞান-মহিমায় প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রহসন। আপনারা তা দেখে যে হেসে লুটিয়ে পড়েন না, সেটা আপনাদেরই ঔদার্য, ভণ্ডামি বা সিভাল্‌রি—যাই বলুন। আমার বরং পুরুষদেরই প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়, যদিও বিজ্ঞানের প্রকোপ আপনারাও এড়াতে পারেন নি, এবং যদিও আমাদের ধারণা, আপনাদের চরিত্রের অনেকখানিই আমরা বুঝে ফেলেছি। আপনাদের আমরা সমস্ত বুঝে ফেলেছি—এই ধারণাই আরও বিভ্রান্ত করেছে আমাদের। আমাদের সম্পর্কে আপনাদের যতটুকু আমরা পাই, আপনাদের ততটুকুই হয়তো কিছু কিছু বুঝি আমরা; কিন্তু আমাদের আয়ত্তের বাইরে আপনাদের যে সত্তা, তার সঙ্গে আমাদের কিছুই পরিচয় নেই এবং সেই অপরিচয়ের অন্ধকারে সবজান্তার মত চলতে যাই ব'লে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, এবং সেই হোঁচটের নানা মূর্তি নানা রূপে দেখা দেয়। কখনও মূর্ছা যাই, কখনও আত্মহত্যা করি, কখনও কবিতা লিখি, কখনও বা কোন আন্দোলনে যোগদান করি। আমি ফোটোগ্রাফ নিয়ে মেতেছি। কিন্তু ওই অপরিচয়ের অন্ধকারটাই যে লোভনীয়!

যাক। নিজের কথা নিয়েই অনেকক্ষণ বাগ্‌বিস্তার করলাম, আপনার কথা কিছুই জিজ্ঞেস করা হয় নি। মিষ্টিদিদির খবর অনেকদিন পাই নি। শৈল ঠাকুরঝিও কোন চিঠিপত্র দেন না। কেমন আছেন তাঁরা? রিনি দেবী কেমন আছেন? এখনও কি আপনি তাঁর পাঠাভ্যাসে সহায়তা করছেন নাকি? পুরুষদের মধ্যে যে অংশটুকু প্রহেলিকা নয়, কাচের মত স্বচ্ছ এবং ভঙ্গুর যেটুকু, সেটুকুর সম্বন্ধে সচেতন করা বৃথা ব'লেই কিছু বললাম না।

আশা করি, আপনি এবং তিনি উভয়েই নিরাপদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। অনেকক্ষণ ধ'রে বকছি, বিরক্ত হয়ে উঠেছেন বোধ হয় এতক্ষণ। আমারও নতুন প্রিন্টগুলো শুকিয়েছে, তুলতে হবে এইবার। ফোটোগুলো কেমন লাগল জানাবেন। প্রীতি-সম্ভাষণ নিন। ইতি—সুরমা।

ভৃত্য চা দিয়া গেল এবং বলিল যে, নীচে কমন-রুমে এক ভদ্রলোক শঙ্করের সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছেন।

শঙ্কর বলিল, এইখানেই নিয়ে আয় ডেকে।

একটু পরেই রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে অপূর্বকৃষ্ণ পালিত আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। বিনীত নমস্কার করিয়া অপ্রস্তুত মুখে রুমালটা পকেটে পুরিতে পুরিতে একটু হাসিয়া বলিলেন, আশা করি, আপনার কাজের কোন ব্যাঘাত ক'রে বিরক্ত, মানে—

কিছু না, বসুন। চা খাবেন?

না। অনেক ধন্যবাদ। এইমাত্র চা খেয়ে আসছি আমি।

কোন দরকার আছে নাকি আমার সঙ্গে?

অপূর্ববাবু পুনরায় রুমাল বাহির করিলেন এবং গলা ঘাড় কানের পিছন প্রভৃতি মুছিয়া যেন কিছু শক্তিসংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মরিয়া হইয়া শঙ্করের চোখের পানে চাহিয়া বলিয়া ফেলিলেন, মিস মল্লিকের সঙ্গে কি দেখা হয় আজকাল আপনার?

দেখা না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?—বিস্মিত শঙ্কর প্রশ্ন করিল। অপূর্ববাবু কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন, সত্যই তো শঙ্করবাবুর সহিত বেলা মল্লিকের দেখা না হওয়ার কোন সঙ্গত বাধা থাকিবার কথা নয়। এ প্রশ্ন করার কোনও অর্থ হয় না। অকারণে অনর্থক একটা প্রশ্ন করিয়াছেন এবং সেটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এই ভাবিয়া অপূর্ববাবু মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার মুখভাবেও সেটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আবার রুমাল বাহির করিতে হইল। শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল, বেলার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কতদিন আগে?

আমার? আমার তো দেখা করার তেমন সুযোগ হয় না, রবিবার ছাড়া আমার ছুটি তো তেমন—মানে—তা ছাড়া আপিস আজকাল বড় স্ট্রিক্ট, রবার্টসন সায়েব—

রবিবার তো মাসে চারটে ক'রে আছে।—বলিয়া শঙ্কর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মিস মল্লিক রবিবারে বাড়ি থাকেন না, আমি গিয়েছিলাম দু দিন। অথচ পিয়ানোর ভাল ভাল গৎ যোগাড় করেছি কয়েকটা, মানে—শুনলাম উনি আজকাল পিয়ানোও—

শঙ্কর বলিল, পিয়ানো! পিয়ানো পেলে কোথা? শুনি নি তো?

মিস্টার বোসের একটা পিয়ানো আছে, উনি মিসেস বোসকে এস্রাজ শেখাতে যান, সেই সময় পিয়ানোটাও বাজান শুনেছি। মানে—ওদের বেয়ারাটা বলছিল—

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, বেশ তো, আপনি কি করতে চান?

অপূর্ববাবু একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, কয়েকটা ভাল গৎ পেয়েছিলাম, খুব ভাল বিলিতী গৎ, সেইগুলো ওঁকে আর কি, মানে—অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড—

উপহার দিতে চান?

অপূর্ববাবু একটু হাসিলেন, চক্ষু দুইটি একটু নত করিলেন এবং সমস্ত মুখভাবে নারী-সুলভ কমনীয়তা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, না না, উপহার ঠিক নয়, আমি অর্থাৎ—

নির্বিকারভাবে শঙ্কর বলিল, বেশ তো, ডাকে পাঠিয়ে দিন না, দেখা যখন হচ্ছে না।

ডাকে? তা বেশ বলেছেন, সিওর পাবেন তা হ'লে, কি বলুন? আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এই ভেবে যে, আপনি হয়তো বলতে পারবেন, কখন উনি বাড়ি থাকেন, তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমিও একদিন, মানে—

উনি কখন বাড়িতে থাকেন, তা আমিও ঠিক জানি না। প্রায়ই অবশ্য থাকেন না, অনেকগুলো টুইশনি নিয়েছেন কিনা!

তা শুনেছি আমি। তা হ'লে—

অপূর্ববাবু আর কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, ডাকেই তা হ'লে পাঠিয়ে দেব। ওঁর নাম্বারটা কি বলুন তো, টুকে নিই, ঠিক মনে নেই—

পাঞ্জাবির পকেট হইতে পকেট-বুক বাহির করিতে গিয়া কতকগুলি মেয়েদের মাথার কাঁটা বাহির হইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল। কুণ্ঠিত অপূর্ববাবু চাদর সামলাইতে সামলাইতে সেগুলি কুড়াইতে লাগিলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, ওগুলো আবার কি ?

ওগুলো, মানে—আমাদের পাড়ারই একটি মেয়ে কিনতে দিয়েছিল আমাকে—

কাঁটাগুলি কুড়াইয়া মিস বেলা মল্লিকের ঠিকানাটা টুকিয়া লইয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিত চলিয়া গেলেন। শঙ্কর মৃদু হাসিয়া চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

১৩

মানুষের সহিত পশুর প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য তো আছেই, অনেক সময় আকৃতিগত সাদৃশ্যও থাকে। এক-একজন লোকের সহিত এক-একটা পশুর অদ্ভুত রকম মিল, দেখিলেই একটা বিশেষ পশুর কথা মনে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যায় যে লোকটি হাওড়ায় একটা মুদীর দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে দেখিলেই ঘোড়ার কথা মনে হয়। মুখটা ঠিক ঘোড়ার মুখের মত—খানিকটা যেন লম্বা হইয়া সামনের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। মাথার সামনের দিকে লম্বা লম্বা চুল, দাঁতগুলাও লম্বা লম্বা এবং এবড়ো-খেবড়ো, যেন একটা আর-একটার ঘাড়ে চড়িবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত দাঁতেই বিশ্রী হলুদ রঙের ছোপ। গায়ে একটা আধময়লা কামিজ, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা, পরনের কাপড়টাও ময়লা, কিন্তু বেশ কায়দা করিয়া মালকোচা মারিয়া পরা। দেখিলে ঘৃণা হয়। কিন্তু ভয় হয়, ভদ্রলোকের চোখ দুইটি দেখিলে। খুব

বড় বড় কিংবা খুব ছোট ছোট নয়, মাঝারি ধরনের সাধারণ চোখ। এককালে হয়তো সাধারণ চোখের মতই খানিকটা সাদা এবং খানিকটা কালো অংশ ছিল, এখন কিন্তু সাদা অংশটি পীতাভ এবং কালো অংশটি বাদামী গোছের হইয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শনে ইহাতে হয়তো ভীতিকর কিছু দেখা যাইবে না, কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলেই ভয় হইবে। ভদ্রলোক যদিও জ্ঞাতসারে সর্বদাই চোখের দৃষ্টিতে একটা সহৃদয়তার সুন্দর পরদা টাঙাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হইলেই পরদা সরিয়া যাইতেছে এবং তাহার অন্তরালে যে দৃষ্টি দেখা যাইতেছে, তাহা মানুষের নয়—পিশাচের। পকেট হইতে চিনাবাদাম বাহির করিয়া ভদ্রলোক খোলা ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া মুখে ফেলিতেছেন এবং লক্ষ্য করিতেছেন, মুদীর দোকানে খরিদ্দারের ভিড় কখন কমিবে। মুদীর দোকান নির্জন না হইলে তাঁহার সওদা খরিদ করা হইবে না।

একটু পরেই মুদীর দোকান নির্জন হইল এবং খগেশ্বরবাবু ওরফে যতীনবাবু ওরফে কেষ্টবাবু ওরফে তিন নম্বর আগাইয়া গেলেন এবং মুদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কর্তা, আমার সওদাটা এবার দাও দিকি।

কি চাই বলুন?

বেশি কিছু নয়, আধ-পোটাক সুপুরি। সবগুলি কিন্তু কানা হওয়া চাই।

মুদী একটু বিস্ময়ের ভান করিল। বলিল, সবগুলো কানা? কি হবে কানা সুপুরি দিয়ে?

হলুদ রঙের দন্তগুলি বিকশিত করিয়া খগেশ্বর বলিলেন, ওষুধ।

কিসের ওষুধ?

চুলকোনির।

মুদী বাছিয়া বাছিয়া আধ পোয়া কানা সুপারি ওজন করিয়া দিল এবং প্রসঙ্গত বলিল, কারবালা লেনের মোড়ে একটা বিড়িওয়ালা আছে, চুলকোনির অব্যর্থ ঔষধ সে জানে। খগেশ্বর ঠিকানাটা টুকিয়া লইলেন। এই ঠিকানাটারই প্রয়োজন। এই ঠিকানা জনৈক কানা-সুপারি-ক্রেতাকে দিবার জন্য মুদীও পয়সা খাইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল।

কারফরমা লেন চিৎপুর-অঞ্চলে। একটি ট্যাক্সি সহযোগে খগেশ্বর রওনা হইলেন। কারফরমা লেনের কাছাকাছি আসিয়া ট্যাক্সিটা ছাড়িয়া দিলেন এবং কিছুটা দূর হাঁটিয়া গিয়া দেখিলেন, কারফরমা লেনের মোড়ে সত্যই একটা বিড়ির দোকান রহিয়াছে। থাকিবেই, তাহা খগেশ্বরবাবু জানিতেন। জনৈক বৃদ্ধ মিয়া বসিয়া বিড়ি পাকাইতেছিল।

খগেশ্বর আগাইয়া গিয়া বলিলেন, মিয়াসাহেব, ভাল গোলাপী বিড়ি চাই এক বাণ্ডিল।

মিয়াসাহেব বিড়ি দিল।

খগেশ্বর বলিলেন, আর একটি মেহেরবানি করতে হবে। শুনেছি, তুমি খুজলির ভাল দাবাই জান, ব'লে দিতে হবে সেটি আমাকে।

মিয়াসাহেব সবিস্ময়ে বলিল, খুজলির দাবাই! আমি জানি, তা কে বললে আপনাকে?

এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে খগেশ্বর বলিলেন, যে মুদীর কাছ থেকে কানা সুপুরি কিনলাম আধ পোয়া, সেই তো তোমার নাম বাতলালে মিয়াসাহেব।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে মিয়াসাহেব একবার খগেশ্বরের পানে চাহিল। বলিল, দেখি সুপুরি।

মিয়াসাহেব সুপারিগুলি একটি একটি করিয়া নিরীক্ষণ করিল। হাঁ, সবগুলিই কানা বটে। বলিল, দাবাই আমার কাছে নেই, আছে হাড়কাটা গলির হীরেমন বিবির কাছে। তাকে গিয়ে বলুন, আমার খুজলি হয়েছে, আপনার বাঁ পায়ের ছেঁড়া পয়জারখানার ধুলো আমার একটু চাই। এই বললেই যা চাইছেন, তা পাবেন

মিয়াসাহেব গম্ভীর মুখে পুনরায় বিড়ি পাকাইতে শুরু করিল। মিয়াসাহেব আর কোন কথা বলেন না দেখিয়া খগেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, ঠিকানাটা?

ঠিকানাটা নিতে হ'লে সুপুরিগুলি রেখে যেতে হবে।

বেশ।

সুপারিগুলি হস্তগত করিয়া মিয়াসাহেব হীরেমন বিবির ঠিকানাটা দিল।

হাড়কাটা গলিতে হীরেমন বিবির দ্বারস্থ হইয়া খগেশ্বর দেখিলেন হীরেমন নামটা শুনিয়া অন্তর যেরূপ উন্মুখ হইয়া উঠে, বিবি আসলে সেরূপ কিছু নহেন। এককালে হয়তো রূপসী ছিলেন, এখন কিন্তু কুশ্রী, নানা রোগগ্রস্ত জীর্ণ-শীর্ণ বারাঙ্গনা। রুক্ষ কেশ, কোটরগত চক্ষু, কঙ্কালসার দেহ একটা খাটের উপর বসিয়া আছে, হাঁপানির টান উঠিয়াছে।

স্বল্পান্ধকার ঘরটাতে প্রবেশ করিতেই হীরেমন অতি কষ্টে প্রশ্ন করিল কে, কি চাই?

খগেশ্বর তাঁহার বাঁ পায়ের ছেঁড়া পয়জারের ধূলি প্রার্থনা করিলেন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে হীরেমন বিবি বলিল, আপনি ক নম্বর?

তিন নম্বর।

কাকে কাকে চেনেন আপনি?

খগেশ্বরবাবুকে, হারাণবাবুকে, যতীন্দ্রবাবুকে, কেষ্টবাবুকে আর ম্যানেজারবাবুকে।

তা হ'লে এই রসিদটায় সই ক'রে দিন।

হীরেমন অতি কষ্টে উঠিল এবং একটি তোরঙ্গের ভিতর হইতে একটি তালা-লাগানো ছোট বাক্স এবং একটি কাগজ বাহির করিল। কাগজে লেখা ছিল, হীরেমন বিবির নিকট ঔষধ পাইলাম।

ওইটেতে সই ক'রে দিন।

খগেশ্বর পকেট হইতে একটি ছোট কপিং পেন্সিল বাহির করিয়া বাঁ হাতে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখিলেন, তিন নম্বর। এই স্বল্প পরিশ্রম করিয়াই হীরেমন বিবি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হাঁপানিটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামিয়া থামিয়া সে বলিল, এই বাক্সটা নিয়ে যান। ওর ভেতরে সব লেখা আছে। বাক্সে হরফওলা তালা লাগানো আছে। তালা খোলবার কৌশল আপনি জানেন তো?

না।

আমিও জানি না।

তা হ'লে খুলব কি ক'রে?

মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে যে অন্ধ ভিখিরীটা আঁচল পেতে ব'সে থাকে মেডিকেল কলেজের সামনে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন—ক পয়সায় দিন চলে তোমার? সে যা উত্তর দেবে, সেই কথাটি অক্ষর সাজিয়ে ঠিক করলেই তালা খুলে যাবে।

আচ্ছা।

খগেশ্বর বাক্সটা লইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় হীরেমন বিবি বলিল, বলবেন ম্যানেজারবাবুকে, আমি মরছি, তাঁর কি একটুও দয়া হয় না আমার ওপর? মাসে মাত্র দশ টাকায় কি চলে আমার?

হীরেমন বিবি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

খগেশ্বর বলিলেন, বলব আমি।

বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। ম্যানেজারবাবুকে বলিলেই যদি টাকা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। খগেশ্বর সিংহকে তাহা হইলে সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে নানা ঝঞ্ঝাট সহ্য করিয়া এখানে আসিতে হইত না।

মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে মেডিকেল কলেজের সামনে একটা অন্ধ ভিখারী তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল—এক পয়সা দিলা দে রাম—

খগেশ্বর তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মোড়টা অপেক্ষাকৃত জনবিরল হইতেই নিম্নস্বরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, ক পয়সায় দিন চলে তোমার?

ভিক্ষুক খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

খগেশ্বর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

ভিক্ষুক মৃদু কণ্ঠে যেন আপন মনেই বলিল, বাক্‌সা লায়া হায়"তো সেভেন, নেই লায়া হায় তো ঢন্‌ঢন্‌।

খগেশ্বর সরিয়া গিয়া একটা ল্যাম্প-পোস্টের নিকটে দাঁড়াইয়া এলোমেলো ইংরেজী অক্ষরগুলি ঘুরাইয়া seven কথাটি সাজাইয়া ফেলিলেন। তালা খুলিয়া গেল।

বাক্সের ভিতর একটি ঠিকানা ও চাবি রহিয়াছে। চাবির গায়ে একটি কাগজে লেখা 'খিড়কি-দরজা'। ম্যানেজারবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে।

ঠিকানায় পৌঁছিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। চাবি দিয়া খিড়কি-দরজা খুলিয়া খগেশ্বর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি। স্চীভেদ্য অন্ধকার। অন্ধকার প্রাঙ্গণে খগেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল, উপরের ঘর হইতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ যেন ভাসিয়া আসিতেছে। মিনিটখানেক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া খগেশ্বর পকেট হইতে একটা দিয়াশালাই-কাঠি বাহির করিলেন এবং সেটা নাকে দিয়া খুব জোরে একবার হাঁচিলেন। হাঁচির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতলের একটি কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। উপরে উঠিবার সিঁড়িটাও আলোকিত হইল। খগেশ্বর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন এবং গিয়াই বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবুর সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। সিঁড়ির ঠিক সামনের ঘরটাতেই তিনি ফরাশে উপবিষ্ট ছিলেন। সর্বাঙ্গে দামী শাল জড়ানো, মুখে প্রসন্ন হাস্য। বাড়িতে জনপ্রাণী আর কেহ নাই।

এই যে শ্রীগরুড়, এসে পড়েছ দেখছি!

বিনীত নমস্কার করিয়া খগেশ্বর বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিশেষ বেগ পেতে হয় নি তো? মুদী, বিড়িওয়ালা, হীরেমন আর অন্ধ ভিখিরী এই চারজনকে পার হয়ে এসেছ নিশ্চয়?

সশ্রদ্ধ কণ্ঠে খগেশ্বর বলিলেন, তাই এসেছি।

ম্যানেজার স্মিতমুখে চাহিয়া আছেন দেখিয়া খগেশ্বর বলিলেন, ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারলাম না।

কর্তার কত বিচিত্র খেয়াল, আমিই কি ছাই সব বুঝতে পারি! যা বলেন,

হুকুম তামিল ক'রে যাই। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ শুনে কর্তা বললেন, ওকে সোজাসুজি ঠিকানা দিও না। মুদী, বিড়িওয়ালা আর হীরেমনের কাছে মুখটা চিনিয়ে তবে যেন আসে। সেই রকম ব্যবস্থাই করলাম। হ'ল অনর্থক কতকগুলো অর্থব্যয়।

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, তাতে আমারই বা কি, তোমারই বা কি! লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

খগেশ্বর বলিলেন, উদ্দেশ্যটা কি কিছু বুঝলেন?

ঠিক অবশ্য বুঝি নি। যতদূর আন্দাজ করছি সেটা এই যে, ওই মুদী, ওই বিড়িওয়ালা আর ওই হীরেমন ইদানীং কর্তাকে কিছু মাল সাপ্লাই করেছে। ভবিষ্যতে তুমি যদি দেহাত থেকে কোন টাটকা মাল আমদানি ক'রে আনতে পার—ওদের কারও হেফাজতে এনে দিলেই মালটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। সেইজন্যেই সম্ভবত তোমার মুখটা চিনিয়ে দিলেন ওদের। কাজের লোক ওরা, মাল যোগান দেয়, পাহারা দেয়, পাচার করে। এসব অবশ্য আমার আন্দাজ। কর্তার কথা খোদ কর্তাই জানেন। যাক ওসব কথা। তোমার কথাই শুনি। আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে চেয়েছ কেন শুনি? সংক্ষেপে বল।

খগেশ্বর সংক্ষেপেই বলিলেন, টাকা—

টাকা? কত টাকা?

যা দেবেন। দিন চলা ভার হয়েছে আমার। চাকরি গেছে, পরিবার গেছে, মেয়ে গেছে, কি-ই বা আছে! সবই তো জানেন আপনি। আপনার কর্তার সেবাতে জীবনটাই উচ্ছুগ্‌গু করেছি বলতে গেলে।

ম্যানেজারবাবু কিয়ৎকাল খগেশ্বরের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, গাঁজা কতটা ক'রে খাও আজকাল?

আজ্ঞে, দৈনিক চার আনার।

সৌদামিনীর কাছে পাও-টাও কিছু?

একটা আধলা না। গেলে দেখাই করে না। নিজের মেয়ে-পরিবারি যে

এমন দুশমনের মত ব্যাভার করবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। না খেতে পেয়ে মরছিল, লাথি-ঝাঁটা খেয়ে দিন কাটত, আপনার কাছে এনে দিলাম, আপনি বললেন, কর্তার দুজনকেই পছন্দ হয়েছে। নিজের চোখেও দেখলাম। এখন বেশ সোনাদানা প'রে দিব্যি জাঁকিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে মশাই, আর বললে বিশ্বাস যাবেন না ম্যানেজারবাবু, আমাকে বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব।

খগেশ্বরই পুনরায় কথা কহিলেন, কর্তা কি আজকাল যান-টান ওদের কাছে?

রামোঃ! কর্তার শখ ওই দু-এক দিনই। দু দিনেই পুরনো হয়ে যায়, নতুনের জন্যে ক্ষেপে ওঠেন। নতুন মাল সন্ধানে থাকে তো বল, ভাল দাম দিয়ে কিনবেন। হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ পেতে পার।

একটা ভালর চেষ্টায় আছি—

বৃদ্ধের চক্ষু দুইটি আগ্রহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন, বেশ তো, যোগাড় কর।

আপাতত কিছু চাই আমার, বড় অভাবের মধ্যে আছি।

বৃদ্ধ পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া কুড়িটি টাকা খগেশ্বরকে দিলেন এবং বলিলেন, এখন এই নিয়ে যাও, দিন পনেরো পরে এসো আবার?

এই বাড়িতেই?

না, এ বাড়িতে নয়; এ বাড়ি বদলাতে হবে। আর বল কেন, সাত দিন অন্তর অন্তর বাড়ি বদলাতে হচ্ছে। ঠিকানা ঠিক পাবে এবার যেমন ক'রে পেলে। এবার অবশ্য মুদী বিড়িওলা আর হীরেমন থাকবে না। অন্য লোকদের মারফৎ আসবে। কর্তার হুকুম এই। প্রত্যেকবার নতুন রকম সঙ্কেতের তালা দিতে হবে। এবারকার তালাটা ঠিক খুলেছিল তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেভেন কথাটা হতেই খুলে গেল তালা।

তালা চাবি আর বাক্স দিয়ে যাও সব। এবার অন্যরকম তালা দিতে হবে।

এই যে।

খগেশ্বর তালা-সমেত কাঠের বাক্স ও খিড়কির চাবিটা ম্যানেজারবাবুর হাতে দিলেন।

সহসা চাপা গোঙানিটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

খগেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, ওটা কিসের শব্দ?

একজন আমলার জ্বর হয়েছে, সে-ই ও-রকম করছে ও-ঘরে প'ড়ে প'ড়ে—ও কিছু নয়।

দ্বিতলে অপর প্রান্তে অজ্ঞান বন্দিনীর কথা খগেশ্বরকে বলিবেন, এমন কাঁচা লোক বৃদ্ধ নহেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খগেশ্বরকে বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও এখন। বড় ক্লান্ত আছি আজ, ঘুমুব এবার।

খগেশ্বর হাত জোড় করিলেন।

ওই তো তোমার দোষ শ্রীগরুড়, কিছুতেই তোমার খাঁই মেটানো যায় না।

আরও দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

খগেশ্বর ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

খগেশ্বর চলিয়া গেলে ম্যানেজার ধীরে ধীরে উঠিলেন ও খিড়কির দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিলেন। তাহার পর কুব্জ দেহটা ঈষৎ উন্নমিত করিয়া খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। গোঙানিটা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ চীৎকারে পরিণত হইল। বৃদ্ধ বুঝিলেন, এইবার জ্ঞান হইয়াছে, আর দেরি করা অনুচিত হইবে।

বারান্দাটা পার হইয়া ওদিকে একটা ঘরের দিকে দ্রুতপদে তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেই ঘরটার ভিতর হইতেই চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছিল। ঘরের তালা খুলিয়া বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেন।

হতবুদ্ধি মেয়েটির চীৎকার ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। পর-মুহূর্তেই আরও তীব্র তীক্ষ্ণ মর্মান্তিকরূপে তাহা অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ নিঃশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

আর কিছু শোনা গেল না।

১৪

অচিনবাবুর কারখানি নিঃশব্দগতিতে আসিয়া বেলার বাসার সম্মুখে থামিল। জনার্দন সিংহের মারফৎ নিজের কার্ডখানি পাঠাইয়া দিয়া অচিনবাবু স্টিয়ারিঙের উপর ভর দিয়া বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই বেশবাস সম্বৃত করিয়া স্মিতমুখে বেলা বাহির হইয়া আসিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, আপনিই কার্ড পাঠিয়েছেন?

অচিনবাবু মোটর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং সমস্ত মুখচ্ছবিতে নিখুঁত ভদ্রতা বিকিরণ করিয়া অতিশয় সুষ্ঠু ভঙ্গীতে একটি নমস্কার করিলেন। রাস্তায় দাঁড়াইয়া আলাপ করাটা অশোভন হইতেছে দেখিয়া বেলা বলিলেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

উভয়ে আসিয়া বাহিরের ঘরটাতে উপবেশন করিলেন। অচিনবাবু হাসিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া বলিলেন, একটি দয়া করতে হবে মিস মল্লিক।

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মেয়ে বেলা নহেন। ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া তিনি চাহিয়া রহিলেন। অচিনবাবু বলিলেন, আপনার বাজনার খ্যাতি চারিদিকে শুনতে পাই, আপনার নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই তাও জানি, তবু এসেছি নিজের জন্যে নয়, পরের জন্যে।

ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না?

লিলুয়ায় একটা বাগান-বাড়ি ভাড়া নিয়ে চ্যারিটি পারফরম্যান্স করছি আমরা। নাচ, গান, বাজনা থাকবে সব রকমই। এর থেকে যা টাকা বাঁচবে, সেটা ভাল কাজেই খরচ হবে। মেয়েদের একটা ইস্কুল করবার ইচ্ছে আছে আমাদের। আপনাকে একটা কিছু বাজাতে হবে সেখানে—এস্রাজ সেতার যা হোক। আমি নিজে কারে ক'রে নিয়ে যাব, কারে ক'রে পৌঁছে দিয়ে যাব—ঘণ্টা-দুয়েকের ব্যাপার।

কখন হবে?

দিন-দশেক পরে, সন্ধ্যে সাতটা থেকে শুরু।

সন্ধ্যেবেলায় আমার ছুটি তো নেই, রাজনা শেখাতে যেতে হয় এক জায়গায়।

বেশ তো, কোথায় বলুন না, একদিনের জন্যে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেব আমি। সে ভার আমি নিচ্ছি।

সেটা ঠিক হয় না।

না না, মিস মল্লিক, কাইণ্ড্লি আপত্তি করবেন না। আপনাকে আমাদের চাইই।

আমাকে মাপ করুন, আমার সময় কম।

বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অচিনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, দেখুন, একটা সৎকার্যের জন্যে একটু ত্যাগস্বীকার যদি না করেন, তা হ'লে—

বেশ, আপনাদের স্কুলে আমি না হয় কিছু চাঁদা দেব।

সে তো দিতেই হবে, এটা হ'ল উপরি পাওনা। আপনি না থাকলে ফাংশনটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। আপনাকে যেতেই হবে।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, আমি কথা দিতে পারলাম না কিন্তু।

বেশ, আর একদিন আসব আমি, কথা আপনাকে দিতেই হবে।

বেলা স্মিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন জবাব দিলেন না। অপ্রত্যাশিত এই বিপদটার হাত হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায়, মনে মনে সেই চিন্তাই তিনি করিতেছিলেন। অচিনবাবু তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আপনি একটু ভেবে দেখুন। সৎকার্যের জন্যে কিছু করা একটা মহাপুণ্য তো বটেই, তা ছাড়া এর আর একটা দিকও আছে। অনেক বড় বড় লোকের কাছে টিকিট বিক্রি করছি আমরা, তাঁদের কাছেও আপনার গুণের পরিচয়টা দেওয়া হবে। যাই বলুন, মিড্ল্ ক্লাস পিপ্ল তো আপনাদের গুণের যথোচিত মূল্য দিতে পারে না।

অচিনবাবু আরও হয়তো কিছু বলিতেন, কিন্তু বেলা সহসা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, ভেবে দেখব। আসুন তা হ'লে।

বেলা ভিতরে চলিয়া গেলেন।

অচিনবাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া চিন্তাকুল-মুখে অত্যন্ত নিপুণভাবে একটি সিগারেট ধরাইলেন, জ্বলন্ত দিয়াশলাই-কাঠিটা খানিকক্ষণ ধরিয়া থাকিয়া তাহার পর সেটা নাড়িয়া নিবাইয়া ফেলিয়া দিলেন এবং এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। নিঃশব্দগতিতে গাড়ি গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

অচিনবাবুর গাড়ি চলিয়া যাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসর গুপ্তের গাড়িখানি আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসর গুপ্ত গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন এবং জনার্দন সিংহের সেলামের প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া বাহিরের ঘরটাতে আসিয়া প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় বেলার সহিত তাঁহার মুখামুখি দেখা হইয়া গেল। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেলার ওষ্ঠাধর নিমেষের জন্য কাঁপিয়া থামিয়া গেল। আত্মসম্বরণ করিয়া বেলা সহজকণ্ঠেই বলিলেন, আমি বেরুচ্ছিলাম, আপনার কি বিশেষ কোন কাজ আছে?

তোমাকে কিছু বলতে চাই।

প্রফেসর গুপ্ত কিছুদিন হইতে বেলাকে, অবশ্য বেলার সম্মতিক্রমেই, 'তুমি' বলিতে শুরু করিয়াছেন।

আমাকে? বেশ বলুন।

এখানে সে কথা বলা যাবে না, চল, মাঠে যাই।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেলা কয়েক মুহূর্ত নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, বেশ, তাই চলুন। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।

কি, বল?

আপনার বলবার মত যত কথা আছে, আজই শেষ ক'রে ফেলতে হবে।

এর জন্যে মাঠে যতক্ষণ ব'সে থাকতে বলেন, আজ ব'সে থাকব। কাল থেকে কিন্তু আর নয়।

প্রফেসর গুপ্ত অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনের ভিতর কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা তিনি বলিলেন, বেশ তাই হবে।

তা হ'লে একটু দাঁড়ান, এখুনি আসছি আমি।

বেলা দেবী ভিতরে গেলেন ও মাঠে যাইবার উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

চলুন।

কিছুক্ষণ পূর্বে সূর্য অস্ত গিয়াছে, মাঠে অন্ধকার নামিতেছে। একটি নির্জন স্থান বাছিয়া বেলা ও প্রফেসর গুপ্ত উপবেশন করিলেন। মোটরে যদিও উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া ছিলেন, কিন্তু একটিও বাক্য-বিনিময় হয় নাই।

প্রফেসর গুপ্তই প্রথমে কথা কহিলেন, তুমি মানুকে কি সত্যিই আর বাজনা শেখাবে না?

ও ঘটনার পর আর তো আপনার বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার স্ত্রী আফিং খেয়েছিলেন আমার জন্যে—এ কথা শোনার পর আর কি আপনার বাড়িতে যাওয়া চলে, আপনিই বলুন? ভাগ্যিস বেঁচে গেছেন, না বাঁচলে কি হ'ত বলুন তো?

সেটা কি আমার-দোষ?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বেলা বলিলেন, আপনার দোষ সত্যি আছে কি না, সে অপ্রিয় আলোচনা করবার অধিকার আমার নেই। আমার নিজের কোন দোষ নেই, এইটুকুই আমি জানি। আর সেটা আপনিও জানেন। অথচ—

আমার দোষ ক্ষালনের চেষ্টা আমি করছি না, কারণ এটাকে আমি দোষ ব'লে মনে করি না। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে এবং ভাবে ভঙ্গীতে সেটা হয়তো প্রকাশ করেছি, তাতে দোষের তো কিছু নেই।

আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে নিশ্চয় দোষের আছে। আপনি বিবাহিত, সমাজের নিয়ম মেনেই আপনার চলা উচিত। হঠাৎ আমাকে ভাল লাগবার কারণই বা কি, তা তো আমি বুঝতে পারছি না। আরও বুঝতে পারছি না, সে কথা আপনি প্রকাশ করছেন কেন?

প্রফেসর গুপ্ত ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভালবাসা কোন দিন কোন আইন মেনে চলে নি। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, এর বেশি আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি জীবনে সুখী নই বেলা।

প্রফেসর গুপ্তের একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সুখী নন কেন? আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালবাসতে পারেন নি?

পারলে আমার এ দুর্দশা হ'ত না।

পারেন নি কেন? আপনার স্ত্রী তো লোক খারাপ নন।

লোক খারাপ কি ভাল, তা বিচার ক'রে কেউ কাউকে ভালবাসে না। মন্তর প'ড়ে বিয়ে করলেই ভালবাসা জন্মায় না। মনের মিল হওয়াটাই আসল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার এতটুকু মনের মিল নেই—কোন দিক থেকেই নেই। আমার মানসিক সুখ-দুঃখ আনন্দ-অবসাদের সঙ্গে আমার স্ত্রীর এতটুকু সম্পর্ক নেই। আমি উপার্জন করব, তিনি খরচ করবেন, আমার চালচলনের প্রতি তীক্ষ্ণ নৈতিক দৃষ্টি রাখবেন, কোন মেয়ের সঙ্গে সামান্য ঘনিষ্ঠতা দেখলে তা নিয়ে কথায় কথায় শ্লেষ করবেন, কোন কারণে যদি তাঁর স্বার্থে একটুও আঘাত করি, তা হ'লে তাই নিয়ে গঞ্জনা দেবেন, কথায় কথায় প্রকাশ করবেন যে, তাঁর মত মহিয়সী মহিলা আমার মত লোকের হাতে প'ড়ে নষ্ট হয়ে গেলেন—এই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। ঝগড়া অথবা তর্ক ছাড়া তাঁর সঙ্গে অন্য কোন প্রকার আলাপ বহুকাল হয় নি, হওয়া সম্ভবও নয়। রাস্তার একটা অশিক্ষিত কুলি অথবা অমার্জিত গাড়োয়ানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভব নয়। কারণ আমাকে তিনি সর্বদাই তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করেন এবং

সর্বদাই সন্দেহ করেন যে, হয়তো আমি তাঁকে সে বিষয়ে ফাঁকি দিচ্ছি। আমি অবশ্য সে সন্দেহের ন্যায্য খোরাক যে সরবরাহ না করি তা নয়, করি—কারণ আমার মন সর্বদাই ক্ষুধিত।

একটু থামিয়া প্রফেসর গুপ্ত পুনরায় বলিলেন, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে ভেবেছিলাম যে, তোমার মধ্যে আমার মন হয়তো আশ্রয় পাবে। সব কথা শুনলে হয়তো তুমি আমার দুঃখ বুঝবে, হয়তো একটু প্রশ্রয় পাব। আমার স্ত্রী নাটকীয় ভঙ্গী ক'রে এক ডেলা আফিং খেয়েছেন ব'লেই তাঁর দুঃখটা তুমি বড় ক'রে দেখো না। আমার দুঃখ আরও গভীর।

প্রফেসর গুপ্ত নীরব হইলেন। অনেকক্ষণ কেহই কোন কথা বলিলেন না। অনেকক্ষণ পরে প্রফেসর গুপ্তই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

তুমি কিছু বলছ না যে?

বলবার কিছুই নেই।

কিছুই নেই?

না।

প্রফেসর গুপ্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বেলা বলিলেন, আপনার আর কিছু কি বলবার আছে?

সবই তো বললাম।

তবে চলুন, এবার ওঠা যাক।

বেলা উঠিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ওদিকে কোথা? আমার কার যে এদিকে। রাস্তা ভুলে গেলে নাকি?

রাস্তা ভুলি নি। আমি ট্যাক্সি ক'রে ফিরব। আপনি বাড়ি যান।

বেলা ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের দিকে চলিয়া গেলেন।

প্রফেসর গুপ্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

মৃন্ময়কে আজকাল প্রায়ই বাহিরে যাইতে হইতেছে। কি যেন এক ছাই কাজ জুটিয়াছে—বাড়িতে একদণ্ড থাকিবার উপায় নাই। এ রকম চাকরি করার চেয়ে অনাহারে থাকাও বরং ঢের ভাল। আজ এখানে, কাল সেখানে, একদিনও কি সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার জো আছে! যেন চরকির মত বেড়াইতেছে। একটা মানুষ কতই বা ঘুরিতে পারে, সকল জিনিসেরই তো একটা সীমা আছে। হাজার হউক, মানুষ তো, কল তো আর নয়। উপরওয়ালা সাহেবদের জ্ঞান-গম্যি দয়া-মায়া বলিয়া কি কিছুই নাই। উনি না হয় ভালমানুষ লোক, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না, মুখ বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া যান, তাই বলিয়া তাঁহারই উপর সব কাজের ভার চাপাইতে হইবে? আক্কেলকে বলিহারি যাই। ইত্যাকার নানারূপ চিন্তা ও স্বগতোক্তি করিতে করিতে হাসি হাতের লেখা লিখিতেছিল। যদিও চিনু এখনও পর্যন্ত স্বীকার করিতেছে না, কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে হাসির হাতের লেখা সত্যই উন্নতি লাভ করিয়াছে। খানিকটা লিখিয়া হাসি সোজা হইয়া বসিল, খোঁপাটা এলাইয়া পড়িয়াছিল, দুই হাত দিয়া সেটা ঠিক করিয়া লইল, তাহার পর খাতাখানাকে একটু দূরে সরাইয়া নানাভাবে নিজের লেখাটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই হাতের লেখায় স্বামীকে চিঠি লিখিলে তাহা কি খুব হাস্যকর হইবে? উনি হাসিবেন? কক্‌খনও না। বরং খুশিই হইবেন। আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। কালই একখানা চিঠি লিখিতে হইবে। খুব লুকাইয়া কিন্তু। ঠাকুরপো যেন না জানিতে পারে। ঠাকুরপো জানিতে পারিলে কিন্তু লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। জ্বালাইয়া মারিবে। এমনই তো ফাজিলের চূড়ামণি। চিঠিটা লিখিয়া ঝিয়ের মারফৎ রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেই চলিয়া যাইবে।

নীচে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। এমন সময় কে আসিল?

বউদি, কপাট খোল।

চিন্ময়ের গলার স্বর। ঠাকুরপো আজ এত সকাল সকাল কলেজ হইতে ফিরিল কেন? হাসি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, মাত্র আড়াইটা বাজিয়াছে। এত সকাল সকাল আসিবার মানে কি? অকারণ ভয়ে হাসির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। খারাপ খবর-টবর পায় নাই তো? নীচে পুনরায় কড়া নাড়িয়া চিন্ময় ডাকিল, বউদি!

হাসি তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

কপাট খুলিতেই চিন্ময় বলিল, ঘুমুচ্ছিলে তো?

আহা, ঘুমুব কেন, লিখছিলাম। তুমি এখন এলে যে?

ক্লাস হ'ল না, প্রফেসরের অসুখ করেছে।

চিন্ময় উপরে চলিয়া গেল। কপাট বন্ধ করিয়া হাসিও উপরে আসিল। হাসির হাতের লেখা দেখিয়া চিন্ময় বলিল, সুন্দর হচ্ছে তো লেখা তোমার বউদি!

যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না।

হাসি হাতের লেখার খাতাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ঠাট্টা নয়, সত্যি, বেশ হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি ডিক্‌টেশন লিখতে পার?

ডিক্‌টেশন কি আবার?

আমি বলব, তুমি শুনে শুনে লিখবে।

তা আমি পারি বোধ হয়।

ঘোড়ার ডিম পার।

নিশ্চয় পারি।

এই নাও কাগজ, লেখ।

ভুল হ'লে ঠাট্টা করতে পারবে না কিন্তু, ব'লে দিচ্ছি।

না না, ঠাট্টা করব কেন? লেখই না আগে, দেখি।

হাসি কাগজ কলম লইয়া বসিল।

চিন্ময় বলিতে লাগিল—

সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তুমি নটার সময় গোলদীঘির পূর্বদিকের একটা গেটে থাকিও। ইতি—ক খ গ ঘ

লেখা হইয়া গেলে চিন্ময় বলিল, কই, দেখি! বাঃ, চমৎকার হয়েছে! থাক্ আমার কাছে এটা।

কাগজখানা সে পকেটে পুরিয়া ফেলিল।

হাসি প্রশ্ন করিল, ওর মানে কি?

মানে আবার কি, যা মনে এল তাই বললাম।

চিন্ময় একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, অমন ক'রে চেয়ে আছ যে? এ কাগজটা এখন থাক্ আমার কাছে। এক মাস পরে আবার তোমাকে দিয়ে লেখাব খানিকটা, তারপর দুটো মিলিয়ে দেখব, উন্নতি হয়েছে কি না! —এই বলিয়া সে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

এসেই যাচ্ছ কোথায় আবার?

মাঠে। খুব ভাল ম্যাচ আছে একটা, দেখে আসি।

খিদে পায় নি? খাবে না কিছু?

না।

চিন্ময় বাহির হইয়া গেল।

হাসি পুনরায় লিখিতে বসিল।

১৬

যেমন করিয়া হউক রোজগার করিতে হইবে। উপার্জন করিতে না পারিলে মানুষের কোন মূল্যই নাই। টাকা দিয়া প্রেম কিনিতে যাইবার প্রয়াস হাস্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু দরিদ্রের প্রেম করিতে যাইবার প্রয়াস অধিকতর হাস্যকর। যে নিঃস্ব, তাহার এই মানসিক বিলাসের অধিকার নাই। তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য যতই না কেন প্রচুর থাকুক, বাহিরের ঐশ্বর্য না থাকিলে তাহা খনির তিমিরগর্ভে রত্নরাজির মত চিরকালই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবে।

অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করিবার জন্যই বাহিরের ঐশ্বর্যের প্রয়োজন। খনিকে খনন না করিলে মণির সন্ধান মিলিবে কিরূপে? মণি আবিষ্কার করিবার পর খনিত্র অনাবশ্যক, কিন্তু আবিষ্কারের পূর্বে খনিত্র না হইলে চলে না। খনিত্র একটা চাইই। কিছু টাকা না থাকিলে কিছুই করা যায় না। টাকাটা যে অতি তুচ্ছ জিনিস, তাহাও টাকা না থাকিলে প্রমাণ করা যায় না। অর্থ থাকিলে তবেই তাহা ত্যাগ করিয়া ত্যাগের মহত্ত্ব প্রকট করা সম্ভব, কপর্দকহীন দরিদ্রের মুখে ত্যাগের মহিমার কথা মানায় না। অর্থের অপেক্ষা প্রেম বড়, এ কথার মর্ম মুক্তোকে বুঝাইতে হইলে প্রথমেই মুক্তোকে পাওয়া দরকার এবং সেজন্য টাকার প্রয়োজন। মুক্তোকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলে তাহার মনে নিজেকে শঙ্কর নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস নিজের উপর তাহার আছে। কিন্তু মুক্তোকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়াই যে দুরূহ! অত টাকা কোথায় পাইবে সে? অবিলম্বে উপার্জন করা দরকার, কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব? এই কলিকাতা শহরে কে তাহাকে চেনে? চিনিলেও বা কত টাকার চাকরি সে পাইতে পারে? বড় জোর মাসে পঞ্চাশ টাকার। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? অল্প টাকায় মুক্তোকে তো পাওয়া যাইবে না। কেহ কিছু টাকা ধার দেয় না? মাসে মাসে তাহাকে শোধ করিয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু কে-ই বা ধার দিবে? সহসা শঙ্করের শৈলর কথা মনে পড়িল। সে বড়লোকের পত্নী। তাহার হাতে কিছু টাকা থাকিতে পারে, তাহার নিকট হইতে কোন ছুতায় ধার করিয়া আনাও শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। তাহার পরে ধীরে ধীরে টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিলেই চলিবে। একটা চাকরি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রফেসর গুপ্ত চেষ্টা করিলে একটা টুইশনি হয়তো তাহাকে যোগাড় করিয়া দিতে পারেন।

রবিবারের দুপুর। শঙ্কর বিছানায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিল, উঠিয়া বসিল। শৈলর সহিত আজই দেখা করিতে হইবে। প্রফেসর গুপ্ত চেষ্টা

করিলে একটা টুইশনিও হয়তো তাহাকে যোগাড় করিয়া দিতে পারেন—তাঁহার সহিতও দেখা করা দরকার। শঙ্কর তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। শৈল একদিন যাইতেও বলিয়াছিল তাহাকে। এখন হয়তো সে একা আছে।

রাস্তায় বাহির হইতেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। শঙ্কর তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তিনি কিন্তু শঙ্করকে চিনিয়াছিলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, চিনিতে পারছেন ?

চিনিতে না পারিলেও সব সময় সেটা বলা যায় না। শঙ্কর স্মিতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকাশবাবুই পুনরায় বলিলেন, চেনবার কথা অবশ্য নয়, একটিবার মাত্র তো দেখা। প্রফেসর মিত্রের বাড়িতে টি-পার্টিতে— হয়েও গেল অনেক দিন।

শঙ্করের মনে পড়িল। সোনাদিদি ইঁহাকে শঙ্করের সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাও মনে পড়িল, সোনাদিদি ইঁহার নাম দিয়াছিলেন—অগতির গতি। ভদ্রলোক নাকি পরোপকারী। শঙ্কর আর একবার প্রকাশবাবুর দিকে ভাল করিয়া চাহিল। খদ্দরের মোটা কোট ও মোটা চাদর গায়ে, কয়েক দিনের না-কামানো গোঁফ-দাড়ি মুখে, চক্ষুতে সরল দৃষ্টি। প্রকাশবাবু ঠিক তেমনই আছেন।

প্রকাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, আপনার কবিতাটা পড়লাম কাগজে, ভারি সুন্দর লাগল। আমাদের একটা কাগজ বার হচ্ছে, তাতে আপনাকে লিখতে হবে কিন্তু।

আচ্ছা।

সেই হস্টেলেই থাকেন তো এখন ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, যাব একদিন। এখন চলি, নমস্কার।

নমস্কার।

প্রকাশবাবু চলিয়া গেলেন। শঙ্কর পুনরায় পথ চলিতে লাগিল। কিছুদূর অন্যমনস্কভাবে হাঁটিবার পর সহসা তাহার মনে হইল, এ সে কি করিতেছে! শৈলর কাছে হাত পাতিয়া টাকা চাহিবে! শৈলর টাকা লইয়া সে—। না, তাহা অসম্ভব। তাহা সে কিছুতেই পারিবে না।

শঙ্কর ঘুরিয়া অন্যপথ ধরিল। একেবারে বিপরীত দিকে চলিতে শুরু করিল। দ্রুতবেগেই চলিতে লাগিল। কোথায় যাইবে ঠিক নাই। কেবল তাহার মনে হইতেছে, অবিলম্বে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে হইবে, অবিলম্বে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে না পারিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল, কি আশ্চর্য, টাকাটাই শেষে এত বড় হইয়া দাঁড়াইল! মুক্তো তাহাকে চায় না—টাকা চায়! আশ্চর্য!

কপাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল।

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, কেহ নাই। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মুক্তো আসিয়া প্রবেশ করিল।

এ কি, হঠাৎ আপনি যে এ সময়ে?

এলাম।

মুক্তো একদৃষ্টে খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, বসুন। আসছি এখুনি।

শঙ্করকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া মুক্তো বাহির হইয়া গেল। অবকাশ দিলেও যে শঙ্কর বিশেষ কিছু বলিতে পারিত, তাহা নয়। বলিবার মত কোন বক্তব্য তাহার ওষ্ঠাগ্রে ছিল না। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ভাবিতে লাগিল, মুক্তো ফিরিয়া আসিলে তাহাকে কি বলিবে! বলিবার তো কিছু নাই। সত্যই কি কিছুই নাই? সত্যই কি মুক্তো টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না? মুক্তোর মুখ দেখিয়া, কথাবার্তা শুনিয়া তাহা তো মনে হয় না!

আপনি এখানে হামেসা কি করতে আসেন মোসায়, বলেন তো?

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, লুঙ্গি-পরা গুণ্ডা-গোছের একটা লোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ঘাড়ে একদম চুল নাই, সামনে ঘোড়ার মত চুল, মাংসল মুখে নিষ্ঠুর এক জোড়া চোখ, অধরোষ্ঠের নীচে এক গোছা মিশকালো ক্ষুর, দাড়ি নাই, গোঁফ আছে—কিন্তু পুরাপুরি নাই, মাঝখানে খানিকটা কামাইয়া ফেলাতে মাত্র ঠোঁটের দুই পাশে খানিকটা করিয়া ঝুলিতেছে।

শঙ্কর সবিস্ময়ে লোকটার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

যোতলবখানা কি মোসায়ের?

শঙ্কর নির্বাক।

জোবাব দিচ্ছেন না যে বড়?

তোমাকে জবাব দেব কেন, তুমি কে?

হামি তোমার বাপ। সালা হারামিকা বাচ্চা, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

খবরদার।

শঙ্কর হঠাৎ ঘুষি পাকাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই মুক্তো ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

এ কি কাণ্ড! বাঘা, এসব কি হচ্ছে?

বাঘা বলিল, বাঃ, তুমিই তো বিবিজান আসতে বললে হামাকে। আভি বলছো, এসব কি হচ্ছে? গরদনিয়া না দিলে কি এ হারামির বাচ্চা নিকল্‌বে?

আচ্ছা, যা তুই।

বিনা বাক্যব্যয়ে বাঘা বাহির হইয়া গেল। যেন পোষা কুকুর।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, লোকটা কে?

ও বাঘা। আমাদের আপনার লোক।

আপনার লোক মানে?

মুচকি হাসিয়া মুক্তো বলিল, আপনার লোক মানে কি, তা জানেন না? যারা বিপদে আপদে রক্ষে করে, তারাই আপনার লোক। ওরা ছাড়া আমাদের আপনার লোক আর কে আছে, বলুন?

শঙ্কর বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিপদে আপদে রক্ষা করে!

অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, চা আনতে দিয়েছি।

শঙ্কর কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্করবাবু, একটি কথা শুনে যান, দুটি পায়ে পড়ি আপনার—শুনুন—শুনে যান—

শঙ্কর আর ফিরিয়া চাহিল না। যতক্ষণ দেখা গেল, মুক্তো শঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল; কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা গেল না। কতটুকুই বা গলি, শঙ্কর দেখিতে দেখিতে পার হইয়া গেল। মুক্তো তবু সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুণ্যলেশহীন অন্ধকার পতিতা-জীবনে একটিমাত্র পুণ্য-প্রেরণার শিখা জ্বলিয়াছিল। সেই শিখার ইন্ধন যোগাইতে গিয়াই সে নিঃস্ব হইয়া গেল। শঙ্করের মত ছেলেকে সে নষ্ট করিতে চাহে নাই। যেদিন তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—যেমন করিয়া হউক, পঙ্কিলতা হইতে ইহাকে সে রক্ষা করিবে। অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, কিন্তু হার মানে নাই। শঙ্করকে পঙ্ককুণ্ড হইতে সত্যই রক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু এখন তাহার সমস্ত নারী-হৃদয় উন্মথিত করিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল, তাহা স্বস্তির নিশ্বাস নহে। তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কে যেন বলিতেছিল—তুমি এ কি করিলে, এ কি করিলে—ও যে চলিয়া গেল! মুক্তো বুঝিয়াছিল, শঙ্কর আর আসিবে না, শূন্য গলিটার পানে চাহিয়া তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া এমন একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, যাহা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, ব্লাইণ্ড্ লেন, বাহির হইবার পথ নাই। ফিরিতে হইল। কিছুদূর আসিবার পর দেখিতে পাইল, একটা বাড়ির দরজা খুলিয়া একটি মেয়ে বাহির হইয়া সামনের দরজার কড়া নাড়িতেছে। শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

এই গলি থেকে বেরুবার রাস্তাটা কোন্ দিকে বলতে পার? আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।

মেয়েটি বলিল, আর একটু এগিয়ে ডান দিকে গেলেই রাস্তা পাবেন।

শঙ্কর আগাইয়া গেল, আগাইয়া গিয়া সত্যই দেখিল, ডান দিকে বাহির হইবার পথ রহিয়াছে। আরও খানিকটা গিয়া বউবাজারে পড়িল। সামনেই একটা ট্রাম পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। একটু পরেই কিন্তু নামিয়া যাইতে হইল। সঙ্গে পয়সা ছিল না এবং সে কথা মনেও ছিল না। শঙ্কর আবার হাঁটিতে লাগিল। গলির সেই মেয়েটির মুখখানি মাঝে মাঝে মনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ভারি সুন্দর স্নিগ্ধ মুখখানি! মুক্তোর মুখখানিও মনে পড়িল। পড়ুক, কিন্তু মুক্তোর কাছে সে আর যাইবে না। যাইবার আর উপায়ও নাই। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে যবনিকাপতন হইয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। একটা অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্ন হইতে সে সে যেন সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদূর গিয়া শঙ্করের চোখে পড়িল, একটা পাগলা ডাস্ট্‌বিন হইতে এঁটো ভাত তুলিয়া খাইতেছে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, গায়ে একটা ছেঁড়া কোট ছাড়া আর কিছু নাই। শঙ্করের মনে পড়িল, এই লোকটাই কিছুদিন আগে সারকুলার রোডে মাথায় কাগজের টুপি পরিয়া সকলকে নির্বিকার চিত্তে সেলাম করিয়া বেড়াইতেছিল। এখনও নির্বিকার চিত্তে ডাস্ট্‌বিন হইতে ভাত তুলিয়া খাইতেছে। ভন্টু অথবা বক্‌সি মহাশয় দেখিলে মোস্তাককে চিনিতে পারিত।

শঙ্কর হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে হস্টেলের দিকেই ফিরিতে লাগিল। মুক্তোর কাছে আর যাইবে না, ইহা ঠিক করিবার পর হইতে শঙ্করের মন যেন অনেকটা হালকা হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন কারাবাসের পর যেন সহসা মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, তাহার নামে একটা জরুরী টেলিগ্রাম আসিয়াছে—বাবা অবিলম্বে বাড়ি যাইতে বলিতেছেন।

অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিবার একটা অজুহাত পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

যদিও সে মনে মনে এরূপ কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এতটা প্রত্যাশা করে নাই। আসিয়াই যে দুই জন কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। কিছুকাল পূর্বে যখন সে বাবাকে চিঠি লিখিয়াছিল যে তাহার এখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, তখন তাহাই তাহার সত্য মনোভাব ছিল। কিন্তু এখন তাহার আর সে মনোভাব নেই। দুই দিনে সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত দেহে মনে যে ক্ষুধা জাগিয়াছে, তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। মুক্তোকে সে পাইবে না, পাইতে পারে না এবং এখন পাইতে চাহেও না। তাহার পঙ্কিল স্পর্শ হইতে সে যে মানে মানে দূরে চলিয়া আসিতে পারিয়াছে, এজন্য সে আনন্দিত। পঙ্কিল স্পর্শ! এখন মুক্তোর স্পর্শকে পঙ্কিল স্পার্শ মনে হইতেছে।

বাড়িতে আসিয়া দেখিল, বৈঠকখানায় দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছেন। পুরাতন ভৃত্য ব্রজ সর্বাগ্রে চুপিচুপি সংবাদটি দিল—ইঁহারা তাহার বিবাহের সম্বন্ধে পাকা কথা কহিতে আসিয়াছেন। সাড়া পাইয়া মা বাহির হইয়া আসিলেন। মায়ের চেহারা দেখিয়া শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া গেল। মা এত রোগা হইয়া গিয়াছেন! তাঁহার সমস্ত শরীরের রস কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে, মুখের দিকে তাকানো যায় না। শুষ্ক শীর্ণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবি। চোখ-মুখের দীপ্তি নাই, কেমন যেন অসহায় অর্থহীন ভাবে শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—যেন দেখিয়াও দেখিতেছেন না। শঙ্কর প্রণাম করিল। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি আশীর্বাদ করিলেন। মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, আয়, ভেতরে আয়।

শঙ্কর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। শঙ্করকে বিছানায় বসাইয়া হাত দিয়া চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মৃদু হাসিয়া মা বলিল, একবারও মাকে মনে পড়ে না?

শঙ্কর এতদিন যে জগতে বিচরণ করিতেছিল, সে অন্য জগৎ। অনেকদিন

পরে সহসা মায়ের কাছে আসিয়া সে যেন নিজেকে ঠিক স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। কেমন যেন খাপ খাইতেছিল না। মায়ের কথা শুনিয়া সে মনে মনে লজ্জিত হইল। মুখে বলিল, কলেজের ছুটি ছিল না—

মা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, হাত-মুখ ধো, খাবার আনি।

বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্করের মনে সহসা সেকালের মায়ের মুখখানা ফুটিয়া উঠিল—যখন মা টকটকে লালপাড় শাড়ি পরিতেন, যখন তাঁহার মুখখানি মহিমায় প্রদীপ্ত ছিল। পরক্ষণেই পাগলিনীর ছবিটাও মনে পড়িল। জানালার গরাদের সঙ্গে হাত বাঁধা, অসংলগ্ন আর্ত চীৎকার! এখন আবার এ কি চেহারা—সশঙ্কিত, অসমর্থ, ক্লান্ত—সমস্ত জীবনশক্তিকে কে যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

অম্বিকাবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

তুমি চা-টা খেয়ে বাইরে এস একবার, ওঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন একটু।

ওঁরা কারা?

শিরীষবাবু আর মুকুজ্জেমশাই—শিরীষবাবুর বন্ধু। শিরীষবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

যদিও শঙ্করের মত বদলাইয়াছিল, তথাপি সে বলিল, আমি তো বলেছিলাম—

জানি, চিঠি পেয়েছি তোমার। কিন্তু তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল হ'ল না, আই অ্যাম সরি। চা-টা খেয়ে বাইরে এস।

আমার মতের কি কোন দাম নেই বলতে চান?

তোমার নিজের দামই যখন এখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত, তখন তোমার মতের দাম সুনিশ্চিত হবে কি ক'রে?

তার মানে?

এটা কি সত্যি কথা নয় যে, আমার নামেই তুমি সমাজে এখনও পর্যন্ত বিকোচ্ছ? সুতরাং তোমার সম্বন্ধে আমার অভিরুচি এবং অভিমতই মানতে হবে তোমাকে। তোমার স্বতন্ত্র মত তখনই সহ্য করব, যখন স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। যতক্ষণ তা না করতে পারছ, ততক্ষণ আমার কথা শুনেই চলতে হবে তোমাকে।

শঙ্করের মাথার ভিতর যেন দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কে যেন সজোরে তাহাকে কশাঘাত করিল। ইচ্ছা হইল, তখনই উঠিয়া বাহিরে চলিয়া যায়; কিন্তু সে পারিল না। কিছুই পারিল না। একটা কথা পর্যন্ত বলিতে পারিল না। বজ্রাহতের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অম্বিকাবাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, চা-টা খেয়ে এস বাইরে—ডোন্‌ট বি এ ফুল।

শঙ্কর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মানসপটে মুক্তোর মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল, যেন শুনিতে পাইল, মুক্তো বলিতেছে—এ কটা টাকায় কি হবে, এই নিন আপনার টাকা, গরিবের ছেলের এ সব ঘোড়ারোগ কেন বাপু!

টাকা, টাকা, টাকা! টাকা না থাকিলে পৃথিবীতে কেহ সম্মান করে না, এমন কি পিতাও না। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কিন্তু উঠিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না, তাহার অন্তরবাসী আত্মসম্মানহীন কাঙালটা বিবাহ করিবার লোভে এতবড় অপমান সহ্য করিয়াও উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিল।

পাশের ঘরে কথাবার্তা চলিতেছে। শঙ্কর উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। শিরীষবাবু মিনতিসহকারে বলিতেছিলেন, দেখুন, আমি অতি দরিদ্র, অত টাকা আমি দিতে পারব না। একটু বিবেচনা করতে হবে।

অম্বিকাবাবু বলিলেন, বিবেচনা ক'রেই বলছি। আড়াই হাজার টাকা এমন কিছু বেশি নয়।

আমার পক্ষে বেশি। আপনি দয়া না করলে—

দেখুন, যারা কথায় কথায় দয়া প্রার্থনা করে, সেই সব আত্মসম্মানহীন লোকের ওপর আমার কেমন যেন শ্রদ্ধা ক'মে যায়। যখন পড়তাম, তখন

করালীচরণ ব'লে একটি ছেলে আমাদের মেসে থাকত। তার অনেক দোষ ছিল, কিন্তু তার আত্মসম্মানের জন্যেই তাকে আমরা সবাই খাতির করতাম। আমাকে 'দাদা, দাদা' বলত, পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল; কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করতাম তার ওই আত্মসম্মানবোধের জন্যে। সেদিন অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা। সে জ্যোতিষচর্চা করছে শুনে তার কাছে আমার এক আত্মীয়ের কুষ্ঠি নিয়ে গেলাম দেখাতে। সে প্রথমেই বললে, অম্বিকদা, দশ টাকা দক্ষিণা লাগবে কিন্তু। আমি তার মুখের দিকে চাইতেই সে বললে, দশ টাকা আপনার কাছে না নিলেও আমার চ'লে যাবে, কিন্তু আপনি শুধু শুধু আত্মসম্মানটা খোয়াবেন কেন? আমাদের দেশের লোক কিছুতে এ সামান্য কথাটা মনে রাখে না। তারা সর্বদাই সকলের কাছে গলবস্ত্র হয়ে কৃপাভিক্ষা করছে। আশা করি, আপনি তাদের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র।

শিরীষবাবু এই তীক্ষ্ণ বক্তৃতাটি শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। বলিলেন, সত্যি বড় দরিদ্র আমি।

মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে বসিয়া ছিলেন; বলিলেন, আচ্ছা, টাকার যোগাড় করা যাবে। উনি যা বলছেন তা ঠিকই।

শিরীষবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অম্বিকাবাবু বলিলেন, আড়াই হাজার টাকা এমন কিছু তো বেশি নয়—

শঙ্কর আর সহ্য করিতে পারিল না, দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বলিল, আমি এক পয়সা চাই না। আপনারা যদি আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান, বিনাপণেই আমি বিয়ে ক'রে আসব। মেয়েও দেখতে চাই না আমি।

সকলেই অবাক হইয়া গেলেন।

অম্বিকাবাবু শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া সিগারের ছাইটা ধীরে ধীরে ঝাড়িলেন। তাহার পর শিরীষবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তা হ'লে তো মামলা মিটেই গেল। সংসার-সমুদ্রে বিনা নৌকোতে পাড়ি দেবার সাহস বাবাজীবনের আছে দেখছি। আপনাদেরও যদি ওর দুঃসাহসের ওপর ভরসা

থাকে, দিন ওর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে—আই হ্যাভ নো অব্জেক্‌শন। আমি ওদের সুবিধের জন্যই নৌকার চেষ্টায় ছিলাম।

চক্ষু বুজিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি সিগারে একটি মৃদু টান দিলেন। মুকুজ্জেমশাই একদৃষ্টে শঙ্করের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

শঙ্কর আর দাঁড়াইল না, বাহির হইয়া গেল।

১৮

অল্পদিনের মধ্যেই শঙ্করের বিবাহ হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য, অম্বিকাবাবু বিবাহে যোগদান করেন নাই। শঙ্কর বন্ধুবান্ধব কাহাকেও, এমন কি ভন্টুকেও, খবর দেয় নাই। শিরীষবাবু অমিয়াকে গহনাপত্র ছাড়া নগদ এক হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, শঙ্কর সে টাকা গ্রহণ করে নাই। সত্য সত্যই বিনাপণে সে অমিয়াকে বিবাহ করিল। শুভদৃষ্টির সময় শঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, মেয়েটি তো অচেনা নয়, কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছে! হঠাৎ মনে পড়িল, কিছুদিন আগে একটা ব্লাইণ্ড্ লেনে ঢুকিয়া সে পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই মেয়েটিই তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।

অমিয়াও সবিস্ময়ে দেখিল যে, একাগ্রমনে শিবপূজা করা সত্ত্বেও ক্যালেণ্ডারের শিবের চেয়ে তাহার স্বামী ঢের বেশি সুন্দর হইয়াছে। শান্তি, বিনু, কমলি, টগর, এমন কি রেণুদির বরের চেয়েও তাহার বর দেখিতে ভাল।

কেমন চমৎকার চোখ দুইটি!

১৯

শঙ্কর হস্টেলে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, তাহার জীবনের এই প্রধান ঘটনাটি কত সহজে ঘটিয়া গেল! কিছুদিন পূর্বে সে স্বপ্নেও ভাবে নাই

যে, সে বিবাহ করিবে। সহসা সে আবিষ্কার করিল যে, তাহার জীবনের গতিকে যতবার সে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ততবার তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পর সে ঠিক করিয়াছিল, অবিবাহিত থাকিয়া আজীবন দেশসেবা করিবে। কংগ্রেসে ভলান্টিয়ারি করিয়া, বন্যা-প্রপীড়িতদের জন্য চাঁদা আদায় করিয়া, দ্বারে দ্বারে খদ্দর ফেরি করিয়া এবং ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করিয়া অদ্ভুত একটা উন্মাদনার মধ্যে কিছুকাল তাহার কাটিয়াছিল। এ উন্মাদনা কিন্তু বেশি দিন রহিল না। আই.এস-সি. এবং বি.এস-সি. পড়িতে পড়িতে বিজ্ঞানের নেশায় তাহাকে পাইয়া বসিল। দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, বিজ্ঞানের সেবা করিলেই প্রকৃত দেশসেবা করা হইবে। অবৈজ্ঞানিক রীতিতে দেশসেবা অর্থহীন। এ যুগে চরকা চালাইবার চেষ্টা বাতুলতা। বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-চেষ্টাই সমীচীন। সুতরাং ঠিক করিয়াছিল, আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া বিজ্ঞানচর্চাই তাহাকে করিতে হইবে। কিন্তু এসব মফস্বলীয় কল্পনা কলিকাতায় আসিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া শঙ্কর নিজেকে যেন পুনরায় আবিষ্কার করিল। দেখিল, তাহার মন অনিবার্য টানে যে দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা বিজ্ঞান নয়—সাহিত্য। আরও আবিষ্কার করিল যে, নারী-সঙ্গ-বর্জিত জীবন আর যেই যাপন করিতে পারুক, সে পারিবে না। তাহার একজন সঙ্গিনী চাই। তাহার এই অন্তর্নিহিত কামনার টানে মিষ্টিদিদি, রিনি, মুক্তো আকস্মিকভাবে আসিল ও চলিয়া গেল। অমিয়ার মুখখানি তাহার মনে পড়িল। কত ছেলেমানুষ এবং কত লাজুক! ফুলশয্যার রাত্রে লজ্জায় চোখই খুলিল না। কোথায় ছিল এই অমিয়া? কোন্ অজ্ঞাতলোক হইতে সহসা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার জীবনে এমন কায়েমী আসন দখল করিয়া বসিল?

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং চিঠি দিয়া গেল। বাবার চিঠি। শঙ্কর এইরূপই কিছু একটা প্রত্যাশা করিতেছিল, তবু সে পত্রখানি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্রখানি এই—

কল্যাণবরেষু,

বিবাহ-ব্যাপারে তোমার স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। অপরের টাকা না লইয়া স্বাবলম্বী হইবার সাহস তোমার আছে, ইহার প্রমাণ তুমি দিয়াছ ; শক্তিও যে আছে, সে প্রমাণও আশা করি দিতে পারিবে। সুতরাং আগামী মাস হইতে তোমার খরচ দেওয়া আমি বন্ধ করিলাম। যে সমর্থ, তাহার অপরের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে অসমর্থ অসহায় লোক অসংখ্য। নিজেদের আত্মীয়—তোমার মামাতো-ভাই নিত্যানন্দ টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ করিয়াছে। যে টাকাটা তোমাকে দিতাম, তাহা তাহাকে দিলে সে বেচারা বোধ হয় এম.এ.-টা পাস করিতে পারিবে। টাকাটা তাহাকেই দিব স্থির করিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে তোমার স্পর্ধার অনুরূপ শক্তি ও আত্মসম্মান দান করুন। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়

তৃতীয় অধ্যায়

১

একটি সংকীর্ণ গলি-পথে বাইকটি ঠেলিয়া ভন্টু চলিয়াছিল, বাইকের পিছনের চাকাটায় গোলমাল হইয়াছে, হাওয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। শীঘ্র সারাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ পকেট শূন্য। একেবারে শূন্য নয়, একটি অর্ধভুক্ত কাঁচা পেয়ারা আছে। সকালে আপিস যাইবার মুখে মৃন্ময়ের বাসায় সে কিছু টাকার চেষ্টায় গিয়াছিল। মৃন্ময় চিন্ময় কেহই বাড়িতে ছিল না, ছিল হাসি। পেয়ারা কিনিয়া সে গোয়াভা জেলি প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছিল। হাসির নিকট হইতে টাকা চাওয়া যায় না, কিন্তু পেয়ারা চাওয়া যায়। গোটা-দুই ডাঁশা পেয়ারা সে সংগ্রহ করিয়াছিল। ভাগ্যিস করিয়াছিল, তাই আপিসের পর কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছে। এখন চলিয়াছে নিবারণবাবুর নিকট, ধারের চেষ্টায়। অবিলম্বে কিছু টাকার প্রয়োজন। এক-আধ টাকা নয়, সাড়ে পাঁচ শত টাকা। করালীচরণ দ্রাবিড় যাইবে বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে যেমন করিয়া হউক টাকাটা তাহাকে দিতেই হবে। কি কুক্ষণেই যে সে করালীচরণের টাকায় হাত দিয়াছিল! এ টাকা না পাইলেও তাহার সংসার নিশ্চয়ই চলিয়া যাইত। খুচখুচ করিয়া টাকাগুলি খরচ হইয়া গিয়াছে, এখন মহা মুশকিল! হঠাৎ সাড়ে পাঁচ শত টাকা যোগাড় করা কি সহজ? বউদিদির অলঙ্কারগুলিও নাই। দাদা তাহার কিয়দংশ পূর্বেই সাবাড় করিয়াছিলেন, তাহার বি.এস-সি. পরীক্ষার ফী জমা দিবার সময় রুলি-জোড়া গিয়াছিল, ফন্তির অসুখের সময় হারটা গিয়াছে। নিরাভরণা বউদিদি শাঁখা লোহা ও সিঁদুরের সহায়তায় সধবার ঠাট কোনরকমে বজায় রাখিয়াছেন। বিড়্‌ভিকার এ বিষয়ে মুখে অবশ্য কখনও কিছু বলেন না, কিন্তু না বলিলেও

ভন্টু সব বুঝিতে পারে। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াই বা কি করিবে, গহনা গড়াইয়া দিবার সামর্থ্য তো তাহার নাই। বরং মনে হইতেছে, বউদিদির গহনাগুলি এ সময়ে থাকিলে কাজে লাগিত। তিন দিন হইতে সে করালীচরণকে এড়াইয়া চলিতেছে, টাকা না লইয়া তাহার সহিত দেখা করা অসম্ভব। শঙ্করের বহুদিন হইতে দেখা নাই। সেদিন হস্টেলে গিয়া সে যাহা শুনিল, তাহা অবিশ্বাস্য। শঙ্কর নাকি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিবাগী হইয়া গিয়াছে—হস্টেলের দারোয়ানটা বলিল। দারোয়ানের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র ভন্টু নয়। সে আরও খোঁজ করিয়া জানিল, ভীমজালে পড়িয়া ছোকরা গা-ঢাকা দিয়াছে। অত লদ্‌কালদ্‌কি করিলে ভীমজালে পড়িবে না! ইদানীং সে যে বড় একটা ধরা-ছোঁয়া দিত না, তাহার কারণ এতদিনে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কয়েকদিন পূর্বে ওরিজিন্যাল অর্থাৎ দশরথের মুখেও সে অতিশয় চমকপ্রদ একটি সংবাদ শুনিয়াছে। আধুনিক ছোকরাদের গালাগালি প্রসঙ্গে তাহাদের হ্যাংলামির উদাহরণস্বরূপ ওরিজিন্যাল শঙ্কর নামক একটি যুবকের উল্লেখ করিলেন। সে নাকি লুকাইয়া ওরিজিন্যালের রক্ষিতার নিকট যাতায়াত করে। কলেজের দুই-একজন প্রাক্তন সহপাঠীর নিকটও ভন্টু শঙ্করের সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়াছিল এবং সমস্ত শুনিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, 'চাম্ গ্যান্‌টঅ' ভীমবেগে রসাতলের উদ্দেশ্যেই রানিং আপিস খুলিয়াছে। এখন যদি ছোকরার একবার নাগাল পাওয়া যাইত, বড় ভাল হইত। আর যাই হোক, রাস্‌কেল্‌টার মাথা বড় সাফ—কাব্যিরোগেই উহাকে খাইয়াছে।

মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজী পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। মায়ের বিষয়টি বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহারই সাহায্যে তিনি নাকি কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিহিত কোন নির্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। ভন্টুর মনে হইল, বাবাজীর বিষয়টা হস্তগত করিয়া লইলে মন্দ হইত না। এ সময়ে অন্তত তাহা কাজে লাগিতে পারিত! বাবাজী তো দিতেই চাহিয়াছিলেন।

অন্ধকার গলি। গলির দুই পাশে ঘেঁষাঘেঁষি খোলার ঘর। কোন ঘরে কলহের, কোন ঘরে বেগুনভাজার, কোন ঘরে হার্মোনিয়মের, কোন ঘরে শিশুর ক্রন্দন রোল উঠিয়াছে। ভন্টুর এসব দিকে লক্ষ্য নাই। রিকটি ঠেলিতে ঠেলিতে নানা এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটি কথাই সে কেবল ভাবিতেছে, হঠাৎ এত টাকার কথা নিবারণবাবুর কাছে পাড়িবে কি করিয়া!

•

পৃথিবী বৈচিত্র্যময়ী। বিচিত্র লীলায় বিচিত্র ভঙ্গীতে বিচিত্র স্থানে জীবনধারার বিচিত্র বিকাশ। এই বৈচিত্র্যকে আমরা অন্তরের সহিত উপলব্ধি করি না বলিয়াই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিলে বিস্মিত হই। বস্তুত প্রকৃতির বিচিত্র লীলানিকেতনে প্রত্যাশিত বলিয়া কিছু নাই। কোন কিছুকে আমরা প্রত্যাশিত বলিয়া মনে করি আমাদের কল্পনার দৈন্যবশত। আমাদের আরও একটা অভ্যাস—আমরা নিজেদের রুচি, বুদ্ধি, সংস্কার ও সুবিধা অনুযায়ী প্রত্যাশা করি, এবং নিজেদের রুচি, বুদ্ধি, সংস্কার ও সুবিধার প্রতিকূল কিছু ঘটিলেই তাহাকে 'অপ্রত্যাশিত' আখ্যা দিয়া বিস্মিত অথবা মর্মাহত হই; ভুলিয়া যাই যে, বৈচিত্র্যই পৃথিবীর প্রাণধর্ম। প্রাণধর্মের প্রেরণায় প্রত্যাশিত, ঈষৎ-প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত—সর্বপ্রকার ঘটনাই ঘটে। আমরা ইহা জানি, বিচারের ক্ষেত্রে ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে এতদনুসারে চলি না। ব্যাবহারিক জীবনে আমরা আশা করি যে, আমাদের সংস্কার, সুবিধা এবং নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী সব কিছু ঘটিবে। কিন্তু তাহা ঘটে না,—কাহারও জীবনে ঘটে না, নিবারণবাবুর জীবনেও ঘটিল না। নিজের মেয়েকে কেহ মন্দ ভাবে না, নিজের বন্ধুর চরিত্রে বিশ্বাস করাও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই সুবিধাজনক স্বাভাবিক ধারণার আরামদায়ক আবেষ্টনীতে মন নিশ্চিন্ত থাকে। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় নানা বিপদ ঘটিতে পারে জানিয়াও আমরা ঘুমাই। সুতরাং মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত রকমে চমকিত হইতে হয়। সকালে উঠিয়া দেখি, চোরে সিঁধ কাটিয়াছে অথবা ঘরে

আগুন লাগিয়া গিয়াছে। নিবারণবাবুর মুখে সমস্ত শুনিয়া ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া গেল। মাস্টার আস্মিকে লইয়া সরিয়াছে।

২

ছোট স্টেশনটি এতক্ষণ নিবিড় অন্ধকারে অবলুপ্ত ছিল। রাত্রি বারোটার সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহা সজীব হইয়া উঠিল। একটা গাড়ি আসিবে। স্টেশনের বাহিরে গভীর অন্ধকার ঝিল্লীস্বরে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে কেবল মাঠ। একটি সরু রাস্তা স্টেশন হইতে মাঠের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্তী বড় রাস্তায় মিশিয়াছে। স্টেশনের নিকট রেলের দুই-একটি কোয়ার্টার ছাড়া আর কোন ঘরবাড়ি নাই। আশেপাশে কেবল দিগন্তব্যাপী প্রান্তর। অমাবস্যা, সূচীভেদ্য অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। ট্রেন আসিল, দুই মিনিট থামিল এবং চলিয়া গেল। ট্রেন হইতে জন-দুয়েক যাত্রী নামিলেন, চিন্ময়ও নামিল। নির্দেশমত এই স্টেশনেই তাহার নামিবার কথা। অন্য যাত্রীদের সহিত চিন্ময়ও স্টেশনের বাহিরে সরু রাস্তাটার উপর আসিয়া হাজির হইল। অন্য যাত্রীরা আপন আপন গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন। চিন্ময়ও একা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটি ছেলের আসিবার কথা, কিন্তু কই, কেহই তো আসে নাই! এই অন্ধকারে পথ চেনাও মুশকিল! চিন্ময় অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

আপনি কি জাফরানপুর যাবেন?—কোমল বালককণ্ঠে অন্ধকারের মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করিল।

আপনি কে?

আমি আপনাকে নেবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

তাই নাকি! আচ্ছা, এদিকে এস।

অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি নিকটে সরিয়া আসিল।

আলোর কাছে চল, দেখি, তুমি কে!

স্টেশনের নিকটবর্তী হইয়া স্টেশনের আলোকে চিন্ময় চিনিতে পারিল। কলিকাতায় তাহাদের দলপতি দূর হইতে একদিন এই বালকটিকেই চিনাইয়া দিয়াছিলেন।

চিন্ময় প্রশ্ন করিল, কতদিন পূর্বে তুমি কলকাতায় গিয়েছিলে?

ও-মাসের পঁচিশে।

তারিখটাও মিলিয়া গেল।

চল, তা হ'লে যাওয়া যাক।

আবার তাহারা মাঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক প্রশ্ন করিল, আপনার নাম কি?

বাইশ নম্বর।

চলুন।

তরুণকান্তি পনেরো-ষোল বছরের একটি কিশোর। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া চিন্ময় অন্ধকারে মাঠে নামিয়া পড়িল। সমস্ত সন্ধ্যাটা গুমোট করিয়া ছিল, এখন বেশ ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু চারিদিকে কি ভীষণ অন্ধকার! চিন্ময় সহসা লক্ষ্য করিল, ছেলেটি তাহার পাশে পাশে নয়, আগে আগে চলিয়াছে।

তুমি আগে আগে যাচ্ছ কেন?

আমি আগেই থাকি—আপনি আমার পিছু পিছু আসুন।

কেন বল তো?

বালক কোন উত্তর দিল না। সে কিন্তু চিন্ময়ের সহিত চলিতে পারিতেছিল না, চিন্ময় তাহাকে বারম্বার ধরিয়া ফেলিতেছিল। তখন সে ছুটিয়া আবার খানিকটা আগাইয়া যাইতেছিল। চিন্ময়কে সে কিছুতেই আগাইয়া যাইতে দিবে না।

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, অমন ছুটে ছুটে এগিয়ে যাবার দরকারটা কি? একসঙ্গে পাশাপাশি যাই চল না।

না, আমি এগিয়ে থাকব।

কেন?

এমনই।

চিন্ময় যে কার্যে চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা মানা। এই কিশোর তাহাকে জাফরানপুর অবধি পৌঁছাইয়া দিবে। সেখান হইতে অন্য উপায়ে কর্মস্থলে পৌঁছিতে হইবে। উভয়ে নীরবে মাঠ পার হইতে লাগিল। উভয়েই বেশ দ্রুতপদে চলিয়াছে, তাহার সঙ্গী আগাইয়া থাকিবার জন্য প্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে। চিন্ময় প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

অত ছুটে চলবার দরকার কি?

আসুন না আপনি।

তুমি পাশাপাশি না চললে আমি যাব না।

আসুন না।

তুমি কেন এগিয়ে থাকতে চাও, না বললে আমি যাব না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া ছেলেটি অবশেষে বলিল, এ মাঠে বড় বড় গোখরো সাপ আছে। আমার টর্চ আনা উচিত ছিল, কিন্তু আমি ভুলে গেছি।

তাতে কি হয়েছে?

আপনাকে যদি সাপে কামড়ে দেয়? আমার উপর ভার আছে আপনাকে জাফরানপুরে নিরাপদে পৌঁছে দেবার। আপনি আসুন।

তোমাকে যদি সাপে কামড়ায়?

আমার চেয়ে আপনার প্রাণের দাম ঢের বেশি। আসুন।

৩

শঙ্কর বিবাগী হইয়া যায় নাই।

পিতার পত্র পাইবার পরদিন সে হস্টেল ছাড়িয়া দিল, জিনিসপত্র ও বই বিক্রয় করিয়া খুচরা ধারগুলা শোধ করিয়া ফেলিল এবং উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে

অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল। পকেটে সাড়ে বারো আনা পয়সা মাত্র সম্বল। বিরাট কলিকাতা নগরীতে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। শঙ্কর সহসা অনুভব করিল, কলিকাতায় ধনীর স্থান আছে, দরিদ্রের স্থান আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের স্থানাভাব। ধনীর প্রাসাদ আছে, দরিদ্রের ফুটপাথ আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের—চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন ভদ্রতাজ্ঞানবিশিষ্ট মধ্যবিত্তেরই মুশকিল। এখানে বিনা পরিচয়ে অথবা বিনা পয়সায় ভদ্রভাবে কোন আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। শঙ্করের যাহারা পরিচিত, তাহারা এত বেশি পরিচিত যে, শঙ্কর অসঙ্কোচে তাহাদের নিকট যাইতে পারে না। কোন্ লজ্জায় সে শৈলর বাড়ি যাইবে! তাহাকে সে চিরকাল অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, তাহার নিকট যাইবে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে! এই একই কারণে ভন্টুর নিকট যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া ভন্টুদের অবস্থা সে ভাল করিয়াই জানে। তাহাকে আশ্রয় দেওয়ার মত সঙ্গতি তাহাদের নাই। শিরীষবাবু বদলি হইয়া গিয়াছেন, থাকিলেও শঙ্কর এমন দীনবেশে শ্বশুরবাড়ি যাইতে পারিত না। "প্রফেসর গুপ্তের শরণাপন্ন হইয়া অবিলম্বে একটা টুইশনির বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। প্রফেসর গুপ্ত কি অবিলম্বে একটা টুইশনির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন? যখন প্রয়োজন ছিল না, তখন একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাকে একটা টুইশনি তিনি যোগাড় করিয়া দিতে পারেন। এখনও কি পারিবেন? শিয়ালদহের সামনে একটা মুসলমানী দোকানে ঢুকিয়া সস্তায় কিছু রুটি-মাংস কিনিয়া শঙ্কর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। স্টেশনের ঘড়িটাতে দেখিল, আড়াইটা বাজিয়াছে। রবিবার প্রফেসর গুপ্ত হয়তো বাড়িতেই আছেন। তাঁহার বাড়ির দিকেই শঙ্কর অগ্রসর হইল। কোনক্রমে দশ-পনেরো টাকার মত একটা টুইশনিও যদি জুটিয়া যায়! পথ চলিতে চলিতে মায়ের কথা তাহার মনে পড়িল। বাবা যে খরচ বন্ধ করিয়াছেন, মা কি তাহা জানেন? খুব সম্ভবত জানেন না। বাবা মায়ের দুর্বল মস্তিষ্ককে পারতপক্ষে বিচলিত করিতে চাহিবেন না। সে যে বিবাহ করিয়াছে, সে কথাও কি মা জানেন না? কিংবা

হয়তো সব জানেন, বাবার ভয়ে কিছু করিতে পারিতেছেন না। জানুন আর নাই জানুন, শঙ্কর নিজে তাঁহাকে কখনও জানাইবে না। মাকে নিজের অবস্থার কথা জানানোর সরল অর্থ বক্রপথে পিতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে যাওয়া। তাহা সে মরিয়া গেলেও করিবে না। সহসা অমিয়ার কথা তাহার মনে হইল। সে শিরীষবাবুর সঙ্গেই তাঁহার নূতন কর্মস্থল দিনাজপুরে গিয়াছে। অমিয়ার শিশুর মত সরল মুখখানি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। নিতান্ত সরল! শঙ্করকে পাইয়া যেন বর্তিয়া গিয়াছে। এমন স্বামী যেন কাহারও নাই, হইতে পারে না। এতটা সরলতা কিন্তু শঙ্করের ভাল লাগে নাই। শঙ্করের পরিণত মনের ক্ষুধা কি ওই শিশুপ্রকৃতির অমিয়া মিটাইতে পারিবে? উহাকে স্নেহ করা চলে, উহার অযৌক্তিক সারল্য দেখিয়া কৌতুকান্বিত হওয়া চলে, কিন্তু উহার সহিত রোমান্টিক প্রেম করা চলে না। ওইটুকু মেয়ে, ভালবাসার কি বোঝে ও! শঙ্কর যেন নূতন রকম একটা দামী পুতুল এবং তাহারই একান্ত নিজস্ব—এই আনন্দেই অমিয়া বিভোর। শঙ্করের মনের নিগূঢ় আকুতির বিচিত্র পিপাসার কোন খবর রাখা উহার পক্ষে সম্ভবই নয়। ও যদি কুটিল হইত, অপাঙ্গের বিলোল কটাক্ষে মুগ্ধ করিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে ব্যাহত করিতে পারিত, তাহা হইলে শঙ্করের ভাল লাগিত। এ অতিশয় সরল, অত্যন্ত সহজ। বিনা প্রতিবাদে বাহুবন্ধে ধরা দেয়, বিনা প্রশ্নে সমস্ত কিছু বিশ্বাস করে, বিনা সঙ্কোচে কৃতজ্ঞ হয়। কোন জটিলতা নাই, মনকে উৎসুক করিয়া তোলে না।

প্রফেসর গুপ্তের বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর যাহা দেখিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। প্রফেসর গুপ্ত ও মিষ্টিদিদি দক্ষিণ দিকের নির্জন বারান্দায় বসিয়া চা পান করিতেছেন। বাড়িতে বালক ভৃত্যটি ছাড়া আর কেহ আছে বলিয়াও মনে হইল না।

শঙ্করকে দেখিয়া মিষ্টিদিদিই হাস্যমুখে সম্বর্ধনা করিলেন, এ কি, শঙ্করবাবু যে! অনেক দিন পরে দেখা হ'ল আপনার সঙ্গে, বসুন।

নির্বিকারভাবে মিষ্টিদিদি কথাগুলি বলিলেন, শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

মুখখানা বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে যে! বসুন না।

শঙ্কর উপবেশন করিল।

প্রফেসর গুপ্ত বালক-ভৃত্যটিকে ডাকিয়া আর এক পেয়ালা চা ফরমাশ করিলেন। তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কাব্য-আলোচনা হচ্ছিল। 'কিং লিয়ারে'র গনেরিল আর রেগনকে কেমন লাগে তোমার?

শঙ্করের 'কিং লিয়ার' পড়া ছিল না, তবু বলিল, ভালই লাগে।

মিষ্টিদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, ভাল লাগে আপনার? আপনার রুচি বদলেছে তা হ'লে বলুন। আগে তো ঝাঁজওয়ালা জিনিস বরদাস্ত করতে পারতেন না আপনি।

প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, ওর রুচির খবর রাখেন নাকি আপনি?

সামান্য একটু পরিচয় নিয়েছিলুম একদিন। একদিন একটু ঝাঁজালো সস্ চাখিয়েছিলুম, খেতে পারলেন না। কম ঝাঁজালো আরও খাবার ছিল, সেগুলো পর্যন্ত খেতে পারলেন না, উঠে যেতে হ'ল ওঁকে।

তাই নাকি! আমার তো ধারণা ছিল, শঙ্কর খুব ঝালের ভক্ত।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল কি না তাহা সে নিজেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি হাসিমুখে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর, আছেন কেমন বলুন? অনেক দিন আপনার কোন খবর পাই নি। পড়াশোনা হচ্ছে কেমন?

পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি।

ওমা, সে কি! এটা আপনার এগ্‌জামিনের বছর না?

প্রফেসর গুপ্তের চক্ষু দুইটিও প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

কেন, হঠাৎ হ'ল কি?

বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন, তাঁর অমতে বিনাপণে বিয়ে করেছি ব'লে।

মিষ্টিদিদি মুখে একটা বিস্মিত সহানুভূতির ভাব ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ দুইটি হইতে একটা চাপা হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, হঠাৎ তাঁর অমতে বিয়ে করতে গেলে কেন?

একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের ওপর অনুকম্পা হ'ল।

মিষ্টিদিদি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম, বুঝি আর কিছু।

শঙ্কর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিল, আপনি ভাববেন বইকি।

এই কথায় মিষ্টিদিদি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গে শঙ্করের ব্যঙ্গোক্তি কোথায় ভাসিয়া গেল, তাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারিল না। চায়ের পেয়ালার বাকি চাটুকু নিঃশেষ করিয়া মিষ্টিদিদি উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, আমি এবার চলি তা হ'লে। আপনি একটা লোকের চেষ্টায় থাকবেন কিন্তু, আমরা আমাদের সমিতি থেকে আট আনা ক'রে দিতে পারব। এর চেয়ে বেশি দেওয়ার ক্ষমতা নেই সমিতির। অত সস্তায় কোন ট্রেন্‌ড্‌ নার্স পাওয়া যাবে না মানি, ট্রেন্‌ড্‌ নার্সের দরকারও নেই, পাহারা দেবার মত একজন লোক পেলেই হ'ল। বেঘোরে খাট থেকে প'ড়ে-ট'ড়ে না যান ভদ্রলোক। ওষুধ খাওয়ারও হাঙ্গামা নেই। ওষুধ দিচ্ছেন আমাদের প্রকাশবাবু, হোমিওপ্যাথি, পনরো দিন অন্তর এক ফোঁটা।—এই বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিলেন।

প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, আচ্ছা, চেষ্টায় থাকব—অত সস্তায় কোন বিশ্বাসযোগ্য লোক পাওয়া শক্ত।

ওর চেয়ে বেশি দেবার ক্ষমতা আমাদের সমিতির নেই। অত দেবারও ক্ষমতা নেই, মিসেস স্যানিয়ালের বোন চুনচুনের স্বামী ব'লেই আমাদের যা ইণ্টারেস্ট্‌। নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে কিছু টাকা যোগাড় করেছি আমরা।

টি. বি. ব'লে সন্দেহ করেছেন, সেইটেই হয়েছে আরও মুশকিল কিনা—ডাক্তাররা তাই বলেছে, আমরা কি করব বলুন ?

একটু হাসিয়া মিষ্টিদিদি আবার বলিলেন, কি ক'রে চুন্‌চুন যে ওই রোগা কুচ্ছিত লোকটার লাভে পড়ল, তাই ভেবে অবাক লাগে আমার।

প্রফেসর গুপ্ত মিষ্টিদিদির মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার মুখে মৃদু একটা হাসিও ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদিও হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, মনে রাখবেন কথাটা। মিসেস স্যানিয়াল আমার ওপর ভার দিয়েছেন, আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না যেন। শঙ্করবাবুকেও বলুন না ব্যাপারটা খুলে, উনিও হয়তো কোন লোকের সন্ধান দিতে পারবেন। অনেক জায়গায় ঘোরেন তো, পুরুষমানুষ হ'লেও চলবে। তাহার পর হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, উঃ, বড্ড দেরি হয়ে গেছে আমার। এবার চলি আমি।

মিষ্টিদিদি চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি ?

মিসেস মিত্রের একজন বান্ধবীর বোন চুন্‌চুন কিছুদিন আগে যতীন হাজরা ব'লে একটি লোককে লুকিয়ে বিয়ে করে। যতীন হাজরার তিন কুলে কেউ নেই, প্রেসে না কোথায় একটা কাজ করত, কোন রকমে চ'লে যাচ্ছিল। এখন সেই যতীন হাজরার হয়েছে টি. বি.—নার্স করবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। চুন্‌চুনের দিদি মিসেস স্যানিয়াল চুন্‌চুনকে কিছুতে সেখানে যেতে দেবে না। ওদের সমিতি থেকেই তাঁর চিকিৎসার খরচ চলছে, তাঁর থাকবার জন্যে একটা ঘরও ভাড়া ক'রে দিয়েছেন ওঁরা, এখন সেবা করবার একজন লোক চাই। রোজ আট আনা ক'রে পাবে সে। আছে এমন লোক তোমার সন্ধানে ?

আমিই করতে পারি।

তুমি !

আপত্তি কি, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম একটা টুইশনির চেষ্টায় যতদিন সেটা না জুটছে, ততদিন এই করা যাক।

সত্যি সত্যি তুমি পড়াশোনা ছেড়ে দেবে নাকি? ব্যাপারটা কি খুলে বল তো?

ওই তো বললাম, বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন।

প্রফেসর গুপ্ত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, বেশ তো, টুইশনি ক'রেই পড়াশোনা কর। পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল।

ডিগ্রী লাভ করার কোন সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। বর্তমান যুগে টাকাটাই আসল, সময় নষ্ট না ক'রে টাকা রোজগারের চেষ্টাতেই লেগে যাওয়া উচিত।

কিন্তু টাকা রোজগারের পথে বাঙালীর ছেলের ডিগ্রীটাই আসল সম্বল। ওটা নিতান্ত তুচ্ছ করবার জিনিস নয়।

ডিগ্রী সম্বল ব'লেই বাঙালীর ছেলের এত দুর্দশা।

তা হ'লে কি তোমার মতেও লেখাপড়া করাটা অনর্থক?

যারা লেখাপড়ার জন্যেই লেখাপড়া করতে চায়, তারা তা করুক এবং সম্পূর্ণভাবে তার উপযুক্ত হোক। আমি ভেবে দেখেছি, আমার দ্বারা ও সম্ভব নয়।

তার মানে?

বিদ্যার্থী হবার মত মনের জোর নেই আমার। সকলে ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযুক্ত নয়।

তুমি যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ দেখছি।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না। বালক-ভৃত্যটি এক পেয়ালা চা দিয়া গেল। শঙ্কর নীরবে চা পান করিতে লাগিল।

তুমি টুইশনি ক'রেই টাকা রোজগার করবে ঠিক করেছ? ব্যবসা হিসেবে ওটা তো খুব প্রশস্ত পথ নয়।

যতদিন অন্য কোন একটা উপার্জনের পথ না পাই, ততদিন টুইশনি ক'রেই চালাব। তা ছাড়া উপায় কি? আপনি আপাতত যা হোক কিছু একটা যোগাড় ক'রে দিন আমাকে।

একটি আই.এস-সি. ছেলেকে কোচ করতে পারবে?

পারব।

কত মাইনে চাও?

আপনি যা ঠিক ক'রে দেবেন।

গোটা চল্লিশ হ'লে চলবে?

চলবে।

দু বেলা পড়াতে হবে কিন্তু।

তাই পড়াব।

আচ্ছা, বলব তাঁদের তা হ'লে। একটি জুনিয়র প্রফেসরের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেছেন, দরে বনছে না, সে ভদ্রলোক ষাট টাকা চান। তুমি চল্লিশ টাকায় রাজী তো?

হ্যাঁ। কবে থেকে পড়াতে হবে?

আসছে মাস থেকে।

ততদিন তা হ'লে এই টি.বি. রোগীটার সেবা করা যাক।

ওসবের মধ্যে আবার গিয়ে কি করবে? রোগটা ছোঁয়াচে এবং মারাত্মক।

তা হোক, তবু আমি যাব।

আচ্ছা পাগল তো! তোমার জীবনের মূল্য এখন অনেক বেশি। বিয়ে করেছ।

শঙ্কর উত্তরে শুধু একটু হাসিল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, তোমার সেই বান্ধবীটির খবর শুনেছ?

কোন্ বান্ধবীটির?

বেলা মল্লিক।

না, অনেকদিন কোন খবর জানি না।

সে এক বুড়ো সাহেবের সঙ্গে জুটেছে।

তার মানে ?

একদিন বেলা সিনেমার সেকেণ্ড্ শো থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখে, তার বাড়ির ঠিক সামনে একটা বুড়ো সাহেব অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে রয়েছে। চতুর্দিকে জনপ্রাণী কেউ নেই। বেলা জনার্দনকে ডেকে ধরাধরি ক'রে অজ্ঞান সায়েবকে ঘরে নিয়ে এল। শুধু তাই নয়, একজন ডাক্তার ডাকলে এবং সেবা-শুশ্রূষা ক'রে সায়েবকে চাঙ্গা ক'রে তুললে।

সায়েবটা নিশ্চয় মাতাল।

না, তার স্ট্রোক হয়েছিল। অর্ধেক শরীরে পক্ষাঘাত হয়ে গেছে।

তারপর ?

সায়েবের জ্ঞান হবার পর জানা গেল, সায়েব খাঁটি বিলিতী সায়েব, এখানে একটা সায়েবী দোকানে বড় চাকরি করে, কিছুদিন পর রিটায়ার ক'রে দেশে ফেরার কথা, এমন সময় এই বিপদ।

বেলার বাসার সামনে এল কি ক'রে ?

সায়েব নাকি এক ট্যাক্সিতে ছিল, ট্যাক্সিতেই অজ্ঞান হয়ে যায়। যত দূর মনে হচ্ছে, ওই ট্যাক্সিওলাই বেগতিক দেখে ওই নির্জন গলিতে সায়েবকে নামিয়ে দিয়ে স'রে পড়েছে। অজ্ঞান সায়েবকে নিয়ে সে আর ঝামেলায় ঢুকতে চায় নি।

তারপর ? এ যে রীতিমত রোমান্টিক ব্যাপার !

Truth is stranger than fiction.

তারপর কি হ'ল ?

তারপর যোগাযোগও দেখ অদ্ভুত, সায়েবের তিন কুলে কেউ নেই, থাকবার মধ্যে আছে একটি পিয়ানো। বেলাও নাকি মিস্টার বোসের বাড়িতে পিয়ানো বাজাতে শিখেছে।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ, শৈলর পিয়ানোটা ও বাজাত শুনেছি।

ফলে বেলা এখন রোজ সন্ধ্যেবেলায় সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত সায়েবকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনায়। সায়েবের 'কার' এসে ওকে নিয়ে যায়, দিয়ে যায়।

মাইনে নিশ্চয় পান এর জন্যে ?

সেটা ঠিক জানি না আমি। তবে সায়েব জাত, কারও কাছে অমনই কিছু নেয় না। নিশ্চয়ই কিছু দিচ্ছে।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

প্রফেসর গুপ্তও বাতায়ন-পথে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল, মানুতুরা কি এখানে নেই নাকি, কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না ?

না, ওরা অপর একটা বাড়িতে আছে। মানুতুর বিয়ে—

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

প্রফেসর গুপ্ত কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মিসেস মিত্রকে আপনি কি একটা চিঠি দেবেন ? না, আমিই মুখে গিয়ে বলব ?

তুমি ওই যক্ষ্মারোগীর সেবা না ক'রে ছাড়বে না ?

না।

তবে আর চিঠি লেখার দরকার কি, নিজেই গিয়ে বল।

তবু একটা লিখে দিন।

স্মিতহাস্য করিয়া প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, তা হ'লে প্যাডখানা আর কলমটা নিয়ে এস ওই টেবিলটা থেকে।

শঙ্কর আনিয়া দিল।

প্রফেসর গুপ্ত লিখিলেন—

মিসেস মিত্র,

অন্য লোক খোঁজার দরকার নেই। শঙ্করই সেবা করতে রাজী হয়েছে। এত সস্তায় এত ভাল লোক পাওয়া যেত না। কালকের এন্‌গেজ্‌মেন্টের কথা মনে আছে তো ? ইতি—

গুপ্ত

শঙ্কর পত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল।

প্রফেসর গুপ্ত আসন্ন এন্‌গেজ্‌মেন্টটার কথা ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ইভার চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নাই। প্রায় দুই মাস হইল বেচারা চিঠি লিখিয়াছে। প্যাডখানা টানিয়া লইয়া তিনি ইভাকে চিঠি লিখিতে বসিলেন। উচ্ছ্বাসপূর্ণ দীর্ঘ একটা চিঠি লিখিয়া তখনই সেটা পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে 'কুমারসম্ভব'খানা লইয়া উল্টাইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি এই শ্লোকটিতে আটকাইয়া গেল—

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং শুচিস্মিতা

হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যমা

বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভা-

মনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥

—শুচিস্মিতা কৃশোদরী তপস্যারতা উমা গ্রীষ্মকালে অনন্যদৃষ্টিতে সূর্যের পানে চাহিয়া আছেন। তুষারশীতল হিমালয়ের কন্যা উমা, যে হিমালয়ে

ভাগীরথী নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ।

যদ্‌বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ ॥

—সেই হিমালয়ের সুকুমারী কন্যা উমা শ্মশানবিলাসী সন্ন্যাসীর জন্য অগ্নিপরিবেষ্টিতা হইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া আছেন।

প্রফেসর গুপ্তের সহসা মনে হইল, এই দুরূহ তপশ্চরণ আজকাল আর কেহ করে না। শিবই আজকাল নানা উপহার লইয়া উমার পিছু পিছু ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

৪

অমিয়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, রাজমহলের ভবেশবাবু ছাড়া পাইয়াছেন, মুকুজ্জেমশাইয়ের এবার নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা; কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। কোন একটা কিছু লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে

না পারিলে তিনি কেমন যেন স্বস্তি পান না। একটা কিছু জুটিয়াও যায়। মুকুজ্জেমশাই হরেরামবাবুর নিকটে গিয়াছিলেন। মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে হরেরামবাবু পোস্ট-মাস্টারি করেন। নিতান্ত নিরীহ লোক, কাহারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। থাকিবার অবসরই নাই। সকাল হইতে শুরু করিয়া রাত্রি আটটা নয়টা পর্যন্ত আপিসের কাজকর্ম শেষ করিতেই কাটিয়া যায়। নিড়বিড়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অতিশয় ভালমানুষ। মুকু‌জ্জেমশাই কিন্তু হরেরামবাবুকে বড় ভালবাসেন এবং বছরে অন্তত একবার আসিয়া হরেরামবাবুর কাছে কয়েকদিন কাটাইয়া যান। এবারে আসিয়া কিন্তু কিছু অধিক দিন থাকিতে হইল। পাকেচক্রে অবস্থা একটু জটিল হইয়া উঠিল।

হরেরামবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভোম্বল তাঁহাকে মুশকিলে ফেলিয়া দিয়াছে। ভোম্বলের বয়স দশ-এগারো বছর মাত্র। কিন্তু হইলে কি হয়, বাঘ-বকরি খেলায় সে মুকুজ্জেমশাইকে বার বার তিন বার হারাইয়া দিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই বাজি রাখিয়া হারিয়া গিয়াছেন। মুকুজ্জেমশাই বাজি রাখিয়াছিলেন যে, ভোম্বল যদি তাঁহাকে তিন বার উপর্যুপরি হারাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে ভোম্বল যাহা খাইতে চাহিবে মুকুজ্জেমশাই তাহাই তাহাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইবেন। বিজেতা ভোম্বল মাংস খাইতে চাহিয়াছে। মুরারিপুর যদি শহর হইত অথবা হরেরামবাবু যদি একটু কম নিষ্ঠাবান হইতেন, তাহা হইলে মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষে এই সামান্য প্রতিশ্রুতিটুকু পালন করা অসম্ভব হইত না। মুরারিপুরে কসাইয়ের দোকান নাই, হরেরামবাবু বৃথা-মাংস পছন্দ করেন না। মুকুজ্জেমশাই অনুরোধ করিলে, হরেরামবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়তো রাজী হইতেন; কিন্তু কাহারও প্রিন্সিপ্‌লে আঘাত করা মুকুজ্জেমশাইয়ের স্বভাববিরুদ্ধ। যে যাহা লইয়া সুখে আছে, থাকুক—ইহাই তাঁহার মত। সুতরাং হরেরামবাবুকে এ অনুরোধ তিনি করিলেন না। কিন্তু ইহার পরিবর্তে তিনি যাহা করিলেন, তাহা প্রিন্সিপ্‌ল্‌-সঙ্গত হইলেও হরেরামবাবুর পক্ষে আরও সাংঘাতিক হইল।

হরেরামবাবুকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, হরেরাম, আসছে অমাবস্যাতে, এস, কালীপূজো করা যাক।

মনিঅর্ডার-রেজিস্ট্রি-ভি.পি.-ইন্‌সিওর-বিক্ষুব্ধ হরেরাম প্রথমে কথাটা হৃদয়ঙ্গমই করিতে পারিলেন না।

কি বলছেন?

আগামী অমাবস্যাতে, এস, কালীপূজো করা যাক।

কালীপূজো?

হরেরাম আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি সমস্ত দিন আপিস লইয়া ব্যস্ত থাকেন; ভোম্বলের সহিত মুকুজ্জেমশায়ের বাজির কোন খবরই তিনি রাখেন না। বস্তুত ভোম্বল এবং মুকুজ্জেমশাই ছাড়া আর কেহই এ খবর জানে না। বিস্মিতনেত্রে হরেরাম চাহিয়া রহিলেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, শাক্তবংশের ছেলে তুমি, কালীপূজো করবে তাতে হয়েছে কি? তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমিই সব ব্যবস্থা করব। একটি কালীমূর্তি আর একটি ভাল দেখে কালো পাঁঠা যোগাড় করতে হবে।

মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত হরেরামের অনেক দিনের পরিচয়। তিনি মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আপত্তি করা বৃথা। মুকুজ্জেমশাই যাহা ধরেন, তাহা না করিয়া ছাড়েন না। তা ছাড়া, দেবীপূজায় আপত্তি তুলিতে তাঁহার ধর্মভীরু মন ভীত হইল। বলিলেন, অমাবস্যার আর কদিন বাকি?

দশ দিন।

এর মধ্যে কি সব হয়ে উঠবে?

এর মধ্যে ছোটখাটো মূর্তি একটা হবে না? খোঁজ কর, গ্রামে নিশ্চয় গড়তে পারে কেউ।

মাথা চুলকাইয়া হরেরাম বলিলেন, দেখি বংশীকে ব'লে। আমি কিছুই জানি না।

বংশী পিওন।

বংশীর সহায়তায় সাত-আট দিনের মধ্যে ছোট একটি প্রতিমা এবং নধর একটি পাঁঠা যোগাড় হইয়া গেল। ভোম্বল উল্লসিত হইয়া উঠিল নিষ্ঠাবান পিতার সন্তান হইলে কি হয়, মাংসের প্রতি তাহার খুব লোভ মাংস খাইতে পায় না বলিয়া লোভটা আরও বেশি। তাহার ভারি আনন্দ হইল। পিতামাতার জ্ঞাতসারে সে অবশ্য বেশি হর্ষপ্রকাশ করিতে সাহস করিল না। বাঘ-বকরি খেলার তুচ্ছ বাজির জন্য মুকুজ্জেমশাই এত কাণ্ড করিতেছেন, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে হরেরামবাবু অত্যন্ত চটিয়া যাইবেন নিরীহ হরেরাম চটিয়া গেলে মার-ধোর অথবা হাঁক-ডাক করেন না, নীরবে উপবাস করিতে থাকেন। সুতরাং সহসা কেহ তাঁহাকে চটাইতে চাহে না। মুকুজ্জেমশাই বাঘ-বকরি-প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট উত্থাপিত করিলেন না ভোম্বলও ভালমানুষের মত চুপ করিয়া রহিল।

বংশীর আনুকূল্যে মুকুজ্জেমশাই কালীপূজার আয়োজন যখন শেষ করিয়া আনিয়াছেন, এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রকম একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এক চিঠি আসিয়া হাজির। তাহার সার মর্ম—মুরারিপুরের কয়েকজন মুসলমান অধিবাসী অভিযোগ করিয়াছেন যে, মুরারিপুর পোস্ট-অফিসে নাকি কালীপূজা করা হইতেছে। অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা হরেরামবাবুকে পোস্ট-অফিসে কালীপূজা করিতে নিষেধ করা হইতেছে। কোন গভর্মেণ্ট অফিসে এরূপ পূজাদি করা নিয়মবিরুদ্ধ।

ভোম্বল অত্যন্ত দমিয়া গেল। সঙ্কল্পিত এবং আয়োজিত দেবীপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে হরেরামবাবুও মনে মনে উদ্বিগ্ন হইলেন। দমিলেন না মুকুজ্জেমশাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন, ওর জন্যে আর ভাবনা কি, ওই সামনের মাঠটায় একটা চালা তুলে ফেলে সেইখানেই পূজো করা যাবে। পোস্ট-অফিসে পূজো নাই বা করলাম আমরা, কি বল ভোম্বল?

ভোম্বল ভালমানুষের মত একবার আড়চোখে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। নিকটে উপবিষ্ট বংশীকে সম্বোধন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তুমি দু-চারটে

জনমজুর ডাকাও, বুঝলে বংশী—একটা ছোটখাটো চালা তুলতে আর কতক্ষণ যাবে? গ্রীষ্মকালে মাঠের মাঝখানে বরং ভালই হবে। ও জমিটা তো রামকিষুণের—সে বোধ হয় আপত্তি করবে না। তাকেও তুমি একবার জিজ্ঞেস ক'রে এস।

বংশী রামকিষুণের অনুমতি লইবার জন্য চলিয়া গেল এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, রামকিষুণের আপত্তি তো নাই-ই, সে বরং খুশিই হইয়াছে। সাধুবাবা ওখানে কালীমায়ীর পূজা করিবেন, ইহাতে আপত্তি করিবার কি আছে! সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য আরও যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সে করিতে প্রস্তুত আছে। মুকুজ্জেমশাই বংশীকে চালা তুলিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং খড় বাঁশ প্রভৃতি কিনিবার জন্য টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পূজার যাবতীয় খরচ মুকুজ্জেমশাই-ই বহন করিতেছেন, হরেরামের নিকট হইতে এক পয়সাও লইতে রাজী হন নাই।

আয়োজিত কালীপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে হরেরাম মনে মনে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, এখন কর্তৃপক্ষের অমতে কালীপূজা করিতে আবার তিনি মনে মনে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। যদিও পোস্ট-অফিসে করা হইতেছে না, একেবারে পোস্ট-অফিসের সীমানার বাহিরেই হইবে; তথাপি কর্তৃপক্ষের অমতেই তো হইবে! চাকরির যা বাজার, কোথা হইতে কি হইয়া যায়, কে বলিতে পারে? অথচ নিষ্ঠাবান হিন্দুসন্তান হইয়া আয়োজিত পূজা না করাটাও—। এক দিকে মা-কালী, অন্য দিকে পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,—নিরীহ নিষ্ঠাবান হরেরাম মর্মান্তিক দোটানায় পড়িয়া গেলেন। কিন্তু মুকুজ্জেমশাই মা-কালীর পক্ষে, নিরুপায় হরেরামকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল।

মুকুজ্জেমশাই মহা উৎসাহে জনমজুর লইয়া রামকিষুণের মাঠে চালাঘর তুলিতে লাগিয়া গেলেন। ভোম্বল মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট হইতে ফর্দ ও টাকা লইয়া ভাল ঘি গরমমসলা প্রভৃতির সন্ধানে বাজারের নানা দোকানে

ঘুরিতে লাগিল। মুকুজ্জেমশাই এত রকম মসলার ফিরিস্তি দিলেন যে, মুরারিপুরে সবগুলি মেলাই মুশকিল হইয়া উঠিল। সির্কা এবং জাফরান এ দুইটি দ্রব্য তো কোথাও মিলিল না।

বেলা তিনটা নাগাদ চালা খাড়া হইয়া গেল। চালার ব্যাপার শেষ করিয়া মুকুজ্জেমশাই মাংসের ব্যাপারে মন দিলেন। মুকুজ্জেমশাই ঠিক করিয়াছিলেন, রাত্রে পূজা হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাংসটি রাঁধিয়া ফেলিবেন। তিনি নিজেই রাঁধিবেন। ভোম্বল এবং তাহার কয়েকজন সঙ্গী গোল গোল করিয়া নৈনিতাল আলু ছাড়াইতেছে। আলু ছাড়ানো হইয়া গেলে আলুগুলির গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া ভাজা মসলা পুরিতে হইবে। মুকুজ্জেমশাই নানা রকম মসলা ভাজিয়া গুঁড়া করাইতেছেন। অনেক কষ্টে জিওলপুর গ্রামের দৌলতরাম মাড়োয়ারীর নিকট জাফরান পাওয়া গিয়াছে। সির্কা পাওয়া যায় নাই। মুকুজ্জেমশাই টক দই দিয়া তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া লইবেন আশ্বাস দিয়াছেন। কালীপূজার আয়োজন পুরাদমে চলিতেছে, এমন সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গো-শকটে আরোহণ করিয়া স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয় হাজির হইলেন। তিন ক্রোশ দূরবর্তী স্টেশন হইতে মুরারিপুরে আসিতে হইলে গো-শকট ছাড়া অন্য কোন যান নাই, সুতরাং মাননীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয়কে গো-শকটেই আসিতে হইয়াছে। প্রকাশ্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয় বলিলেন, তিনি মুরারিপুর পোস্ট-অফিস ভিজিট করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মুসলমান, সেই হেতু সকলে অনুমান করিতে লাগিল যে, তাঁহার কালীপূজা-সম্পর্কিত আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। চাকুরিজীবী নিরীহ হরেরাম বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই ছিদ্রিত আলুগুলিতে মসলা পুরিতে পুরিতে একটু হাসিলেন এবং হরেরামকে বলিলেন, তুমি তোমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌কে সামলাও গিয়ে,

এখানে আসবার দরকার নেই তোমার। আমরা সব ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি।

হরেরাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সামলাইতে লাগিলেন। মুকুজ্জেমশাই ভোম্বলদের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র গল্প বলিতে বলিতে মাংস রান্নার আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন। সন্ধ্যা নাগাদ কালীপ্রতিমা আসিয়া চালায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন, গ্রামের পুরোহিত মহাশয় পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কালীপূজা হইয়া গিয়াছে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি থমথম করিতেছে। চালাঘরের পাশেই একটি তোলা উনুনে মুকুজ্জেমশাই মাংস রান্না করিতেছেন, সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। নিকটেই ভোম্বল ও তাহার তিন-চারজন সঙ্গী গুটিসুটি হইয়া বসিয়া আছে। পুরোহিত মহাশয়ও মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। জমির মালিক রামকিষুণ ও তাহার সম্বন্ধী খুবলালও সোৎসাহে জাগিয়া বসিয়া আছে। যদিও রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কাহারও চোখে ঘুম নাই। মুকুজ্জেমশাই খুব জমাইয়া একটি ভূতের গল্প শুরু করিয়াছেন।

আগামী কল্য বেলা দশটার আগে ট্রেন নাই। সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে পোস্ট-অফিসেই রাত্রিবাস করিতে হইতেছে। তিনি কালীপূজা সম্পর্কে হরেরামবাবুর কোন খুঁত ধরিতে না পারিয়া আপিসের কাগজপত্র নাকি তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। ভোম্বল মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে যে, রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি নাকি খাতাপত্র দেখিয়াছেন। পোস্ট-অফিসের বাহিরের ঘরটাতে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং স্থানীয় মাদ্রাসার মৌলভীসাহেব তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিপাটীরূপে আহার করাইয়াছেন। বংশী বলিল, এই উপলক্ষ্যে মৌলভীগৃহে মুরগীও নাকি নিহত হইয়াছে। এখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় পোস্ট-অফিসের বাহিরের ঘরটাতে নিদ্রিত। মাংস প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে,

ভূতের গল্পও বেশ জমিয়া উঠিয়াছে—এমন সময় পোস্ট-আফিসের বাহিরের ঘর হইতে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল।

সাপ—সাপ!

সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, বংশী, তুমি লণ্ঠনটা নিয়ে একটু এগিয়ে দেখ। শুধু বংশী নয়, খুবলাল, রামকিষুণ, পুরোহিত, ভোম্বল সকলেই আগাইয়া গেল। সত্যই সাপ বাহির হইয়াছে। বিরাট এক কেউটে পোস্ট-অফিসের কোণে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অবস্থা অবর্ণনীয়। সাপটাকে মারা গেল না, কোথায় যে চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল বোঝা গেল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পোস্ট-অফিসে শুইতে চাহিলেন না। শশব্যস্ত হরেরাম তাঁহাকে কোথায় শুইতে দিবেন চিন্তায় পড়িলেন। রামকিষুণ বলিল, মৌলভীসাহেবের বাড়িতে খবর পাঠানো হোক। তাহাই হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মৌলভী-সাহেবের ঘরটাতে শুইতে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। চোখ বুজিলেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় সর্পটা হিংস্র ফণা উদ্যত করিয়া তর্জন করিতেছে। অতি প্রত্যূষেই তিনি মুরারিপুর ত্যাগ করিলেন। রামকিষুণ প্রথমে ব্যাপারটা ভালভাবে প্রণিধান করে নাই; কিন্তু পরে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রভাতে আসিয়া ভক্তিভরে মুকুজ্জেমশাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সাধুবাবাটি তো সহজ লোক নহেন! এত বড় অকাট্য প্রমাণ পাইয়া সে যেন চরিতার্থ হইয়া গিয়াছিল। প্রকাণ্ড কেউটে আসিয়া হাজির হইয়া গেল! ম্লেচ্ছ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পলাইতে পথ পাইল না! রামকিষুণের এতাদৃশ ভক্তিবাহুল্যে মুকুজ্জেমশাই কিন্তু মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন—লোকটা মাদুলি অথবা মন্ত্র চাহিয়া না বসে! এই জাতীয় অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার জীবনে অনিবার্যভাবে জুটিয়া গিয়াছে, আর সংখ্যা বাড়াইতে তিনি চান না। রামকিষুণ মাদুলি কিংবা মন্ত্র চাহিল না; কিন্তু অনুরোধ করিল, আরও দুই-চারিদিন তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হইবে। তাহার কন্যার 'গওনা' অর্থাৎ দ্বিরাগমন আর কয়েক দিন পরেই অনুষ্ঠিত হইবে। সে সময় পর্যন্ত যদি

সাধুবাবা 'কিরপা' করিয়া থাকিয়া যান, বড় ভাল হয়। তাঁহার আশীর্বাদ নবদম্পতীর জীবনের অমূল্য সম্পদ হইবে।

মুকুজ্জেমশাই মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। ভোম্বল মাংস খাইয়া খুশি হইয়াছে, কালীপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্টেশন অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। হরেরামবাবুর কাজকর্মে কোনরূপ গাফিলতি ধরা পড়ে নাই। সুতরাং নিশ্চিন্তচিত্তে মুকুজ্জেমশাই এবার যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, হঠাৎ রামকিষুণের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সরল প্রকৃতির লোকটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহার বাধিতেছিল, অথচ মুরারিপুরে আর তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। এক স্থানে বেশিদিন থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি রামকিষুণের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু সকালের ডাকে একখানি পত্র পাইয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সেই দিনই তাঁহাকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। জরুরী পত্রের বিষয় অবগত হইয়া রামকিষুণও আর আপত্তি করিল না। পত্রখানি হাসির। হাসিকে তিনি মুরারিপুরের ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলেন। সাধারণত তিনি কাহাকেও ঠিকানা দিয়া আসিতে চান না। কিন্তু হাসি নূতন লিখিতে শিখিয়াছে, মুকুজ্জেমশাইকে চিঠি লিখিবে বলিয়া জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঠিকানা আদায় করিয়া লইয়াছিল; হাসির চিঠি পাইয়া মুকুজ্জেমশাই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বড় বড় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে হাসি লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

বড় বিপদে প'ড়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। ঠাকুরপো তার এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি ব'লে একদিন সন্ধ্যের সময় চ'লে যায়। সেই থেকে ঠাকুরপো আর ফেরে নি। এখন শুনছি, সে নাকি পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে, তার কাছে বোমা আর রিভলবার পাওয়া গেছে। ঠাকুরপো এখন হাজতে। আজ শুনছি, ওঁরও নাকি চাকরি থাকবে না। উনি যখন মজঃফরপুর গিয়েছিলেন, তখন ওঁকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। ওঁদের

সঙ্গে মিস্টার ঘোষ ব'লে কে এক মুখপোড়া নাকি কাজ করে—চিঠিখানা তার হাতে পড়েছে। আমার চিঠির ভেতরে সে-কি দেখতে পেয়েছে জানি না, কিন্তু তা নিয়ে নাকি ওঁর চাকরি যাচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি শিগগির চ'লে আসুন। আমি বাবাকেও চিঠি লিখলুম। ইতি—

হাসি

পুনশ্চ—

দেখেছেন, আমার মাথার একেবারে ঠিক নেই। তাড়াতাড়িতে আপনাকে প্রণাম দিতেই ভুলে গেছি। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিন। ইতি—

হাসি

মুকুজ্জেমশাই সেই দিনই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৫

নীরব গভীর রাত্রি।

মরণোন্মুখ যতীন হাজরার শয়নশিয়রে শঙ্কর একা জাগিয়া বসিয়া আছে। ঘরের এক কোণে টেবিলের উপর একটি বাতি জ্বলিতেছে। আপেল, বেদানা, কমলালেবু প্রভৃতি দুই-চারিটি ফলও টেবিলে সাজানো আছে। মিষ্টিদিদি এগুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু যতীনবাবু একটিও স্পর্শ করেন নাই। যতীনবাবু লোকটি অদ্ভুতপ্রকৃতির। আর কিছু নয়, অদ্ভুত রকম নীরব। শঙ্করের সহিত একটিও কথা হয় নাই। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ। অতিশয় ক্লান্তি-ব্যঞ্জক কোটরগত চক্ষু দুইটি বুজিয়া সর্বক্ষণই চুপ করিয়া শুইয়া থাকেন। নীরবে বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুর কাছে এমন আত্মসমর্পণ শঙ্কর আর কখনও দেখে নাই। শঙ্কর যতীনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। লক্ষ্য করে, তাঁহার গলার দুই পাশের শিরা দুইটা অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, সন্ধ্যার পর কাশিটা বাড়িয়া উঠে। প্রয়োজন হইলে নিজেই উঠিয়া বাথ-রুমে যান, একটি বালক-ভৃত্য খাবার আনিয়া দুই

বেলা তাঁহাকে খাওয়াইয়া যায়, প্রকাশবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যায় একবার করিয়া আসেন। প্রকাশবাবুর প্রশ্নের উত্তরেই অতি সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা যতীনবাবু বলেন ; প্রকাশবাবু চলিয়া গেলে আবার চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকেন। শঙ্কর যে দিবারাত্রি তাঁহার নিকটে রহিয়াছে, তাহা তিনি মোটে লক্ষ্যই করিতে চান না। শঙ্কর পাড়ার একটা সস্তা হিন্দু হোটেলে আহারাদি সমাধা করিয়া আসে। (নিজের গরম ওভার-কোটটা বিক্রয় করিয়া সে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে।) এবং নির্বাক হইয়া এই যক্ষ্মারোগীর মরণশিয়রে জাগিয়া বসিয়া থাকে।

হয়তো থাকিত না, কিন্তু চুনচুনের জন্য থাকিতে হয়। সকলের বারণ সত্ত্বেও গভীর রাত্রে চুনচুন লুকাইয়া স্বামীকে দেখিতে আসে। গভীর রাত্রে শঙ্কর কপাট খুলিয়া দেয়, চুনচুন চোরের মত আসিয়া প্রবেশ করে। চুনচুন প্রবেশ করিলে শঙ্কর বাহিরে চলিয়া যায়। চুনচুন বেশিক্ষণ থাকে না। যতক্ষণ থাকে, শঙ্কর ফুটপাথে পায়চারি করিতে করিতে চুনচুনের কথাই ভাবে। চুনচুন খুব রোগা, খুব কালো, কিন্তু চোখ দুইটি তাহার সুন্দর। চোখ দুইটি বড় নয়, কিন্তু অপরূপ : চুনচুনের সমস্ত অন্তরের ছবি যেন ওই কালো চোখ দুইটি। গভীর রাত্রে এই গোপন অভিসার শঙ্করের মনকে উতলা করিয়া তোলে। প্রেমাস্পদকে গোপনে বিবাহ করিয়া চুনচুন গোপনেই তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। হিতৈষিণী দিদি এবং দিদির বান্ধবীর দল চুনচুনকে কিছুতেই তাহার স্বামীর সংস্রবে আসিতে দিবে না, এমন কি মৃত্যুকালেও নয়। ছোঁয়াচে রোগের অজুহাতে এ যেন প্রতিশোধ লওয়া। আজ যদি মিসেস স্যানিয়ালের ওই রোগ হয়, চুনচুনকে কি তিনি কাছে যাইতে দিবেন না? কিন্তু এসব লইয়া দিদির সহিত তর্ক করিবার কল্পনা করাও চুনচুনের পক্ষে অসম্ভব। অতিশয় মার্জিতরুচি মৃদুপ্রকৃতির মেয়ে। শঙ্করের মনে হয়, অতিশয় নিগূঢ়প্রকৃতির। তাহা না হইলে গোপনে বিবাহ করিতে পারিত না, গভীর রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিত না। শঙ্করের মনে হয়, চুনচুন সমাজের সহিত ইতরের মত কলহ করিতে চায়

না, কিন্তু নিজের মতে নিজের পথে চলিতে চায়। প্রকাশ্যভাবে চলিবার যদি বাধা থাকে, বাধা অতিক্রম করিবার জন্য সে অকারণে শক্তিক্ষয় করে না, গোপনতার আশ্রয় লয়। নিদ্রিত যতীনবাবুর পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া শঙ্কর চুন্‌চুনের কথাই ভাবে। চুন্‌চুনকে ঘিরিয়া তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। উৎসুক হইয়া না উঠিলে শঙ্কর এই নীরব মৃত্যু-পথ-যাত্রীর মাথার শিয়রে এমনভাবে হয়তো দিনের পর দিন বসিয়া থাকিতে পারিত না। পাশের বাড়ির ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। আর একটু পরেই চুন্‌চুন আসিবে। দ্বারে মৃদু করাঘাতটির প্রত্যাশায় শঙ্কর সজাগ হইয়া বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, শঙ্করের খেয়াল ছিল না। সে টেবিলের এক ধারে বসিয়া 'অ্যানা ক্যারেনিনা' পড়িতেছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করিল, যতীনবাবু একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল, একটু ভয়ও পাইল।

শুনুন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি তাঁহার বিছানার কাছে উঠিয়া গেল। যতীনবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার একটি উপকার করবেন দয়া ক'রে?

কি, বলুন?

যতীন হাজরা কয়েক মুহূর্ত শঙ্করের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি তো?

নিশ্চয়।

যতীনবাবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, দেখুন, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি আর বাঁচব না। আমার ভেতরটা কেমন যেন খালি খালি হয়ে আসছে।

আবার চুপ করিলেন।

শঙ্কর নীরবে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে যতীনবাবু বলিলেন, মারা যাব সে জন্যে দুঃখ নেই, আমার সবচেয়ে দুঃখ যে ম'রেও আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরও অশান্তি ভোগ করার জন্যে আমার মনটা বোধ হয় বেঁচে থাকবে।

শঙ্কর চুপ করিয়াই রহিল।

যতীনবাবু বলিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনি তাকে বলবেন যে, অনুতাপে আমার বুকটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আমি এ ক দিন খালি তার কথাই ভাবছি, আর কোন কিছু ভাববার শক্তিও নেই আমার।

আপনি কার কথা বলছেন?

আমার স্ত্রীর।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

যতীনবাবু বলিলেন, চুন্‌চুনের নয়, আমার প্রথম স্ত্রীর। সে এখনও বেঁচে আছে। আমি তাকে ফেলে পালিয়ে এসেছিলাম। সে নিরপরাধ জেনেও তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ত্যাগ ক'রে এসেছিলাম। সে এখনও বেঁচে আছে। আপনি একবার দয়া ক'রে যাবেন তার কাছে? তাকে বলবেন যে, আমি—

যতীনবাবু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

একটু চুপ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বলবেন, আমার পাপের পুরো প্রায়শ্চিত্ত ক'রে জ্ব'লে পুড়ে অনুতাপ করতে করতে আমি মরেছি। আপনি কাল একবার দয়া ক'রে যাবেন তার কাছে। গিয়ে বলবেন যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারই কথা ভেবেছি, মনে মনে তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়েছি—

শঙ্কর বলিল, চুন্‌চুন, মানে—মিসেস হাজরা কি এ কথা কিছুই জানেন না?

না। লুকিয়ে বিয়ে করেছি ওকে, সে অনেক ইতিহাস—বলবার এখন সময় নেই।

একটু চুপ করিয়া পুনরায় বলিলেন, মেয়েমানুষ, দুটো মিষ্টি কথা বললেই

ভুলে যায়, অতি সহজেই ভুলে যায়। আপনি ওকে যেন ওসব কথা বলবেন না, বৃথা কষ্ট পাবে। এ কি—এ কি—এখনই সব অন্ধকার হয়ে আসছে যে—আপনি—তার—

সব শেষ হইয়া গেল।

প্রথম স্ত্রীর ঠিকানা আর শঙ্করকে বলা হইল না। নির্বাক শঙ্কর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

প্রথম দিন ভন্টু কথাটা পাড়িতে পারে নাই। ওইরূপ নিদারুণ সংবাদ শোনার পর টাকার কথা পাড়া সম্ভবপর হয় নাই। আজও যে জিনিসটা সহজ হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু আজ না পারিয়া উপায় নাই। কাল রাত্রে করালীচরণ স্বয়ং নাকি টাকার তাগাদায় তাহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। ভাগ্যে সে বাড়িতে ছিল না! বউদিদি বলিলেন যে, সে বাড়িতে নাই শুনিয়াও করালী নড়িতে চাহেন নাই। ভন্টুর অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, ভন্টু যেন অতি অবশ্য অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। দ্রাবিড়ী লদ্‌কোলদ্‌কির নেশায় চাম গ্যান্‌ঢঅ যেরূপ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে রিক্ত হস্তে তাঁহার সহিত দেখা করিলে রক্তসিক্ত হইয়া ফিরিতে হইবে। সুতরাং অশোভন হইলেও নিবারণবাবুকে আজ না খজলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু কিরূপে? মুখবন্ধটা কি প্রকারে করা যায়—ভন্টু ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না। এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক কথাগুলি গুছাইয়া মনে মনে মহড়া দিয়া লইলে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ঠিক কথাগুলি কিছুতেই মনে আসে না। কার্যক্ষেত্রে যথাসময়ে যা হোক করিয়া ব্যাপারটা আপনিই সম্পন্ন হইয়া যায়। হইলও তাহাই। ভন্টু গিয়া দেখিল, নিবারণবাবু ম্লানমুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ভন্টুকে দেখিলে পূর্বে

যেরূপ সোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধনা করিতেন, এখন তাহার কিছুই করিলেন না। ক্লান্ত কণ্ঠে কেবল বলিলেন, আসুন।

ভন্টু উপবেশন করিল। ভন্টু কবি নয়, তবু তাহার মনে একটা উপমার উদয় হইল। লোকটা যেন নিবিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ভন্টু বলিল, কোন খবর-টবর পেলেন?

কিছু না। পুলিসে খবর দিয়েছি আমি।

ভন্টু নীরব রহিল।

সহসা নিবারণবাবু উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, এর জন্যে যত টাকা লাগে, খরচ করব আমি। ও-ব্যাটাকে আমি দেখে নেব যেমন ক'রে হোক।

ভন্টু তথাপি নীরব।

আসৃমিকে জানতেন তো, অত্যন্ত সরল সাদাসিধে মেয়ে সে; স্কাউণ্ড্রেলটা নিশ্চয়ই কোন রকম ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে গেছে তাকে। বুঝছেন না আপনি?

ভন্টু সুযোগ পাইল, হাসিয়া বলিল, খুব বুঝছি। আসৃমির কতই না বয়েস, দার্জি হ'লেও বা কথা ছিল।

দার্জিও ওসব কিছু বোঝে না, আমাদের গুষ্টিরই ধারা অন্য রকম। এই রাস্কেলটা জুটেই না এই হাল হ'ল!

ভন্টু একটু হাসিয়া বলিল, সে কি আর আমি জানি না! এতদিন আপনার বাড়িতে আসছি যাচ্ছি, আপনার মেয়েদের গলার স্বরটি পর্যন্ত শুনতে পাই নি কোনদিন।

ওই যে বললাম আপনাকে, আমাদের গুষ্টিরই ধারা অন্য রকম।

নিবারণবাবুর গুষ্টির ধারা কি রকম, তাহা লইয়া আলোচনা করিতে ভন্টু আসে নাই; সুতরাং সে চুপ করিয়া গেল। আসল কথাটা কোন্ ফাঁকে পাড়িবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে নিবারণবাবু বলিলেন, পুলিসের পাল্লায় পড়লে টিট হবেন বাছাধন।

ভন্টু বলিল, পুলিসের হাঙ্গামা করলে আবার একটা কেলেঙ্কারি না-হয়!

কাগজে হয়তো এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে, আপনাকে আবার দার্জির বিয়ে দিতে হবে তো।

হ'লেই বা, সত্যি কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না বলতে চান?

ভন্টু নিবারণবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য করিল, আপনার মত সরল ধর্মভীরু লোক দুনিয়ায় খুব বেশি নেই নিবারণবাবু।

নিবারণবাবু কোন উত্তর দিলেন না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পা দোলাইতে লাগিলেন। ভন্টুও আর কোন কথা বলিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, লোকটি অতিশয় ভালমানুষ এবং ভালমানুষি জিনিসটা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর।

সহসা নিবারণবাবু ভন্টুর দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, দার্জির জন্যে দিন না একটা পাত্র জুটিয়ে ভন্টুবাবু। মেয়েটা মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভারি কষ্ট হয় আমার। টাকা আমি খরচ করব। তিন হাজার নগদ, গয়না, দানপত্র—যথাসাধ্য দেব আমি। ভদ্রবংশের ছেলে দিন একটি যোগাড় ক'রে, গরিব হ'লেও ক্ষতি নেই, ওদের ভরণপোষণের যা হোক একটা বন্দোবস্ত আমি ক'রে যেতে পারব। আমার ওই মেয়েরা ছাড়া আর কে আছে বলুন? তাও তো আস্‌মিটা—

নিবারণবাবুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না। উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বিদ্যুৎচমকের মত ভন্টুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। দুই-এক মিনিট সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিল এবং তাহার পর বলিল, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে একটা প্রস্তাব করি।

কি বলুন?

আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন?

নিবারণবাবু সত্যই ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্ফারিতচক্ষে ভন্টুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন, আমার ওই কুচ্ছিত মেয়েটাকে নেবেন আপনি?

ভন্টু বলিল, দেখুন, আমি আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। আপনি আমার অবস্থা ভাল ক'রেই জানেন। দু-কুড়ি সাতের খেলা কোনক্রমে খেলে যাচ্ছি, তা-ও চারিদিকে ধার হয়ে গেছে। যা মাইনে পাই, তাতে কুলোয় না। দাদার চেঞ্জের খরচ, সংসারের খরচ, সব আমাকে ওই মাইনে থেকে চালাতে হয়। চারিদিকে ধার হয়ে গেছে। আপনি যদি কিছু টাকাকড়ি দেন, ধার-টারগুলো শেষ ক'রে একটু ঝাড়া-হাত-পা হতে পারি। টাকার জন্যেই আমার বিয়ে করা। এক জায়গায় সাড়ে পাঁচ শো টাকা ধার আছে, দু-এক দিনের মধ্যে দিতে না পারলে অপমানিত হতে হবে। আমি আপনার কাছেই টাকাটা চাইব ভাবছিলাম, আপনার এই অবস্থা দেখে কেবল চাইতে পারছিলাম না। এখন আপনার কথা শুনে মনে হ'ল—আপনি স্বজাতি, পালটি ঘর, আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আপনার মেয়ের বিয়ে হতে পারে। আপনারও কন্যাদায় উদ্ধার হয়, আমিও একটু ঝাড়া-হাত-পা হই। বিয়ে তো একদিন করতেই হবে। চিঠিও আসছে নানা জায়গা থেকে—

নিবারণবাবু বলিলেন, আপনি দার্জিকে দেখেছেন ভাল ক'রে?

যা দেখেছি, তাই যথেষ্ট।

আপনার বাবা রাজী হবেন তো?

চেষ্টা করব।

নিবারণবাবু উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে একটি চেক-বই লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কত টাকা চাই বললেন আপনার?

সাড়ে পাঁচ শো।

নিবারণবাবু তৎক্ষণাৎ চেক লিখিয়া দিলেন।

কথা তা হ'লে পাকা তো?

একদম পাকা।—এই বলিয়া ভন্টু হেঁট হইয়া নিবারণবাবুর পদধূলি লইল। এবার আর নিবারণবাবু আপত্তি করিলেন না।

প্রথম চিঠি লেখার উৎসাহে কিছুদিন পূর্বে হাসি চিন্ময়কে লুকাইয়া যে চিঠিখানি স্বামীকে লিখিয়াছিল, তাহা যে মৃন্ময়ের সহকর্মী মিস্টার ঘোষের হাতে পড়িয়া এত অনর্থ সৃষ্টি করিবে, তাহা হাসির কল্পনাতীত ছিল। মৃন্ময়ও কল্পনা করে নাই যে, হাসি তাহাকে চিঠি লিখিতে পারে। মৃন্ময় জানিত, হাসি নিরক্ষর। হাসি যে দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রোজ হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল, এ খবর মৃন্ময়ের অজ্ঞাত ছিল। মৃন্ময়কে অবাক করিয়া দিবে বলিয়া হাসি ঘুণাক্ষরেও মৃন্ময়কে কিছু জানায় নাই। মজঃফরপুরের কাজ সারিয়া মৃন্ময় যখন কলিকাতায় চলিয়া আসে, তখন সেখানকার পোস্ট-অফিসে বলিয়া আসিয়াছিল যে, তাহার নামে যদি কোন চিঠিপত্র আসে তাহা যেন কলিকাতায় তাহার অফিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার ধারণা ছিল, যদি কোন চিঠি আসে, তাহা অফিসেরই চিঠি হইবে। সুতরাং বাড়ির ঠিকানা দিয়া আসিবার কল্পনাও তাহার মাথায় আসে নাই।

হাসির চিঠি যখন মজঃফরপুর ঘুরিয়া কলিকাতার অফিসে আসিয়া পৌঁছিল, তখন মৃন্ময় অফিসে ছিল না। অফিসে ছিলেন মিস্টার ঘোষ, দৈবক্রমে চিঠিখানা তাঁহারই হাতে পড়িয়া গেল। দাবার ছকে নিবদ্ধদৃষ্টি কোন দাবা-খেলোয়াড় ভাল একটা চাল হঠাৎ আবিষ্কার করিলে যেমন আনন্দিত হইয়া উঠেন, মিস্টার ঘোষ ঠিক তেমনই আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। এই তো বাজি মাত হইয়া গিয়াছে! ঠিক এই হাতের লেখারই তো তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন! অসঙ্কোচে তিনি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া ফেলিলেন। কে এই হাসি? যেই হউক, মৃন্ময়বাবুর সহিত বেশ মাখামাখি আছে দেখা যাইতেছে। উত্তেজনায় আনন্দে মিস্টার ঘোষের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে অর্ধ-বিকশিত ক্রূর একটা হাসি নীরবে যেন বলিতে লাগিল, এইবার তো লোকটাকে কবলে পাওয়া

গিয়াছে! একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে, এতদিন বাছাধন ডুবিয়া জলপান করিতেছিল। মিস্টার ঘোষ অতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। শুধু যে বাজিমাত হইয়া গিয়াছে তাহা নয়, এক ঢিলে দুইটি পক্ষীই নিহত হইয়াছে। সেদিন যে অ্যানার্কিস্ট ছোকরা ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার নিকট যে চিঠির টুকরাটা পাওয়া গিয়াছে, তাহার লেখা আর মৃন্ময়বাবুর এই হাসির লেখা তো হুবহু এক। লিপি-সমস্যার সমাধান এইবার সহজে হইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নয়, চাকরি-জগতে প্রবল-প্রতিদ্বন্দ্বী মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়ের নিষ্কলঙ্ক চাকুরি-জীবনে বেশ মোটা একটা কলঙ্কও লাগিয়া দেওয়া যাইবে। চিন্ময় নামে যে ছোকরা ধরা পড়িয়াছে, শোনা যাইতেছে, সে নাকি মৃন্ময়বাবুরই সহোদর ভাই। এই হাসিটা মৃন্ময়ের কে হয়?

পরদিনই খোদ বড় সাহেব মৃন্ময়কে তলব করিলেন। মৃন্ময়ের মুখের দিকে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, চিন্ময় তোমার কে হয়?

ভাই।

হাসি তোমার কে হয়?

স্ত্রী।

এরা যে এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তুমি জানতে?

না।

সত্যি কথা বল।

সত্যি কথাই বলছি।

সাহেব ক্ষণকাল মৃন্ময়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আচ্ছা, যাও।

মৃন্ময়ের শ্বশুর মহাশয় পুলিসের বড় চাকুরে। তাঁহারই খাতিরে এবং চেষ্টায় মৃন্ময় ও হাসি রেহাই পাইয়া গেল, অর্থাৎ তাহাদের জেল হইল না। মৃন্ময়ের চাকরিটি কিন্তু গেল। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখিলেন, চাকুরিবিহীন মৃন্ময় অত্যন্ত মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং হাসি তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ

বৃষ্টি পড়িতেছে।

ভিজিয়া ভিজিয়াই শঙ্কর হাঁটিয়া চলিয়াছে। তখনও রাগে তাহার মাথার শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল। অপদার্থ লোকটার স্পর্ধা তো কম নয়! হাঁদা জরদ্গব ছেলেটাকে টাকার জোরেই রাতারাতি বুদ্ধিমান করিয়া তুলিবে ভাবিয়াছে! অঙ্ক কিছু তো জানেই না, বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না, তাহাকে ফিজিক্স্ পড়াইতে হইবে! তাও না হয় চেষ্টা করা যাইত; কিন্তু উহাদের অর্থোত্তাপ অত্যন্ত বেশি, শঙ্করের পক্ষে অসহ্য। হস্তীমূর্খ ছেলেটার পিছনে শঙ্কর যে এতটা করিয়া সময় নষ্ট করিতেছে, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ছেলের বাবা এমনভাবে কথাবার্তা বলেন, যেন ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের চেয়ে কোন অংশে বড় নয়। আজ স্বচ্ছন্দে তাহাকে বলিয়া বসিলেন, ওহে মাস্টার, আজ আমাদের চণ্ডীবাবু বলছিলেন যে, পড়াশোনা তেমন নাকি সুবিধে হচ্ছে না! ফিজিক্সের কি একটা কোশ্চেন করেছিলেন উনি, কিছুই বলতে পারলে না। চণ্ডীবাবু বলছিলেন, আর কটা টাকা বেশি দিয়ে কলেজের একজন প্রফেসার রাখলেই ভাল হয়। কি বলেন আপনি, হবে আপনার দ্বারা পড়ানো? টাকার জন্যে আমি ভাবি না, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্নো—প্রফেসারই না হয় রাখি একটা—

শঙ্করের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি সে শান্তকণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, চণ্ডীবাবু কে?

একজন রিটায়ার্ড ইন্‌জিনিয়ার। আমাদের পাড়াতেই থাকেন। তিনিই কাল জীবুকে ডেকে দু-চারটে কোশ্চেন করলেন, ও তো কিছুই বলতে পারলে না, হাঁ ক'রে রইল।

শঙ্কর বলিয়া বসিল, ও হাঁ ক'রেই থাকবে, ওর দ্বারা কিছু হবে না। ওর মাথায় কিছু ঢুকতে চায় না সহজে—

ঢোকাতে জানলেই ঢোকে। জীবু বলছিল, আপনি নাকি কেবল অঙ্কই কষান, ফিজিক্স্ কিছুই পড়ান না।

অঙ্ক না জানলে ফিজিক্স্ পড়া যায় না।

এই কথা শুনিয়া গড়গড়ায় একটা টান দিয়া হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে এমন টানিয়া টানিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন, যেন শঙ্কর হাস্যোদ্দীপক অসম্ভব কিছু একটা বলিয়া ফেলিয়াছে।

দেখুন, কারও রুটি আমি সহজে মারতে চাই না, কিন্তু মন দিয়ে একটু পড়াবেন-টড়াবেন।

আমি আর কাল থেকে আসব না, আপনি কলেজের প্রফেসারকেই বাহাল করুন।

শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেছিল, ভদ্রলোক ডাকিয়া বলিলেন, মাইনেটা তা হ'লে চুকিয়ে দিই, দাঁড়ান। কদ্দিন কাজ করেছেন আপনি?

আমার ঠিক মনে নেই।

দাঁড়ান, আমার টোকা আছে।

কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি আজ নিয়ে একুশ দিন কাজ করেছেন, মাসিক চল্লিশ টাকা হিসেবে আপনার আটাশ টাকা পাওনা—এই নিন। গুপ্তমশায়কে বলবেন যে আমি আপনাকে ছাড়াই নি, আপনি নিজেই ছেড়ে গেলেন। আমার ছেলে ওই কলেজেই পড়ে, গুপ্তমশায়ের কথায় প্রিন্সিপ্যাল ওঠেন বসেন শুনেছি, তাঁকে আমি চটাতে চাই না। আপনি নিজেই ছেড়ে গেলেন, এই কথাটা দয়া ক'রে জানিয়ে দেবেন তাঁকে।

আচ্ছা।

হনহন করিয়া চলিতে চলিতে শঙ্কর ভাবিতেছিল, এইবার কি করিবে? মাত্র এই কটি টাকা, কলিকাতা শহরে দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। যে মেসে সে উঠিয়াছে, তাহার চার্জ মিটাইতেই তো কুড়িটা টাকা লাগিবে। নূতন কাজের সন্ধান করিলেই কি মিলিবে? তাহার উপর কয়দিন হইতে

যে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, কোথাও বাহির হওয়াই মুশকিল। সমস্ত আকাশে চাপ চাপ মেঘ, দিবারাত্রি বৃষ্টির বিরাম নাই। সহসা শঙ্করের মনে হইল, আকাশ নির্মেঘ হইলেই বা সে কি করিত, বৃষ্টির দোহাই দিয়া তবু কয়েকটা দিন অকর্মণ্যতাটাকে সহ্য করা যাইতেছে। আকাশ একদিন না একদিন নির্মেঘ হইবেই, কিন্তু তাহার সমস্যার সমাধান কি তাহা হইলেই হইয়া যাইবে?

শঙ্করবাবু নাকি?

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, বেলা মল্লিক। অবাক হইয়া গেল। মাথায় ছাতা, পরনে ঘন নীল রঙের শাড়ি, বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে হাই-হীল জুতা, গ্রীবাভঙ্গীসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। সমস্ত অবয়বে এমন একটা আভিজাত্যমণ্ডিত শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, শঙ্কর চোখ ফিরাইতে পারিল না, মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বেলা মল্লিকই পুনরায় কথা বলিলেন, কোথায় চলেছেন?

মেসে।

আজকাল মেসে থাকেন নাকি? আমার ধারণা ছিল, আপনি হস্টেলে থাকেন।

আপনি কিছুই শোনেন নি তা হ'লে?

না। শোনবার মত কিছু আছে নাকি?

শঙ্কর একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, শোনবার কিংবা শোনাবার মত কিছু অবশ্য নয়—

ভনিতা ছাড়ুন। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার কিছুই নয়, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে উদরান্নের জন্যে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

পড়াশোনা ছেড়ে দিলেন কেন হঠাৎ?

খরচ জুটল না।

তার মানে?

শঙ্কর আর একটু হাসিয়া বলিল, তার মানে, ওই।

টাকার অভাবে আপনাকে পড়াশোনা বন্ধ করতে হ'ল—এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী নই। আপনি যে গরিবের ছেলে নন, তা আমি জানি।

বাবা বড়লোক তো আমার কি!

বেলা ভ্রূভঙ্গীসহকারে খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, আপনার এখন সময় আছে কি?

প্রচুর, কেন?

তা হ'লে আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমার বাসায়।

শঙ্কর বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, কেন বলুন তো?

এমনই একটু গল্প-সল্প করা যাবে। আজ একটু ছুটি পেয়ে গেছি।

চলুন।

১০

ভন্টুর বউদিদি বসিয়া বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন। রবিবারে আপিসের তাড়া নাই। ভন্টু অদূরে একটি মোড়ার উপর বসিয়া নাকে, কানে, নাভি-বিবরে, পায়ের আঙুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে তৈল-নিষেক করিয়া অতিশয় পরিপাটীরূপে সর্বাঙ্গে তৈলমর্দন করিতেছিল। এই একদিনে ভন্টু সাত দিনের মত তেল মাখিয়া লয়। সপ্তাহের বাকি ছয় দিন তেল মাখিবার অবসর থাকে না। কোনক্রমে মাথায় দুই ঘটি জল ঢালিয়া এবং নাকে-মুখে যা হোক কিছু গুঁজিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে আপিসে ছুটিতে হয়। এই রবিবার দিনই বেচারা প্রাণ ভরিয়া স্নানাহার করে। বউদিদিও রবিবারের দিন আহারের একটু বিশেষ রকম আয়োজন করিয়া থাকেন।

ভন্টু সশব্দে নাসারন্ধ্রে খানিকটা তেল টানিয়া লইয়া বলিল, বাকু কি ইটিং আপিস খুলেছেন?

তোমার আসবার আগেই বাবা খেয়ে নিয়েছেন। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি করছ কি, একেবারে আচার হয়ে গেলে যে!

ভন্‌টু কিছু না বলিয়া আবার খানিকটা তৈল নাসারন্ধ্রে সশব্দে টানিয়া লইল।

বউদিদি বলিলেন, ওই জন্তেই তো জামা-কাপড় তেল-চিটচিটে হয়ে যায়। সাবান দিলেও পরিষ্কার হতে চায় না।

অয়েলিশ অ্যাফেয়ারে বড় সুখ।

ভন্‌টু বাম তালুতে খানিকটা তৈল ঢালিয়া লইয়া গর্দানায় ঘষিতে লাগিল।

বউদিদি এক নজর সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন ও বলিলেন, তোমার আর কি, তোমাকে তো সাবান কাচতে হয় না, যাকে কাচতে হয় সে-ই বোঝে।

ভন্‌টু গর্দানায় তেল মালিশ করিতে করিতে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে বলিল, বড় সুখ।

বউদিদি আর কিছু না বলিয়া বড়ি দিতে লাগিলেন।

দুই-এক মিনিট নীরবতার পর ভন্‌টু বলিল, আজ কি কি রান্না করেছ বউদি?

আলুর দম, পটল-ভাজা, মাছের ঝোল, মাছের অম্বল, মুড়ো দিয়ে মুগডাল—

বাকুকে ওই সমস্ত খেতে দিয়েছ নাকি?

তা দিয়েছি বইকি।

ধীরেন ডাক্তার বলছিল, ওঁকে এখন ওসব গুরুপাক জিনিস খেতে না দেওয়াই ভাল। চোখের কোল ফুলেছে, কিডনি খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই।

ঘরে ভালমন্দ রান্না হ'লে ওঁকে না দিয়ে কি পারবার জো আছে?

একটু থামিয়া বউদিদি বলিলেন, এমনিতেই তো পান থেকে চুন খসলে তুলকালাম কাণ্ড। সেদিন রাত্রে পরোটায় সামান্য একটু ময়ান কম হয়েছিল, বললেন, এ পরোটা না পরেন্‌ঠা!

ভন্টুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আজকাল বাকু আর সে রকম করেন না, না বউদিদি ?

কি রকম ?

রাগ হ'লে 'ক্ষিদে নেই' ব'লে মশারি-টশারি ফেলে তার ভেতর ব'সে শ্রীমদ্ভাগবত পড়তে শুরু ক'রে দিতেন সেই যে!

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, না, অনেক দিন তো সে রকম করেন নি।

ভন্টু বাকুর ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, বাকু স্লিপিং আপিস খুলেছেন বোধ হয়। কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

হ্যাঁ, বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন।

ভন্টু উঠিয়া দাঁড়াইল, পেটে ও পিঠে তেল মাখিতে মাখিতে বলিল, আসল ব্যাপারের কতদূর কি সেট্‌ল্ করলে? বাকুর কাছে পেড়েছিলে কথাটা ?

না, নিবারণবাবুর টাকা তুমি ফেরত দাও।

কেন, দার্জি মেয়েটি তো মন্দ নয়। চমৎকার সেলাই-ফোঁড়াই জানে।

রঙ কি রকম ?

কালো, কিন্তু কুৎসিত নয়। অনেকটা কচি নিমপাতার মত, একটু লালচে আভা আছে।

বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন, রঙের জন্যে কিছু এসে যাচ্ছে না, আমার রঙই বা কি এমন ফরসা! কিন্তু যে বাড়িতে অমন কেলেঙ্কারি ঘটেছে, সে বাড়িতে বিয়ে করতে হবে না টাকার জন্যে। টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও।

টাকা তো গভীর গাড্ডায়।

গাড্ডায় মানে ?

করালীচরণকে দিয়ে এসেছি।

তোমাকে মানা করলুম, তবু তুমি দিয়ে এলে ? ওকে দুদিন পরে দিলেই

তো চলত। এইবার তো তোমার দাদা এসে কাজে জয়েন করবেন, দুজনে মিলে কিছুদিন পরেই না হয় শোধ ক'রে দিতে টাকাটা।

কেতুরাজ করালীচরণকে তুমি চেনো না, তাই কলায়ের ডালের বড়ি দিতে দিতে স্বচ্ছন্দে কথাগুলো বলতে পারলে। চিনলে সটান ঢোঁক গিলে যেতে, ও-কথা আর উচ্চারণ করতে না।

আহা!

দুই বগলে তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ভনুটু বলিল, চাম লদ করালী দ্রাবিড়ে লদ্‌কালদ্‌কি করতে যাচ্ছে, তাকে আটকায় কার সাধ্য!

তা হ'লে অন্য কোথা থেকে টাকা যোগাড় ক'রে নিবারণবাবুকে দিয়ে দাও। ও-বাড়ির মেয়ে ঘরে আনা চলবে না।

পাশের ঘর হইতে গদাম করিয়া একটা শব্দ হইল।

বউদিদি ভনুটুর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, কেউ ঘুমোয় নি, সব মটকা মেরে প'ড়ে আছে তোমার ভয়ে।

ভনুটু তেল মাখিতে মাখিতে আগাইয়া গেল ও জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, একটা পাশ-বালিশ মাটিতে পড়িয়াছে। ছেলেরা সকলে চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে, সকলেরই চোখ মিটমিট করিতেছে।

এই ফনুতি, বালিশ ফেললে কে?

ফনুতি ঘাড় ফিরাইয়া নাকী সুরে বলিল, দাদা আমাকে কাতুকুতু দিচ্ছে খালি।

শনুটু, বেত না খেলে পিঠ সুড়সুড় করছে, নয়?

শনুটু আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিল না, চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

পাশ-বালিশটা তুলে চুপ ক'রে শুয়ে থাক্ সব। ফের যদি কোন আওয়াজ শুনেছি তো পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আমি সকলের।

ফনুতি পাশ-বালিশটা তুলিয়া লইল এবং সকলে আর একবার নড়িয়া-চড়িয়া শুইল।

বউদিদি আবার তাগাদা দিলেন, তুমি এবার চান কর, আর কত বেলা করবে, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

তুমি ভাত বাড় না, আমার চান করতে কতক্ষণ যাবে?

তোমাকে যেন চিনি না আমি! দাঁত মাজতেই তো এক যুগ যাবে এখন।

ভনটু মুখ বিকৃত করিয়া বউদিদির মুখের পানে চাহিল।

আহারাদির পর ভনটু ছোট একটি হাত-আয়না এবং ছোট একটি কাঁচি লইয়া মোড়ার উপর বসিয়া গুম্ফসংস্কার করিতেছিল। বউদিদিও আহার সমাপন করিয়া ছেলেদের পাশেই একটু গড়াইয়া লইতেছিলেন। তাঁহার তন্দ্রার মধ্যেও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—স্বামী আসিয়াছেন, শরীর বেশ সারিয়া গিয়াছে, আর জ্বর হয় না, মুখের সে রুগ্ন ভাব আর নাই, গাল চিবুক বেশ ভারী হইয়াছে।

একটা মোটরের হর্নের শব্দে তাঁহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। বাড়ির সামনে একটা মোটর আসিয়া থামিয়াছে। ভনটু আয়না ও কাঁচি কুলুঙ্গিতে রাখিয়া সদর-দরজা খুলিয়া দেখিতে গেল, কাহার মোটর তাহার বাসার সামনে আসিয়া থামিল! দরজা খুলিয়া ভনটু বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার আপিসের বড়বাবু! কেরানীমহলের যিনি সর্বেসর্বা, স্বয়ং তিনিই আসিয়াছেন। ভনটুর আপিসের বড়বাবু বড়লোক। মোটা মাহিনা পান, তা ছাড়া ধনীর সন্তান। নিজের মোটর আছে। ভনটু সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

বড়বাবু মোটর হইতে অবতরণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, ভালই হ'ল, তুমিও এখন বাড়িতে আছ। তোমার বাবার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম।

হঠাৎ বাকুর সহিত বড়বাবু কেন আলাপ করিতে আসিলেন, তাহা বিস্মিত ভনটু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও মুখে সোচ্ছ্বাসে আহ্বান করিল।

আসুন আসুন, ভেতরেই আসুন।

তাহার পর একটু সঙ্কোচভরে বলিল, বাবা কানে একটু কম শোনেন, একটু জোরে জোরে কথা বলতে হবে।

আচ্ছা।

ভন্টু বড়বাবুকে লইয়া বাবুর ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বড়বাবু যখন চলিয়া গেলেন, তখন ভন্টু আরও বিস্মিত হইয়া গেল। এ যে স্বপ্নাতীত আবুহোসেনী কাণ্ড! বড়বাবু নিজের মেয়ের সহিত ভন্টুর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। বউদিদি উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

এখন স পাঁচ আনা পয়সা দাও দিকি।

কেন?

আমি মনে মনে হরির লুট মানসিক করেছিলাম, যাতে ওই নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হয়।

পাগল! উইন্টার ক্যাপিটাল অফ বেঙ্গল গভর্নরকে অগ্রাহ্য করা সোজা নাকি?

উইন্টার ক্যাপিটাল কি?

দার্জিলিং।

বউদিদি সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, ওখানে তোমার বিয়ে হতেই পারে না।

না না, ছি! অমন অসময়ে এক কথায় করকরে সাড়ে পাঁচশোটি টাকা গুনে দিলে, তা ছাড়া বৃশ্চিক রাশি, মকর লগ্ন, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছে, নিবারণকে এমনভাবে ল্যাডারিং করা কি ঠিক হবে?

ল্যাডারিং কথাটা ভন্টু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করিল।

বউদিদি মানে বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, তার মানে?

মানে, নিশ্চিন্ত নিবারণ গাছে উঠে মজাসে গোঁফে তা দিচ্ছে, এখন মইটা সরিয়ে নিলে লোকে বলবে কি?

লোকে যাই বলুক, ওখানে বিয়ে হবে না। আজই তুমি তাঁকে ব'লে

এল—বাড়ির কারও মত হচ্ছে না। কারও মত হবেও না। ও-কথা শুনলে বাকু, তোমার দাদা, কেউ রাজী হবেন না। সকলের অমতে তুমি বিয়ে করবে নাকি?

কিন্তু ফাইভ অ্যাণ্ড হাফ সেঞ্চুরির মহড়া সামলাব কি ক'রে? সেটা ভাবছ না কেন?

সে আবার কি?

বেশ থাসা আছ তুমি! সাড়ে পাঁচ শো টাকাটা তো স পাঁচ আনার সিন্নি দিলেই উবে যাবে না? আর আমাদের গুষ্টিশুদ্ধুকে ছাতু ক'রে ফেললেও পাঁচ টাকা বেরুবে কি না সন্দেহ। তোমার গয়নাগুলি তো বহু পূর্বেই বিক্রমপুর হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে উপায় কি সেইটে বল, সিন্নি নিয়ে লদকালেই তো চলবে না!

পণ হিসেবে বড়বাবু নিশ্চয় কিছু দেবেন, তার থেকেই দিয়ে দিও নিবারণবাবুকে।

বড়বাবু কত দেবে তার ঠিক কি? যে রকম গোঁফ আর জুলপি লোকটার, কিছুই বিশ্বাস নেই।

বাঃ, নিশ্চয়ই দিতে হবে। বাকুকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও না।

বাকু তোমাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে। বাকুকে শেখাবে তুমি!

বাকুও এই বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য আঁকুপাকু করিতেছিলেন। তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

কই গো বড়বউমা, এস না একবার এদিকে। ভন্টুর আপিসের বড়বাবুর প্রস্তাবটা বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। চা-ও চড়াও। চা খেতে খেতে বেশ জাঁকিয়ে বিবেচনা করা যাক, এস।

বউদিদি ভন্টুর দিকে চাহিয়া বাকুর পিছু পিছু ঘরে গিয়া ঢুকিলেন এবং তাঁহার কানে কানে কি বলিয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেন।

বাক্কুর কণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল—বলে, লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না।

বউদিদি চা চড়াইতে গেলেন।

ভন্টু পিছন হইতে তাঁহাকে ভ্যাঙাইতে লাগিল।

১১

অন্ধকার রাত্রি।

করালীচরণ বক্‌সির ঘরে মোমবাতির ম্লান আলোকে অন্ধকার ঘনতর হইয়া উঠিয়াছে। বোতলের মুখে গোঁজা যে মোমবাতিটি জ্বলিতেছে, তাহারও আয়ু নিঃশেষিতপ্রায়, আর বেশিক্ষণ টিকিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। বেশিক্ষণ টিকিবার আর প্রয়োজনও নাই। বক্‌সি মহাশয়ের গোছানো শেষ হইয়া গিয়াছে, এইবার তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন। মোমবাতির স্বল্পালোকে বক্‌সি মহাশয় নিবিষ্টচিত্তে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একখানি পত্র পড়িতেছিলেন। সমস্ত মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়নিবদ্ধ, চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। দ্রাবিড়ে যাইবার মুখে এ কি এক ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিল! পত্রের সহিত দলিল-গোছের কি একটা কাগজ ছিল। পত্রটি এবং দলিলখানি আদ্যোপান্ত পুনরায় পড়িয়া করালীচরণ সেগুলিকে লম্বা খামের ভিতর পুরিয়া ফেলিলেন। দ্রাবিড় হইতে ফিরিয়া তারপর যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। ভন্টুবাবু এখন তাড়াতাড়ি ফিরিলে যে বাঁচা যায়! ভন্টুকে তিনি কিছু মাল এবং টিকিট কিনিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রায় ঘণ্টা-দুই হইয়া গেল, এখনও ফিরিতেছে না কেন? অধীর করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, দ্বারপ্রান্তে ছায়ামূর্তির মত কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কে?

আমি।

ছায়ামূর্তি আগাইয়া আসিল, মোড়ের সেই পানওয়ালীটা। একমুখ হাসিয়া মিসি-লাগানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া পানওয়ালী বলিল, জিনিসপত্তর সব বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে আজ সকাল থেকে দেখছি, কোথাও যাওয়া হবে নাকি ঠাকুরের?

করালীচরণ কিছু না বলিয়া তাহার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকাইয়া রহিলেন, এই অযাত্রাটা ঠিক যাইবার সময় আসিয়া হাজির হইয়াছে!

আমি যেখানেই যাই না, তোর তাতে কি? দূর হ তুই এখান থেকে।

পানওয়ালী কিন্তু নড়িল না, স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।—আচ্ছা, আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন বল তো ঠাকুর? আমি তো তোমার ভাল ছাড়া মন্দ কোন দিন করি নি।

করালীচরণের চোখটা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গর্জন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তুই নড়বি কি না বল্ এখান থেকে?

পানওয়ালী তথাপি নড়িল না।

আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন, তা না বললে আমি যাব না।

হারামজাদী ছোটলোক বেশ্যা, তোর মুখদর্শন করলে যে পাপ হয়, তা তুই জানিস না? আবার কৈফিয়ৎ তলব করছেন!

পানওয়ালীর মুখের হাসিটা সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তথাপি সে সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য আর একটু হাসিয়া বলিল, ওমা, এইজন্যেই এত রাগ! আমি ভেবেছিলাম, বুঝি বা আর কিছু! মুখ দেখলে পাপ হয়, আর আমার কাছ থেকে সিগারেট পান নিলে বুঝি কিছু হয় না? ধন্যি শাস্তর তোমাদের!

দূর হ বলছি।

করালীচরণ তাড়া করিয়া গেলেন। পানওয়ালী অন্ধকারে অন্তর্ধান করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভন্টু আসিয়া পড়িল।—উঃ, বড্ড দেরি করলেন আপনি ভন্টুবাবু, সব জিনিসপত্তর পেয়েছেন তো?

হ্যাঁ।

ভন্টু দুই বোতল মদ, ছোট একটি কাচের গ্লাস, পাঁচ টিন সিগারেট, এক ডজন দেশলাই, দুই প্যাকেট মোমবাতি এবং টুকিটাকি আরও নানা রকম জিনিস টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

টিকিট করেন নি?

নিশ্চয়। এই যে, নিন না।

ভন্টু ভিতরের পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিল এবং তাহার ভিতর হইতে টিকিট ও বাকি টাকা বাহির করিয়া দিল।

করালীচরণ আলমারির মাথায় দাঁড়কাকের খাঁচাটা দেখাইয়া বলিলেন, আর ওটার?

ওটার সম্বন্ধে নানা বখেড়া। খাঁচার মাপ-জোক চাই, তা ছাড়া অনেক খরচ।

গভীর বিস্ময়ের সহিত করালীচরণ বলিলেন, খরচ ব'লে কি এতদিনের সঙ্গীটাকে এখানে ফেলে রেখে যাব নাকি? কে খেতে দেবে ওকে?

ভন্টু বলিল, সে ভার না হয় আমি নিচ্ছি; আপনি বিদেশে যাচ্ছেন, কোথায় ওই ঝামেলা নিয়ে ঘুরবেন? তার চেয়ে ওকে এখানে রেখে যান, আমিই দেখাশোনা করব বরং।

আপনি ঠিক দেখাশোনা করতে পারবেন তো?

ঠিক পারব।

দেখুন—

বলছি, ঠিক পারব।

তা হ'লে গোটা-বিশেক টাকা রেখে দিন আপনি। ওকে মাছ মাংস ছাতু দেবেন রোজ। আমও বেশ খায়। দেখবেন, যেন কষ্ট না পায়। আপনি ভার নিচ্ছেন ব'লেই ভরসা ক'রে রেখে যাচ্ছি।

টাকার দরকার নেই, আমি সব ব্যবস্থা করব এখন।

না না, টাকাটা রাখুন, টাকাই হচ্ছে পেয়াদা, ওই তাগাদা দেবে আপনাকে। বাই নারায়ণ! বিনা টাকায় কিছু হবার জো আছে আজকাল!

ভন্‌টুকে টাকা লইতে হইল।

এবার চলুন, স্টেশনে যাওয়া যাক তা হ'লে। ট্রেনের আর দেরি কত?

ঘণ্টাখানেক আছে আর।

মাত্র ঘণ্টাখানেক? চলুন, চলুন, আর দেরি নয়, ট্যাক্সি ডাকুন আপনি।

ভন্‌টু ট্যাক্সি ডাকিতে বাহির হইয়া গেল।

করালীচরণ পুনরায় লম্বা খামটা হইতে চিঠি ও দলিলটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং আবার সমস্ত আদ্যোপান্ত পড়িয়া স্বগতোক্তি করিলেন, বাই নারায়ণ! এবং পুনরায় সেগুলি খামে পুরিয়া আলমারির ভিতর রাখিয়া দিলেন।

ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল।

ঘণ্টা দুই পরে ভন্‌টু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে পানওয়ালী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভন্‌টু পানওয়ালীকে চিনিত। বাইক হইতে অবতরণ করিয়া বলিল, ভালই হ'ল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কেন বলুন তো?

বক্‌সিমশায়ের ঘর-দোরের কি ব্যবস্থা করা যায়, তাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। উনি আমার ওপরই সব ভার দিয়ে গেলেন। তুমি পারবে দেখাশোনা করতে?

কি করতে হবে বলুন?

এই ঝাঁট-পাট দেওয়া আর কি, বক্‌সিমশায়ের একটা কাগ আছে, সেটাকেও খেতে-টেতে দিতে হবে। পারবে তুমি?

পারব।

তা হ'লে এই টাকা একটা রাখ, মাছ মাংস ছাতু আম যা দরকার কিনে দিও।

টাকার দরকার নেই।

বক্‌সিমশায় দিয়ে গেছেন যে।

আপনাকে দিয়ে গেছেন, আমাকে তো আর দেন নি। আপনি কেবল একটি উবগার করবেন।

বিস্মিত ভন্টু বলিল, কি?

ওঁকে জানাবেন না যে, ওঁর ঘরের ভার আপনি আমাকে দিয়েছেন।

অধিকতর বিস্মিত হইয়া ভন্টু বলিল, কেন?

মিসি-মণ্ডিত দন্তপাতি বিকশিত করিয়া পানওয়ালী উত্তর দিল, আমি ওঁর চুচক্ষের বিষ ছিলুম।

ভন্টু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

পানওয়ালী পুনরায় হাসিয়া বলিল, দিন, চাবি দিন। ওঁকে জানাবেন না কিন্তু।

জানাব কি ক'রে, ওঁর ঠিকানাই জানি না।

আচ্ছা, উনি কোথায় গেলেন বলুন তো?

দ্রাবিড়ে।

সে আবার কোথা? সেখানে কেন?

পড়তে।

প'ড়ে প'ড়েই সারা হ'ল। দিবারাত্রি আর কোন কাজ নেই।

পানওয়ালী মুচকি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, মানুষে এত পড়ে কেন বলুন তো? যত পড়ে, ততই তো মাথা গোলমাল হয়ে যায় দেখছি।

ভন্টু সহসা অনুভব করিল, 'নাই' পাইয়া মাগী বোধ হয় লদ্‌কালদ্‌কিতে ঢুকিবার চেষ্টায় আছে। গম্ভীরভাবে বলিল, লেখাপড়ার মর্ম সবাই বুঝলে আর ভাবনা ছিল কি?

ইনি খুব বিদ্বান, না?

লদ্‌কালদ্‌কি ঘনীভূত হইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ভন্টু এ কথার জবাব দিল না। বলিল, চাবিটা রাখ তা হ'লে। কাগটাকে খেতে-টেতে দিও। কাল আবার আসব আমি।

সে বাইকে সওয়ার হইল।

চাবিটা হাতে করিয়া অন্ধকার গলিতে পানওয়ালী করালীচরণের রুদ্ধ-দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রে ঘরটা খুলিতে তাহার সাহস হইল না।

১২

মৃন্ময় গঙ্গার ধারে একা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নিজেকে নিতান্ত একা মনে হইতেছিল। এই সেদিন পর্যন্ত তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না, এখন অখণ্ড অবসর। নিমেষের মধ্যে সমস্ত যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। চিন্ময়টা গোপনে গোপনে এত কাণ্ড করিতেছিল! বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। সহসা মৃন্ময়ের স্বর্ণলতাকে মনে পড়িল। তাহাকে অন্বেষণ করিবার জন্যই তো সে পুলিসের চাকুরি লইয়াছিল। অন্বেষণ তো করা হয় নাই, চাকরিটাই বড় হইয়া উঠিয়াছিল। চোর, জুয়াচোর, খুনে, জালিয়াৎ—ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে, স্বর্ণলতাকে অন্বেষণ করিবার সে অবসর পাইল কই? প্রথম প্রথম প্রত্যহই তাহার মনে হইত, হাতের কাজটা শেষ করিয়া স্বর্ণলতার খোঁজ করিবে, কিন্তু হাতের কাজ কোন দিনই শেষ হয় নাই। শেষে স্বর্ণলতার কথা তাহার মনেও পড়িত না। মানুষ কত সহজে ভোলে! দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক দাবি এত প্রবল, এত অনিবার্য এবং এত সর্বগ্রাসী যে, অতীতকে স্মৃতিপথে জাগরূক রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাহারা নিকটে রহিয়াছে, যাহাদের সর্বদা দেখিতেছি, তাহাদেরই সকলকে সর্বতোভাবে মনে স্থান দেওয়া সম্ভবপর নয়। সচেতন মনের পরিসর বড় ক্ষুদ্র, সমভাবে সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সেখানে অসম্ভব। স্বর্ণলতার মুখখানা মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল, সেই নিটোল গৌর মুখখানি, প্রদীপ্ত কালো চোখ দুইটি, অধরে অর্ধবিকশিত মৃদু হাসি। নিমীলিত নয়নে মৃন্ময় স্বর্ণলতার মানসমূর্তির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার

মনে হইল, স্বর্ণলতা যেন মৃদুগুঞ্জনে বলিতেছে, আমাকে খোঁজ নাই বলিয়াই তোমার এই শাস্তি। আমাকে খুঁজিবার জন্যই বিবাহ করিয়া পুলিসে চাকুরি লইয়াছিলে, কিন্তু হাসি এবং চাকরি—ইহারাই তোমাকে ভাগ করিয়া লইয়াছিল, আমার জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। এত প্রবঞ্চনা সহিবে কেন? সহসা একটা গানের সুর ও হাসির হল্লা গঙ্গাবক্ষ হইতে ভাসিয়া আসিল। মৃন্ময় চাহিয়া দেখিল, একদল লোক নৌকা-বিহার করিতেছে, সঙ্গে একজন গায়িকা। হারমোনিয়ম ও ডুগি-তবলা সংযোগে গান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

একটু তফাতে একজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি, ছোকরা একেবারে ব'খে গেল! দেখুন দিকি কাণ্ডখানা, ছি ছি ছি!

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, আপনি চেনেন নাকি?

চিনি না! আমাদেরই পাড়ার রাসু দত্তের মেজ ছেলে বিশু দত্ত। সোনাগাছিতে আজকাল কাপ্তেনি ক'রে বেড়াচ্ছে। দেখুন দিকি কাণ্ডখানা ছোকরার!

বিশু দত্ত নামটা মৃন্ময়ের চেনা চেনা ঠেকিল। চাকুরিচ্যুত না হইলে এখনই আর একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া মৃন্ময় বিশু দত্তের অনুসরণ করিত। একটা চুরির তদন্ত করিতে করিতে বিশু দত্তের নামটা মৃন্ময়ের কর্ণগোচর হয়। বিশু দত্ত নাকি নিজের সুন্দরী রক্ষিতাকে টোপস্বরূপ ব্যবহার করিয়া বড় বড় লোককে আকৃষ্ট করে এবং তাহাদিগকে নানাভাবে বেকায়দায় ফেলিয়া তাহাদের আংটি, ঘড়ি, টাকা প্রভৃতি অপহরণ করে। ঠিক নিজ হস্তে করে না, তাহার রক্ষিতাই নাকি তাহার নির্দেশ অনুসারে অপহরণ করে। মৃন্ময়ের মনে পড়িল, কিছুদিন পূর্বে এক শূন্য নাচের আসর হইতে পুলিস কর্তৃক সংগৃহীত একটি নর্তকীর পদাঙ্ক লইয়া সে বহু মাথা ঘামাইয়াছিল। উক্ত নর্তকীই নাকি বিশু দত্তের চতুরা প্রণয়িনী, মদ-বিহ্বল এক মাড়োয়ারী-সন্তানের বহুমূল্য একটি হীরক অঙ্গুরীয় অপহরণ করিয়াছিল। মাড়োয়ারীর বন্ধুবর্গ পুলিসে খবর দেন, পুলিস আসিয়া তাহাকে ধরিতে পারে নাই, নর্তকীর

পদার্থটি কেবল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। মৃন্ময়ের মনে পড়িল, তাহার বন্ধু মিস্টার মজুমদার এখনও হয়তো ব্যাপারটা লইয়া তদন্ত করিতেছেন। আর কিছুদিন পূর্বে হইলে নৌকাবিহারী বিশু দত্তের সন্ধান পাইয়া মৃন্ময় উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন কিন্তু সমস্তই নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। সে অসাড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্বর্ণলতার মুখচ্ছবি মন হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল। মৃন্ময় একমনে বসিয়া গান শুনিতে লাগিল।

১৩

বেলা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না, না শঙ্করবাবু?

কি ক'রে বুঝলেন আপনি?

কি ক'রে, তা বলতে পারব না, কিন্তু ঠিক কি না বলুন? এই নিন, বড় কাপটাই আপনি নিন, এই নিয়ে তিন কাপ হ'ল কিন্তু।

তা হোক। খেতে তো আজ দেরি হবে, কত রাত্তির হবে বলুন দেখি?

এগারোটার কম নয়। একা হাতে সব করতে হবে তো!

আপনার কজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছেন?

বেশি নয়, একজন।

তারপর একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আপনিও চেনেন তাকে।

কে?

চুনচুন।

শঙ্কর বিস্মিত হইল।

আমি যে চুনচুনকে জানি, তা আপনাকে কে বললে?

বেলা স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমি সব জানি।

সব জানেন, মানে? আর কি জানেন?

আপনি ওর স্বামীর মৃত্যুকালে শুশ্রূষা করেছিলেন এবং আপনার দশ টাকা যা পাওনা হয়েছিল তা আপনি নেন নি।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইল।

এত খবর আপনি পেলেন কোথা থেকে?

চুনচুনের কাছ থেকেই।

দুই-এক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া বেলা বলিলেন, আপনার ন্যায্য পাওনা দশ টাকা আপনি নিলেন না কেন?

এমনিই।

এমনিই? নিছক এমনিই?

বেলা দেবী ফিক করিয়া হাসিয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, কেন নেন নি, তাও আমি জানি।

কি বলুন তো?

বলব না। ইকমিকের আঁচটা ঠিক আছে কি না দেখে আসি। একটু বসুন আপনি।

বেলা পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

বেলার আগ্রহাতিশয্যে শঙ্কর মেসের বাসা উঠাইয়া দিয়া বেলার বাসাতেই আসিয়া বাস করিতেছে। দৃষ্টিকটু হইবে বলিয়া শঙ্কর প্রথমে আসিতে চাহে নাই। কিন্তু বেলা কিছুতেই শোনেন নাই। তাঁহার যুক্তি—লোকে কি বলিবে, না বলিবে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে শুরু করিলে মাথাই ঘামিয়া সারা হইয়া যাইবে, আর কিছুই হইবে না। শঙ্কর একদা বিপন্ন বেলাকে আশ্রয় দিয়াছিল, এখন ঘটনাচক্রে শঙ্কর বিপন্ন হইয়াছে, বেলার কি উচিত নয় এখন তাহাকে দুই-চারি দিনের জন্যও আশ্রয় দেওয়া এবং বেলার যখন সে সুবিধা রহিয়াছে? বেলার আর একটা কথাও শঙ্করের মনে পড়িল, সমাজের নিষ্কর্মাদের দিকটাও তো দেখতে হবে। পরের আচরণের সমালোচনা ক'রেই বেচারারা সময় কাটায়। ওই তাদের মানসিক রোমন্থনের একমাত্র জাবর, তার থেকে

তাদের বঞ্চিত করাটা কি উচিত? আমার তো মনে হয়, ওদের মুখ চেয়েই মাঝে মাঝে দৃষ্টিকটু আচরণ করা কর্তব্য।

একরূপ জোর করিয়াই বেলা শঙ্করকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন। শঙ্কর আসিয়াছে বটে, কিন্তু স্বস্তি পাইতেছে না। বেলার উপার্জনে ভাগ বসাইতে তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিতেছে। কিন্তু এ কথাও সে মনে মনে বারম্বার স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না যে, ভাগ্যে বেলার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল, না হইলে সে কি মুশকিলেই পড়িত! টুইশনি ছাড়িয়া দেওয়াতে প্রফেসর গুপ্ত একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রফেসর গুপ্তের কথাগুলি তাহার কানে বাজিতেছে—আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে বনে যাও। কলকাতা শহরে বাবুয়ানি ক'রে থাকবে, অথচ আত্মসম্মানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলে সইতে পারবে না, তা হয় না। তা ছাড়া, অমন সজারুর মত বিবেক নিয়ে কোথাও কিছু করতে পারবে না তুমি, আজীবন কেবল কষ্ট ভোগ করবে। স্থানকালের উপযোগী নতুন বিবেক তৈরি ক'রে নাও।

সুতরাং টুইশনির জন্য প্রফেসর গুপ্তের নিকট পুনরায় আর যাওয়া চলে না। কিন্তু বেলার কাছেই বা আর কতদিন থাকা চলিবে? কিন্তু বেলা অবশ্য বার বার বলিতেছে যে, যতদিন না একটা কাজ হয় ততদিন আপনি আমার বাসায় থাকুন। কিন্তু তাহা শঙ্কর পারিবে না। অবিলম্বে যেমন করিয়া হউক তাহাকে বেলার বাসা ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু যে বেলার উপার্জনে ভাগ বসাইতে তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিতেছে তাহা নয়, অন্তর-গুহা-নিবাসী পশুটা বারম্বার প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। শঙ্কর যদিও ইহা সুনিশ্চিত ভাবেই জানে যে, প্রলুব্ধ পশুর কবলে পড়িয়া বিক্ষত হইবার সম্ভাবনা আর যাহারই থাক্, বেলার নাই। বিধিদত্ত এক অদ্ভুত বর্মে তিনি আবৃত। আক্রমণ করিলে পশুটাই ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিবে, বেলার কিছু হইবে না। সমস্ত জানিয়াও কিন্তু পশুটা প্রলুব্ধ হয়, বরং বেশি করিয়া হয়। সুতরাং এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া হইতে যত শীঘ্র অপসৃত হইয়া পড়িতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। কিন্তু অপসৃত হইবার

কোন পথই শঙ্কর দেখিতে পাইতেছে না। কোথায় যাইবে? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে? তাহাই বা কয়দিন সম্ভব? তাহার বর্তমান তমসাচ্ছন্ন জীবনে বেলা মল্লিকই এখন একমাত্র আলো, যাহার সাহায্যে সে অন্তত খানিকটা পথ অতিবাহন করিতে পারে। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এই যে, বেলা মল্লিক শুধু আলো নয়, শিখাও। একটু অসাবধান হইলেই তাহা দহন করে, এবং সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও মন অসাবধান হইবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া উঠে। মাত্র কয়েকদিন বেলা মল্লিকের সহিত আলাপ করিয়া শঙ্কর ইহা মনে প্রাণে বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই পলাইবার পথ খুঁজিতেছে। বেলা আশ্রয় দিয়াছেন, কিন্তু প্রশ্রয় দিবেন না। হাসিতে হাসিতে যে কথাগুলি বেলা আজ সকালে বলিয়াছিলেন, তাহা শঙ্করের মনে পড়িল। শঙ্কর বেলাকে বলিয়াছিল, আর কিন্তু ভাল দেখাচ্ছে না মিস মল্লিক, একটা বিয়ে করুন।

আমি তো এক্ষুনি রাজী, কিন্তু পাত্র কই?

কি রকম পাত্র চাই আপনার?

গোটা এবং সুস্বাদু।

তার মানে?

তার মানে—সুস্বাদু পেয়ারা হ'লেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সেটা গোটা হওয়া চাই। তার আধখানা আর একজন কামড়ে খেয়ে গেছে, সে রকম জিনিস আমার চাই না। কারও উচ্ছিষ্ট জিনিস ছুঁতেও আমার ঘেন্না করে। তাই ব'লে গোটা নিম, গোটা মাকাল বা গোটা কুমড়োর প্রতিও লোভ নেই আমার।

সে রকম পাত্রের অভাব কি?

বেলা নাসাকুঞ্চিত করিয়া ওষ্ঠভঙ্গীসহকারে উত্তর দিয়াছিলেন, সব এঁটো।

কটা লোক দেখেছেন আপনি?

যে কটা দেখেছি, তাই যথেষ্ট। হাঁড়ির ভাত একটা ছুটো টিপলেই

বোঝা যায়, বাকিগুলোর অবস্থা কি রকম। দেশসুদ্ধ ব্যাটাছেলে হয় হাঁদা, না হয় এঁটো।

হাসিতে হাসিতে প্রসঙ্গটা উঠিয়াছিল এবং হাসিতে হাসিতে তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু হাসির অন্তরালবর্তী সত্যটা শঙ্কর উপলব্ধি না করিয়া পারে নাই।

ইক্‌মিকের তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া বেলা দেবী ফিরিয়া আসিলেন।

বড্ড দেরি হয়ে গেল, নয়? বেগুনগুলো পোড়ালাম, বিরিঞ্চি করব।

এত রকম রান্না আপনি শিখলেন কোথা থেকে?

'পাকপ্রণালী' থেকে।

চুন্‌চুনকে নেমন্তন্ন করেছেন যখন, তখন সব নিরামিষ রান্না করেছেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, চুন্‌চুনের জন্যে ভারি দুঃখ হয় আমার।

বেলা দেবী মুচকি হাসিয়া বলিলেন, সাবধান, দুঃখ হওয়াটাই কিন্তু প্রথম ধাপ।

তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, আমার বরং রাগ হয়। মনে হয়, বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনই ফল।

কেন?

ও-রকম বোকার মত লুকিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিল ব'লে।

বাঃ, ভালবেসেছিল, বিয়ে করবে না?

ভালবাসলেই তাকে বিয়ে করতে হবে? বেশ তো যুক্তি আপনার! সত্যি সত্যি যাকে ভালবাসা যায়, তাকে বিয়ে না করাই বরং ভাল, ভালবাসাটা ঘষা পয়সার মত হয়ে যায় না।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আপনি থামুন তো, এসব ব্যাপারে আপনার নিজের যখন কোন অভিজ্ঞতাই নেই, তখন এ বিষয়ে আপনার কোন কথাই শুনতে প্রস্তুত নই আমি। ওসব কেতাবী কথা আমিও জানি।

অভিজ্ঞতা নেই, আপনি জানলেন কি ক'রে ?

আমি জানি।

কিছু জানেন না। কিংবা জেনেও না-জানার ভান করছেন।

উত্তরে উভয়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্কর বলিল, অর্থাৎ, আপনি বলতে চান, আপনি কাউকে ভালবেসেছেন, অথচ তাকে পাবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠেন নি ?

আকুল হয়ে উঠলেও দমন করেছি সে আকুলতা। আমার আকুলতা আমার আত্মসম্মানজ্ঞান আচ্ছন্ন করতে পারে নি কখনও, পারবেও না।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, যে ভালবাসা আত্মসম্মানজ্ঞানকে বিপর্যস্ত ক'রে দিতে না পারে, সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়।

আপনি পুরুষের দিক দিয়ে ভাবছেন, আমি বলছি ভদ্র মেয়ের মনোভাব।

আলোচনা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হইত, কিন্তু দ্বারের বাহিরে একটা মোটর থামিবার শব্দ হওয়াতে আর হইল না।

বেলা দেবী উঠিয়া পড়িলেন।

সায়েবের ওখান থেকে মোটর এল। আপনি বসুন, আমি চট ক'রে ঘুরে আসছি এক্ষুনি।

আজ না গেলে কি হয় ?

আর কিছু না, কিছুই বলবেন না ; কিন্তু বড় কষ্ট পাবেন। এত অসহায় যদি দেখেন তাঁকে—। আমি যাব আর আসব।

সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছে তা হ'লে বলুন।

হ্যাঁ, ঠিক মা আর ছেলের মত।

হাসিয়া বেলা পাশের ঘরে বেশ পরিবর্তন করিতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি ততক্ষণ 'ওল্‌ড্‌ কিউরিয়সিটি শপ'-খানা পড়ুন। আমি বেশি দেরি করব না। আর ইতিমধ্যে যদি টুনটুন এসে পড়ে, তা হ'লে তো ভালই হবে।

মুচকি হাসিয়া বেলা চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া 'ওল্‌ড্‌ কিউরিয়সিটি শপ'-খানার পাতা উল্টাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মানসপটে চুন্‌চুনের মুখখানা ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। চুন্‌চুনের কালো চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত আলোকিত করিয়া দিল।

১৪

সাড়ে পাঁচ শত টাকার নোটগুলি সযত্নে ভিতরের পকেটে রাখিয়া ভন্‌টু নিবারণবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কি করিয়া নিবারণবাবুকে কথাটা বলিবে, তাহা সহসা তাহার মাথায় আসিল না। বেচারা তাহার সহিত দার্জির বিবাহ দিবেন বলিয়া কত আশা করিয়া বসিয়া আছেন! সহসা এমন করিয়া তাঁহার আশাভঙ্গ করিতে হইবে! নিবারণবাবুর আশাভঙ্গ করিতে ভন্‌টুর হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল তাহা নয়, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা জিনিস আছে তো! তা ছাড়া, লোকটা দাগী লোক, একবার একটা গুরুতর ঘা খাইয়াছেন। অকারণে আবার একটা আঘাত করা সত্যিই অন্যায় হইবে। কিন্তু আঘাত না করিয়া ভন্‌টুর উপায়ও নাই। যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, তাহাই সত্য হইতে চলিয়াছে। আরব্য উপন্যাসের খামখেয়ালী বাদশাহ হারুন-অল-রশীদের প্রেতাত্মাই সম্ভবত জুলফি-দার বড়বাবুর স্কন্ধে ভর করিয়াছে। তিনি ভন্‌টুকে জামাই না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। ইহার জন্য যত অর্থ লাগে, তাহা তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত। এতদিন ধরিয়া তিনি ভন্‌টুর গতিবিধি, চরিত্রবল, কর্মতৎপরতা, কর্তব্যবোধ—সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এবং এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, কোনরূপ বাধাকেই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে চান না। বাধার যতগুলি ঐরাবত ভন্‌টু খাড়া করিয়াছিল, জুলফি-দারের উৎসাহস্রোতে সমস্তগুলিই ভাসিয়া

গিয়াছে। বিবাহ-সম্পর্কে ভন্টুর সঙ্গত অসঙ্গত যতগুলি দাবি ছিল, সমস্তই তিনি মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত। অসঙ্গত দাবিগুলি শুনিয়া জুলফি-দার বরং অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এগুলির দ্বারা ভন্টুর চরিত্রের মহত্তর দিকটাই নাকি তাঁহার নিকট আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। ভন্টু বড়বাবুকে বলিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার কন্যাকে যত টাকার অলঙ্কার দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে টাকার দ্বারা যেন ঠিক এক ধরনের দুই সেট গহনা গড়ানো হয়। কারণ বড়লোকের মেয়ে এক-গা গহনা পরিয়া আসিবে এবং তাহার বউদিদি—গুড ওল্ড্ বিড্ডিকার—নিরাভরণা হইয়া থাকিবেন, ইহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। সংসারের জন্যই বউদিদির গহনাগুলি একে একে গিয়াছে, বউদিদির গহনা আগে না হইলে সে কোন ক্রমেই পূর্ণালঙ্কৃতা বধূ ঘরে আনিতে পারিবে না। বড়বাবু এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইয়াছেন। ভন্টুর দ্বিতীয় প্রস্তাব—বিবাহরূপ দায়িত্ব লইবার পূর্বে সে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা লাইফ ইন্সিওরেন্স্ করিতে চায়, কিন্তু এখন তাহার যাহা বেতন, তাহার দ্বারা সে প্রিমিয়ম চালাইতে পারিবে না। বড়বাবু প্রিমিয়ম চালাইতে রাজী হইয়াছেন। বড়বাবুর ভাষায়—মানি ইজ নো কোশ্চেন—তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার জন্য একটি সৎপাত্র চান। তিনি ইচ্ছা করিলে মেয়েকে বড়লোকের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন; মেয়েটি সুশ্রী, তাঁহার টাকাও আছে। কিন্তু তিনি বড়লোকের ঘরের বয়াটে অকর্মণ্য পাত্রের হাতে মেয়েকে দিতে চান না। তিনি চান গরিবের ঘরের সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, কর্মঠ একটি যুবক এবং ভন্টুর মধ্যে তাহা তিনি পাইয়াছেন। টাকার জন্য তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না।

আপিসের বড়বাবু শ্বশুর হইলে অনিবার্যভাবে চাকরিরও উন্নতি হইবে। তাহার প্রমোশনের জন্য বড়বাবু ইতিমধ্যে রেকমেণ্ড করিয়াছেন। মেয়েটিও দেখিতে ভাল, কুষ্ঠিতেও নাকি রাজ-যোটক হইয়াছে। এতগুলি প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিবারণবাবুর কালো মেয়েকে বিবাহ করিবে এতবড় আদর্শবাদী ভন্টু নয়। নিজের সুবিধার জন্যই সে দার্জিকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল, এখন অধিকতর সুবিধার খাতিরে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে

মোটেই কুণ্ঠিত নয়। বড়বাবুকে নিবারণবাবু-ঘটিত সমস্ত কথা খুলিয়া বলায় বড়বাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে নগদ সাড়ে পাঁচ শত টাকা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন টাকাটা অবিলম্বে নিবারণবাবুকে ফেরত দিয়া আসিতে। কথাটা বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। একটা অজুহাত তো খাড়া করিতে হইবে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভন্টু শেষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, আজই সে নিবারণবাবুকে টাকাটা দিবে না। আজ দার্জির কুষ্ঠিটা চাহিয়া আনিবে এবং পরদিন গিয়া বলিবে যে, কুষ্ঠির মিল হইল না। সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙিবে না। তাহার পর টাকাটা ফেরত দিলে দেখিতে শুনিতে সব দিক দিয়াই ভদ্র হইবে। সব ক্ষেত্রে সরল সত্য কথা বলিলে কি চলে?

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল কিন্তু অন্য প্রকারে এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে। ভন্টু যখন নিবারণবাবুর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল, তখন নিবারণবাবু বাড়িতে ছিলেন না। দার্জিই সসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিল এবং বাহিরের ঘরটা খুলিয়া ভন্টুকে বসিতে বলিল। ভন্টু দার্জিকে সামনাসামনি দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তাহার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। দার্জি অবশ্য বেশিক্ষণ দাঁড়াইল না, বাহিরের ঘরটা খুলিয়া দিয়াই চলিয়া গেল। ভন্টু বসিয়া রহিল। পাশের বাড়ির ছাদে একজন প্রৌঢ়া বিধবা বড়ি দিতেছিলেন এবং আপন মনেই কাহার উদ্দেশ্যে কি যেন বলিতেছিলেন, ভন্টু অন্যমনস্ক হইয়া তাহাই শুনিতেছিল। দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শুনিয়া ভন্টু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দার্জি সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কি?

যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা বলব।

কি বল?

দার্জি কিছুক্ষণ আনতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমার ইচ্ছে নয় যে, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।

এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে ভন্টু কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল,

কয়েক মুহূর্ত তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিস্মিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, ইচ্ছে নেই কেন?

দুই চক্ষুর দৃষ্টি ভন্টুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া দার্জি মৃদু কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আপনি আমাকে বিয়ে করছেন খালি টাকার জন্যে।

ভন্টু নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দার্জিই পুনরায় বলিল, তা ছাড়া আমি ভিন্ন বাবাকে দেখবার এখন কেউ নেই। আপনি দয়া ক'রে ভেঙে দিন বিয়েটা। আমি এখন বিয়ে করতে পারব না।

আর কিছু না বলিয়া দার্জি ভিতরে চলিয়া গেল।

ভন্টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ রকম ঘটনা যে বঙ্গদেশে ঘটিতে পারে, তাহা ভন্টুর কল্পনাতীত ছিল। একটু পরেই নিবারণবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি আসিতেই ভন্টু উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অসঙ্কোচে তাঁহার হাতে টাকাগুলি দিয়া বলিল, মাপ করবেন নিবারণবাবু, বাবা বউদি—কেউ মত দিচ্ছেন না।

নিবারণবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন।

সে কি? মানে—

কিছুতেই মত হচ্ছে না, কি করি বলুন?

আমি একবার গিয়ে যদি—

না, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

নোটের তাড়া হাতে করিয়া নিবারণবাবু বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১৫

মুকুজ্জেমশাই নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে একটি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া তিনি মৃন্ময়

এবং শঙ্করের জন্য চাকরির চেষ্টা করিতেছিলেন। একরূপ জোর করিয়াই তিনি হাসিকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া মৃন্ময়কে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। শঙ্করের কিন্তু কোন সন্ধানই তিনি পাইতেছিলেন না। শিরীষবাবু তাহাকে যে ঠিকানা দিয়াছিলেন, তাহা একটি মেসের ঠিকানা। মুকুজ্জেমশাই সেখানে গিয়া শঙ্করের দেখা পান নাই; কয়েক দিন পূর্বেই নাকি শঙ্কর সে বাসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। হয়তো শঙ্কর শিরীষবাবুকে তাহার নূতন ঠিকানা জানাইয়াছে—এই আশায় মুকুজ্জেমশাই শিরীষবাবুকে পুনরায় পত্র দিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত জবাব আসে নাই। মৃন্ময়কে লইয়া পরিচিত অপরিচিত নানা ব্যক্তির ও আপিসের দ্বারে মুকুজ্জেমশাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অমিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে মুকুজ্জেমশাই যেমন একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, এই চাকুরি অনুসন্ধানেও তিনি ঠিক তাহাই করিতেছেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইংরেজী বাংলা কয়েকখানি দৈনিক পত্রিকা কেনা হয়। মৃন্ময় অথবা শঙ্করের উপযুক্ত যেখানে যত কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখেন সর্বত্রই একটি করিয়া দরখাস্ত পেশ করিয়া দেন। কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় থাকিলে নিজে গিয়া অথবা মৃন্ময়কে পাঠাইয়া তদ্বির করেন। এ পর্যন্ত তিনি কুড়ি জায়গায় দরখাস্ত করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, কিন্তু দমেন নাই। মৃন্ময় দমিয়া গেলে হাসিয়া বলিয়াছেন, ছেলেবেলার সেই কবিতাটা ভুলে গেলে—'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ, উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ'? দ'মে গেলে চলবে কেন? চেষ্টা থাকলে ঠিক একটা না একটা কিছু লেগে যাবেই, দেখ না তুমি।—বলেন আর হাসেন। মৃন্ময় লজ্জিত হইয়া পড়ে।

সেদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে মৃন্ময় বাসায় একা ছিল। মুকুজ্জেমশাই একবিংশ দরখাস্তটির তদ্বির করিতে স্বয়ং বাহির হইয়াছিলেন। মৃন্ময় একা শুইয়া শুইয়া নিজের ছন্নছাড়া জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। বাল্যকালে পিতা-মাতা মারা গিয়াছেন, দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের যৎসামান্য সাহায্যে এবং প্রাইভেট

টুইশনি করিয়া বহুকষ্টে সে এম. এ. পাস করিয়াছে। নিজে পছন্দ করিয়া স্বর্ণলতাকে বিবাহ করিয়াছিল এবং এই বিবাহের জন্যই দূর-সম্পর্কের সেই আত্মীয়টির সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘটে। আত্মীয়টির ইচ্ছা ছিল, বিবাহ-বাজারে মৃন্ময়কে বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জন করিবেন। কিন্তু আদর্শবাদী মৃন্ময় তাহা ঘটিতে দেয় নাই। সে নিজে পছন্দ করিয়া দরিদ্রের কন্যা স্বর্ণলতাকে বিনাপণে বিবাহ করিয়াছিল এবং অনেক আশা করিয়া এই কলিকাতা শহরেই তাহার ক্ষুদ্র সংসারটি পাতিয়াছিল। অতিশয় আকস্মিক-ভাবে তাহার সে সংসার ছারখার হইয়া গেল। মনের আবেগে তখন মূর্খের মতন সে কি অদ্ভুত কাণ্ডটাই করিয়া বসিল! স্বর্ণলতাকে খুঁজিবার জন্য পুনরায় বিবাহ করিয়া পুলিসে চাকরি লইল। একবার ভাবিল না যে, পুনরায় বিবাহ করা মানেই—স্বর্ণলতাকে অপমান করা, তাহার স্মৃতির সম্মুখে একটা যবনিকা টাঙাইয়া দেওয়া। স্বর্ণলতার সদ্যবিরহে সে ভাবিয়াছিল যে, হাসিকে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু উন্মেষিত-যৌবনা অনুরাগিণী পত্নীর সুনিবিড় সান্নিধ্যকে ঔদাসীন্যভরে পাশ কাটাইয়া যাওয়া কি এতই সহজ! তিলে তিলে ক্ষণে ক্ষণে অনিবার্যভাবে হাসি মৃন্ময়ের মনে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। স্বর্ণলতার কথা এখন জোর করিয়া মনে করিতে হয়। তাহার স্মৃতিকে সজীব রাখিবার জন্য প্রথম প্রথম সে প্রতিদিন তাহাকে পত্র লিখিত। কিন্তু তাহাও ক্রমশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সহসা মৃন্ময় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। স্বর্ণলতার পত্রগুলি সে যে চন্দনকাঠের বাক্সটাতে রাখিত, সে বাক্সটা তো হাসির সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। মৃন্ময়ের গরম জামা কাপড় যে ট্রাঙ্কটাতে থাকিত, সেই ট্রাঙ্কটাতেই চন্দনকাঠের বাক্সটা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে ট্রাঙ্কটা তো হাসি লইয়া গিয়াছে। এতদিন সে ট্রাঙ্কের চাবি মৃন্ময়ের কাছে থাকিত, যাইবার সময় হাসি চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। চন্দনের বাক্সটার কথা মৃন্ময়ের মনেই ছিল না। স্বর্ণলতার কথা হাসি কিছুই জানে না। হাসি এখন বেশ লিখিতে পড়িতেও শিখিয়াছে, সে যদি চিঠিগুলা পড়ে! মৃন্ময় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মৃন্ময়বাবু বাড়ি আছেন নাকি ?

আছি, আসুন।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া মৃন্ময় বুঝিল, পাশের বাড়ির এম. এ.-পরীক্ষার্থী বিকাশবাবু আসিয়াছেন। ভদ্রলোক এবার ফিলজফিতে এম. এ. পরীক্ষা দিতেছেন। মৃন্ময়ও ফিলজফিতে এম. এ. শুনিয়া বিকাশবাবু মৃন্ময়ের নিকট সাহায্য লইবার জন্য মাঝে মাঝে আসেন। কাল মৃন্ময় বাড়ি ছিল না, বিকাশবাবু আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন—মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট মৃন্ময় তাহা শুনিয়াছিল। মৃন্ময় উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

বিকাশবাবু আসিয়াই বলিলেন, মুকুজ্জেমশাই কোথায় ?

তিনি বেরিয়েছেন।

হি ইজ এ ওয়াণ্ডারফুল ম্যান। অদ্ভুত লোক মশাই, কাল আপনি বাড়ি ছিলেন না, আমি একটু হতাশ হয়েই ফিরছিলুম; মুকুজ্জেমশাই বললেন, পরীক্ষা নাকি কাল থেকে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, মৃন্ময়বাবুকে আজ একবার পেলে ভাল হ'ত। মুকুজ্জেমশাই আমাকে তখন কয়েকটা কোশ্চেন সাজেস্ট্ ক'রে দিলেন, বললেন, এগুলো ভাল ক'রে দেখে যেও, পড়তে পারে। আমি তো প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলুম, মুকুজ্জেমশাই যে এম. এ.-র ফিলজফির কোশ্চেন সাজেস্ট্ করতে পারেন, তা আমার ধারণারই বাইরে ছিল। যাই হোক, বললেন যখন, দেখে গেলুম। আমাদের অবস্থা তো বোঝেন—ড্রাউনিং ম্যান ক্যাচেস অ্যাট এ স্ট্র। গিয়ে দেখি, ঠিক পড়েছে মশাই। উনিও নিশ্চয় এম. এ., নয় ? কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই।

মৃন্ময়ও বিস্মিত হইয়াছিল। বলিল, আমি ঠিক জানি না, উনি নিজের কোন পরিচয় কাউকে দেন না।

ফিরবেন কখন ?

ঠিক বলতে পারি না। এলে খবর দেব আপনাকে।

দেবেন তো কাইণ্ডলি, নেক্সট পেপারটার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব।

আচ্ছা।

বিকাশবাবু চলিয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাইয়ের নূতন পরিচয় পাইয়া মৃন্ময় যদিও বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু সে বিস্ময় তাহার মনকে এখন ততটা অধিকার করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত মন একটি মাত্র চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, হাসির হাতে যদি স্বর্ণলতার চিঠিগুলি পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে?

১৬

শৈলর দিন কাটিতেছিল, কারণ সময়ের গতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অমোঘ নিয়মে সূর্য উঠে এবং অস্ত যায়, মানবের সুখদুঃখে দিশাহারা হইয়া এক মুহূর্তের জন্যও শ্লথগতি হয় না। বড় অফিসার মিস্টার এল. কে. বোসের পত্নী শৈলবালারও জীবনের দিনগুলি একে একে আসিতেছিল এবং যাইতেছিল। শৈল সুখী ছিল না। শৈল সুখী ছিল কি না—এ প্রশ্নও কাহারও মনে উদিত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুখের উপকরণ হিসাবে যে সব জিনিস আহরণ করিবার জন্য আমরা প্রলুব্ধ হই যাহার জন্য নিজেকে ক্লিষ্ট করি, অপরকে বঞ্চিত করি, মনুষ্যত্বকে খর্ব করি—সুখের সে উপকরণগুলির অভাব শৈলর ছিল না। শৈল বড়লোকের কন্যা, বড়লোকের পত্নী। বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, গহনা কিছুরই অভাব নাই। স্বামী রূপবান পদস্থ ব্যক্তি। শৈলর সহিত তিনি কোন দুর্ব্যবহার করেনই না, বরং শৈলর সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে স্বামীর নৈতিক কর্তব্যবোধ মিস্টার এল. কে. বোসের একটু বেশি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বাড়িতে ঠাকুর চাকর দাই বাবুর্চি বেয়ারা গিজগিজ করিতেছে, শৈলকে গান-বাজনা এবং ইংরেজী শিখাইবার জন্য মিস মল্লিককে বাহাল করিয়াছেন, শৈলর নিজের ব্যবহারের জন্য আলাদা একখানা মোটরও তিনি সেদিন তাহার জন্মদিনে তাহাকে উপহার দিয়াছেন। শৈল তথাপি সুখী নয়। তাহার কারণ, অন্তরের

অন্তরতম প্রদেশে যে উৎস উৎসারিত হইলে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ সুখী হয়, শৈলর অন্তরে সে উৎস ছিল না। শৈল স্বামীকে প্রিয়তম করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। শৈল স্বামীকে ভয় করে, তাঁহার নানাবিধ গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হয়, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না। মিস্টার বোসের কর্মব্যস্ত জীবন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে নিয়মিত। তিনি নিক্তির ওজনে কর্তব্য করেন, চুল চিরিয়া বিচার করেন, ওজন করিয়া কথা বলেন। চাকরির উন্নতিই তাঁহার জীবনের ধ্যানজ্ঞান, উপরওয়ালা সাহেবদের বিষয়ই তাঁহার প্রিয় আলোচ্য বিষয়। সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের স্থান তাঁহার জীবনে নাই। যতটুকু আছে, তাহা সৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য। ঝকঝকে বাঁধানো কতকগুলি মূল্যবান সংস্করণের নামজাদা পুস্তক দামী আলমারিতে সাজানো আছে, প্রতি ঘরের দেওয়ালে সুন্দর ফ্রেমে প্রসিদ্ধ কয়েকখানি ছবিও ঝুলিতেছে। বাড়িতে গ্রামোফোন আছে; পত্নীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী আছে; রেডিওর চলন তখন ছিল না, থাকিলেও লেটেস্ট মডেল নিশ্চয় মিস্টার বোসের গৃহ অলঙ্কৃত করিত। কিন্তু মিস্টার বোসের অন্তরে ইহাদের কোন শ্রদ্ধার স্থান নাই, মনে মনে তিনি এসব কবিত্ব-টবিত্বকে অনুকম্পার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। শৈলর সহিত মাঝে মাঝে ইহা লইয়া আলোচনা হয়। মিস্টার বোসের ভাষায়—এ সমস্ত ওয়ার্থ্‌লেস অকর্মণ্য লোকদের উপজীব্য। পৃথিবীতে যাহারা কাজের লোক, তাহাদের ওসব লইয়া মাতামাতি করিবার অবসর কই? সুতরাং শৈলর নূতন শেখা সুরটা শুনিয়া মুগ্ধ হইবার, নূতন প্যাটার্নের সেলাইটা দেখিয়া তারিফ করিবার অথবা নূতন শোনা নাটকটার কাহিনী ধৈর্যভরে শুনিবার ইচ্ছা মিস্টার বোসের নাই, ইচ্ছা নাই বলিয়া অবকাশও নাই। তিনি নিখুঁত কর্মতৎপরতার সহিত নিজের নিখুঁত কর্মজীবন যাপন করিয়া চলিয়াছেন। নিম্নতম কর্মচারীরা সকলে জানে, বোস সায়েব ভারি স্ট্রিক্ট্‌ লোক, কোন কিছুরই বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না।

শৈল মাঝে মাঝে ভাবে, তাহার স্বামী যদি একটু কম নিখুঁত হইত, একটু কম বুদ্ধিমান হইত, একটু কম মাহিনার চাকরি করিত, তাহা হইলে হয়তো সে সুখী হইত। এমন প্রবল রকম নিখুঁত লোককে ভয় করা চলে, শ্রদ্ধা করা চলে, ভালবাসা যায় না।

শৈলর মাঝে মাঝে শঙ্করদার কথা মনে পড়ে। বাল্যকালে শঙ্করদা তাহার সঙ্গী ছিল, তাহার অসঙ্গত মান ভাঙাইবার জন্য কত সাধ্যসাধনা করিত! শঙ্করদা আজকাল আর আসে না। কেনই বা আসিবে? বিবাহ হইয়াছে, নূতন বউ লইয়া সে হয়তো আনন্দেই আছে। মিস মল্লিকের সহিত শঙ্করদার মাঝে মাঝে নাকি দেখা হয়! মিস মল্লিককে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলে শঙ্করদা নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু ডাকিয়া পাঠাইতে লজ্জা করে, ভয়ও হয়।

১৭

সকালের টুইশনি সারিয়া বেলা দেবী এগারোটা নাগাদ বাসায় ফিরিলেন। স্নানাহার করিয়া আবার বাহির হইতে হইবে। দুপুরে আরও গোটা-দুই টুইশনি আছে। মেয়েদের গানের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে বেলা মল্লিকের পসার বেশ জমিয়া গিয়াছে। প্রথমত মেয়েদের গান শিখাইবার জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারী শিক্ষকেরই বেশি চাহিদা, দ্বিতীয়ত বেলার শুধু রূপ নয়—গুণও আছে। গান-বাজনায় বেশ দখল হইয়াছে, হার্মোনিয়ম, সেতার, এস্রাজ, পিয়ানো—এই চারিটি যন্ত্র খুব ভালভাবে বাজাইতে পারেন এবং ছাত্রীদের খুব যত্নসহকারে শিখাইয়া থাকেন। বেতনও যে খুব অসম্ভব রকম বেশি তাহা নয়, সুতরাং গীত-বাদ্য-জিজ্ঞাসু ছাত্রীমহলে বেলা দেবীর চাহিদা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এমন কি সময়ের অভাবে আজকাল অনেক ছাত্রীকে ফিরাইয়া দিতেও হইতেছে। দাদার সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়া প্রথমে তিনি অকূল পাথারে পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সত্য

সত্যই নিজের পায়ে সমর্থভাবে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। দাদার প্রতি মনোভাবও অনেকটা কোমল হইয়া আসিয়াছে। হয়তো আর কিছুদিন পরে দাদার নিকট তিনি ফিরিয়াও যাইতেন। মনের ভিতর এই যুক্তিটা ক্রমশ অঙ্কুরিত হইতেছিল—এখন আর ফিরিয়া যাইতে আপত্তি কি, এখন তো আমি সত্য সত্যই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছি, দাদার অর্থ অথবা অনুগ্রহের উপর আর তো নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না। অন্য সব টুইশনি ছাড়িয়া দিলেও ওই বৃদ্ধ সাহেবটি যাহা দেন, তাহাতেই তাহার একার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল। বেলা দেবী ফিরিয়া আসিয়াই একখানি পত্র পাইলেন—প্রিয়নাথ মল্লিকের পত্র। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানি পড়িলেন, সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ মল্লিক লিখিতেছেন—

বেলা,

এতদিন পরে বুঝিলাম, কেন তুমি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলে এবং এতদিন পরে তোমার সম্বন্ধে আমার একটা ভ্রান্ত ধারণাও অপনোদিত হইয়া গেল। এতদিন তোমাকে আমি পুরুষ-সঙ্গ-লোলুপ সাধারণ মেয়েদের সহিত এক শ্রেণীতে ফেলিয়া ছোট করিয়া দেখিতে পারি নাই। তোমার স্বাধীনভাবে থাকিবার অসামাজিক ইচ্ছাকে তোমার খামখেয়ালী জেদী প্রকৃতিরই স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তুমিও পুরুষ-সঙ্গ-লোলুপ সাধারণ মেয়ে, শাসনের গণ্ডি ডিঙাইয়া স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা করিতে চাও। শঙ্করবাবু নামক ব্যক্তিটি যে তোমার প্রণয়ী, তাহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই; কিন্তু এখন তোমার আচরণে তাহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমি আশ্চর্য হইয়া কেবল ভাবিতেছি, তোমার সামাজিক জ্ঞান কি একেবারে লোপ পাইয়াছে! লোকটাকে প্রকাশ্যভাবে ঘরে স্থান দিয়াছ! তোমাকে এখনও অনুরোধ করিতেছি, এখনও তুমি যদি ভালভাবে থাকিতে

চাও, আমার কাছে ফিরিয়া এস। ইহাই আমার শেষ অনুরোধ জানিবে।

ইতি—তোমার দাদা

প্রিয়নাথ মল্লিক

বেলা পত্রখানি কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। দাদার নিকট ফিরিয়া যাইবার যে ইচ্ছাটি মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহা মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল। শঙ্করকে প্রকাশ্যভাবে বাড়িতে স্থান দেওয়ায় ক্ষুব্ধ জনার্দন সিংহও চাকরিতে জবাব দিয়া গিয়াছে। এই পত্রখানি বেলাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় আঘাতে বিচলিত হওয়া দূরে থাক, বেলা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। শঙ্করবাবুর যতদিন না কোথাও চাকরি হইতেছে, ততদিন বেলা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিবেন না, ইহাতে যে-ই যাহা বলুক না কেন!

বেলা দেবী পাশের ঘরে গেলেন। ইক্‌মিক কুকারটির গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, একটু গরম আছে, একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই। তাড়াতাড়ি স্নানটা সারিয়া লইতে হইবে, শঙ্করবাবু হয়তো এখনই আসিয়া পড়িবেন। তেলের শিশিটা এবং সাবানের কৌটা লইয়া বেলা বাথ-রুমে গেলেন। বাথ-রুমের ভিতর যে তৃতীয় আঘাত উদ্যত হইয়া ছিল, তাহা বেলা প্রত্যাশা করেন নাই। বাথ-রুমের জানালা গলাইয়া কে একটা প্রকাণ্ড খাম মেঝের উপর ফেলিয়া গিয়াছে। জনার্দন সিং নাই, সুতরাং ও-পাশের ছোট দেওয়ালটা অতিক্রম করিয়াই কেহ নিশ্চয়ই আসিয়াছিল এবং জানালা গলাইয়া ইহা রাখিয়া গিয়াছে। বিস্মিত বেলা দেবী খামটা তুলিয়া লইলেন। বেশ মোটা লম্বা খাম। খাম খুলিয়া বেলা দেবীর সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হইয়া গেল। খামের ভিতর অতিশয় অশ্লীল ছবি এবং ততোধিক অশ্লীল একটা চিঠি। চিঠিটা দরখাস্তের আকারে লেখা, নীচে আট-দশজনের নাম। প্রণয়ী-হিসাবে ইহারা সকলেই যে শঙ্করের অপেক্ষা বেশি যোগ্য, তাহাই অতি অশ্লীল ভাষায় বিশদ করিয়া লিপিবদ্ধ

করিয়াছে। বেলা কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর খামখানা লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহা স্পিরিটে ভিজাইয়া পুড়াইয়া ফেলিলেন। খামখানা যখন নিঃশেষে পুড়িয়া গেল, তখন আবার তিনি বাথ-রুমে ফিরিয়া গেলেন।

একটু পরেই শঙ্কর আসিয়া পড়িল। সঙ্গে চুন্‌চুন। চুন্‌চুনকে দেখিয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বেলা বলিলেন, ও, তাই এত দেরি! আমি ভাবছিলাম, শঙ্করবাবু চাকরির সন্ধানে বুঝি বিবাগীই বা হয়ে গেলেন! চুন্‌চুনের সঙ্গে কোথায় দেখা?

শঙ্কর বলিল, আমিই ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

বেলা চুন্‌চুনের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোরা সার্ভিস সিকিওরিং বিউরো খুলেছিস নাকি?

চুন্‌চুনের মুখ বিষণ্ণ, তবু এই কথাগুলি শুনিয়া তাহার চক্ষু দুইটিতে হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, না, শঙ্করবাবু গিয়েছিলেন প্রকাশবাবুর খোঁজে।

প্রকাশবাবুর খোঁজে কেন?

শঙ্কর বলিল, প্রকাশবাবু আমার জন্যে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে দেবেন বলেছিলেন। তাঁর জানা-শোনা একটা প্রেসে প্রুফ-রীডারের একটা কাজ নাকি খালি আছে।

কত মাইনে?

প্রকাশবাবুর দেখাই পেলাম না। চুন্‌চুনের দিদির সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি সব শুনে দয়ার্দ্র হলেন, বললেন, যতদিন আপনার কোন কাজ না হয়, ততদিন না হয় আমার ছেলে দুটিকে পড়ান আর আমাদের বাড়িতে থাকুন।

বেলা দেবী অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া একটু হাসিলেন।—আপনি রাজী হয়ে এসেছেন তো?

না হয়ে উপায় কি ?

একটু থামিয়া শঙ্কর আবার বলিল, এনি পোর্ট ইন দি স্টর্ম্। আপনার দাক্ষিণ্যে আর কত দিন বাস করা যায় বলুন ?

বেলা ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই সংবাদে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য শঙ্করের এই আকুলতায় [illegible] মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। তবু তিনি হাসিয়া বলিলেন, বেশ করেছেন। এখন চলুন খাওয়া যাক, ভয়ানক খিদে পেয়েছে। চুনচুন, তুই খেয়ে এসেছিস তো ?

চুনচুন বলিল, হ্যাঁ।

তিনজনে খাইবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

১৮

বাবাজী ওরফে মুক্তানন্দ স্বামী কুমারিকা অন্তরীপে বেশিদিন বাস করিতে পারিলেন না। নির্ঝঞ্ঝাটে ভগবদুপাসনা করিবার [illegible] স্থানটি উপযোগী হইলেও বাবাজী একটি মহা অসুবিধায় পড়িলেন। ম[illegible] মত তেমন কোন বাঙালী কাছে-পিঠে নাই। একেবারে বাঙালী-বর্জিত স্থানে কি থাকা যায় ? শুধু সমুদ্র দেখিয়া মন ভরে না। কাছাকাছি কথা বলিবার মত একজনও লোক না থাকিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে যে! সেখানকার ভাষা বাবাজীর পক্ষে দুর্বোধ্য, ইংরেজী ও ভাঙা-ভাঙা হিন্দী বলিয়া কতদিন চালানো যায় ? তা ছাড়া, আর একটা কথাও বাবাজীর বার ব[illegible] মনে হইতে লাগিল। স্বদেশ হইতে এতদূরে আসিয়া বসবাস করাট[illegible] কি ঠিক ? হাজার হোক স্বদেশ। আত্মীয়স্বজনও আছে; ভনটুও আছে, তা ছাড়া [illegible]াকুরও ওই দেশেই থাকেন—সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এতদূরে থাকিতে মুক্তানন্দ স্বামীর অন্তরাত্মা রাজী হইল না। দেশের কাছাকাছি নির্জন স্থান দুর্লভ নয়। গঙ্গার ধারে অমন ঢের জায়গা পড়িয়া আছে। এই গঙ্গা-হীন বিদেশ-বিভুঁয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। সংসারের

জালে অবশ্য তিনি নিজেকে জড়াইবেন না, কিন্তু তাই বলিয়া এখানে পড়িয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই। আর একটা কথা, টাকাও ফুরাইয়া আসিতেছিল। অর্থাভাবে পড়িলে এই অচেনা অজানা জায়গায় কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? নিজের অতবড় বিষয়টা বাঁধা দিয়া বন্ধুর নিকট হইতে তিনি মাত্র পাঁচ শত টাকা আনিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তিন শত টাকা শেষ হইয়া গিয়াছিল। আরও টাকা পাঠাইবার জন্য বন্ধুকে পত্র দিয়াছিলেন, কোন উত্তর আসে নাই; এ বিষয়েও উদাসীন থাকা তাঁহার উচিত বলিয়া মনে হইল না। ভন্টুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে। ভন্টু লিখিয়াছে যে, সে মেজকাকার বিষয়ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে চাহে না। মেজকাকার বিষয়ের ব্যবস্থা মেজকাকা নিজেই করুন। বাবাজীর মনে হইল, চিঠিতে অভিমানের সুর ধ্বনিত হইতেছে। হইবেই না বা কেন! হাজার হোক, ছেলেমানুষ তো। এই বয়সেই সমস্ত সংসারের বোঝাটা তাহার উপর পড়িয়াছে। বিষ্টুটা এক পাল ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়া তুচ্ছ একটা অসুখের ছুতায় দিব্য সমুদ্রের ধারে গিয়া বায়ু সেবন করিতেছে। ভন্টুর অগ্রজ বিষ্ণুবাবুর প্রতি পুরাতন ক্রোধ বাবাজীর অন্তরে নূতন করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্বিক চিন্তা করিয়া তিনি ঠিক করিয়া ফেলিলেন, কুমারিকায় আর থাকা চলিবে না। তল্পিতল্পা গুটাইয়া তিনি স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৯

মোটরের দালাল অচিনবাবুর অদম্য অনুসন্ধিৎসার ফলেই একদিন প্রিয়নাথ মল্লিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। বেলাকে কিছুতেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে না পারিয়া অচিনবাবু অবশেষে প্রিয়নাথের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং হিতৈষীর ছদ্মবেশে তাঁহার চরিত্র পর্যবেক্ষণ

করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের সহিত আলাপ করিয়া অচিনবাবু বুঝিয়াছিলেন যে, ভগ্নীর উপর বিরূপ হইলেও প্রিয়নাথ ভগ্নীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য এখনও সমুৎসুক। এই ঔৎসুক্যকে তীব্রতর করিয়া তুলিবার বাসনায় অচিনবাবু প্রিয়নাথের বিরক্তির অনলে ইন্ধন যোগাইতে শুরু করিলেন। প্রতিদিন আসিয়া প্রিয়নাথকে বেলার গতিবিধির অতিরঞ্জিত নানা কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। বেলার বাসায় শঙ্করের অভ্যাগমে তাঁহার আরও সুবিধা হইয়া গেল, বেলা যে সত্য সত্যই কি ভাবে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, তাহা উদাহরণ-সম্বলিত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ তিনি পাইলেন। এমন কি মোটরে চড়াইয়া একদিন রাত্রে তিনি প্রিয়নাথ মল্লিককে বেলার-বাসায়-প্রবেশোন্মুখ শঙ্করকে দেখাইয়া পর্যন্ত দিলেন। স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া প্রিয়নাথের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তখনই মোটর হইতে নামিয়া তিনি একটা অনর্থ সৃষ্টি করিতেন, অচিনবাবু অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরদিন প্রিয়বাবু বেলাকে যে পত্রাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা অচিনবাবু জানিতেন না। শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

আপনি চিঠি লিখে দিয়েছেন ?

নিশ্চয়।

কি লিখলেন ?

সোজা সত্য কথা, লিখে দিলাম—তোমার স্বাধীনতার মর্ম সব বুঝতে পেরেছি, ভাল চাও তো এখনও ফিরে এস।

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি হাস্যময় হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, অত সোজায় আসবেন না তিনি।

প্রিয়নাথ মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একদৃষ্টে অচিনবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ঈজি-চেয়ারে ঠেস দিয়া শুইয়া ছিলেন, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

আমার কি ইচ্ছে করছে জানেন?

অচিনবাবুর মুখে এতটুকু হাসি নাই, কেবল চোখ দুইটি হাসিতেছে।

কি বলুন?

ইচ্ছে করছে, চুলের ঝুঁটি ধ'রে টানতে টানতে ওকে এখানে নিয়ে এসে ঘরে তালা বন্ধ ক'রে আটকে রেখে দিই।

অচিনবাবুর চোখের হাসি মুহূর্তে প্রখর হইয়া উঠিল। একটা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাইয়া চক্ষুর দৃষ্টি যেন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টির প্রাখর্য কণ্ঠস্বরে সংক্রামিত হইল না। অতিশয় ধীরভাবে যেন একটা নিঃসংশয় মত তিনি ব্যক্ত করিতেছেন এমনভাবে বলিলেন, মিস মল্লিককে যদি আনতে চান, জোর ক'রেই আনতে হবে। কেবল মুখের কথায় তিনি আসবেন না।

প্রিয়নাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার খানিকক্ষণ অচিনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অচিনবাবু বলিলেন, ভাবছেন কি?

ভাবছি, সত্যই কি জোর ক'রে ওকে আনা যায় না কোন রকমে?

তা যাবে না কেন? তবে একটু রিস্‌কি ব্যাপার।

তাহার পরই অচিনবাবু বানাইয়া একটি গল্প বলিলেন। যশোরে একবার নাকি এক স্বামীগৃহবিমুখা বধূকে তিনি জোর করিয়া মোটরে তুলিয়া স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং সে ক্রমশ নাকি পোষ মানিয়াছিল।

একে আনতে পারেন আপনি?

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি চকচক করিতে লাগিল। এই প্রশ্নটির জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে আমার সঙ্গে। কারণ পুলিস-কেস হ'লে আমি একা হাঙ্গামায় পড়তে চাই না। আপনি হলেন ওঁর ন্যাচারাল গার্জেন, এ রকম জোরজবরদস্তি করবার খানিকটা অধিকার আছে আপনার।

নিশ্চয়ই আছে। পুলিসকে সব কথা খুলে বললে—দে উইল সি মাই পয়েণ্ট। এ তো মগের মুলুক নয়, ব্রিটিশ রাজত্ব।

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি পুনরায় হাস্যময় হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ আবার কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন। তাহাঁর পর বলিলেন, আপনি যদি বন্দোবস্ত করতে পারেন, করুন। চোখের সামনে বোনটাকে এমনভাবে উচ্ছন্ন যেতে দিতে পারি না। পুলিস-কেস হয় হোক, কুচ পরোয়া নেই, আই শ্যাল রিস্‌ক্‌ ইট।

আচ্ছা, ভেবে দেখি।

অচিনবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার ভাবিয়া দেখিবার বেশি কিছু ছিল না। এই সম্ভাবনাটা মনে উদিত হইবামাত্র বিদ্যুৎগতিতে তিনি সমস্তটা ভাবিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের অজুহাতে এবং প্রিয়নাথকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া বেলাকে জোর করিয়া কি ভাবে অপহরণ করা সম্ভব, তাহা অচিনবাবু অবিলম্বে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। গোলমালে প্রিয়নাথকে ফাঁকি দিয়া কি করিয়া বেলাকে অন্যত্র সরাইয়া ফেলা যাইবে, এই অংশটুকু এখনও তাঁহার ভাবা হয় নাই। এই অংশটুকু পরিপাটীরূপে চিন্তা করিতে হইবে। পরিপাটীরূপে চিন্তা না করিয়া অচিনবাবু ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই জাতীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে অচিনবাবু অঙ্কের মত সমস্ত জিনিসটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কষিয়া লইয়া তবে কার্য আরম্ভ করেন। মনে মনে সমস্ত জটিলতার সমাধান করিয়া এবং পূর্বাহ্ণেই তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তবে অচিনবাবু কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এই অংশটুকুর সমাধানও যে তিনি সুচারুরূপে করিতে পারিবেন, সে বিশ্বাস তাঁহার আছে। তাহার পর, অর্থাৎ বেলা দেবীকে একবার আয়ত্তাধীনে পাইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। অচিনবাবুর ধারণা, মেয়েমানুষ অনেকটা বুনো জানোয়ারের মত। সহজে ধরা দেয় না, ধরা দিলেও প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করে, কিন্তু কিছুদিন খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখিলে ক্রমশ পোষ মানে এবং অবশেষে খেলা দেখায়।

অচিনবাবুর মোটরকার নিঃশব্দগতিতে কড়েয়ার দিকে ছুটিতে লাগিল। ম্যানেজারবাবু সম্প্রতি যে নূতন বাসাটায় উঠিয়া আসিয়াছেন, তাহা কড়েয়াতে একটা গলির মধ্যে। ম্যানেজারবাবু যদি মোটা রকম দক্ষিণা দিতে রাজী হন, তাহা হইলেই এই বিপজ্জনক ব্যাপারে অচিনবাবু হাত দিবেন, নতুবা নয়। সম্প্রতি তাঁহার কিছু টাকারও প্রয়োজন ঘটিয়াছে, মেয়েটার জন্য একটা ভাল পাত্রের সন্ধান মিলিয়াছে, কিন্তু তাহারা নগদ দশ হাজার টাকা চায়। অত টাকা অচিনবাবুর হাতে নাই। অচিনবাবুর মোটর একটা গলি পার হইয়া সার্কুলার রোডে পড়িল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। সার্কুলার রোড নির্জন। অচিনবাবু মোটরের স্পীড বাড়াইয়া দিলেন।

২০

ম্যানেজারবাবুকে ঘন ঘন বাসা পরিবর্তন করিতে হয় বটে, কিন্তু কখনও কোন ছোট বাসায় তিনি যান না। প্রকাণ্ড দুই-তিন মহলা বাড়ি না হইলে তাঁহার চলে না। কড়েয়ার বাড়িটাও প্রকাণ্ড। এই প্রকাণ্ড বাড়ির একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে ম্যানেজার একা বসিয়া ছিলেন। ঘরের এক কোণে একটি ছোট ইলেক্ট্রিক পাখা নিঃশব্দে ঘুরিতেছিল এবং আর এক কোণে একটি ঘন বেগুনী রঙের ছোট বাল্‌ব অন্ধকারকে যৎসামান্য আলোকিত করিয়া পারিপার্শ্বিককে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। ম্যানেজারবাবু প্রখর আলোক সহ্য করিতে পারেন না। দিবসেও তিনি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া চতুর্দিকে পরদা ফেলিয়া সূর্যালোককে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করিয়া রাখেন। অন্ধকার-বিলাসী তাঁহার মন অন্ধকারেই নিশাচরের মত সঞ্চরণ করিতে চায়। বহুকাল ধরিয়া তাঁহার ক্ষুধিত বাসনা অতৃপ্ত আবেগে নিবিড় অন্ধকারে যে জটিল রহস্যময় পথে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, অন্ধকারে যে পথ অফুরন্ত বলিয়া মনে হইতেছে, আলোকপাত করিয়া সে পথের সীমারেখা দেখিয়া কি হইবে? সীমা তো আছেই, কিন্তু তাহা দেখিয়া

লাভ কি? অতলস্পর্শী যে গহ্বরটা সুনিশ্চিতভাবেই একদিন তাঁহাকে গ্রাস করিবে, তাহার বিভীষিকাকে যতদূর সম্ভব তিনি আড়াল করিয়া রাখিতে চান অথবা একা অন্ধকারে বসিয়া এই সবই তিনি কল্পনা করেন—তাহা বলা শক্ত। ম্যানেজারবাবুর মনের খবর কেহ জানে না, কিন্তু ইহা তাঁহার অনুচরবর্গেরা সকলেই জানে যে, অন্ধকার, বড় জোর ঈষৎ-আলোকিত অন্ধকার, তাঁহার প্রিয় আবেষ্টনী।···বাহিরের ঘরে ইলেক্‌ট্রিক বেল ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ম্যানেজারবাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। খুব সম্ভবত অচিনবাবু আসিয়াছেন। তাঁহাকে আসিবার জন্য তিনি খবর পাঠাইয়াছিলেন। অচিনবাবুকে দিয়া চিঠিখানা লিখাইয়া খগেশ্বরকে পাঠাইতে হইবে। না পাঠাইলে নূতন মালটিকে হস্তগত করা যাইবে না। অচিনবাবু চিঠিখানা লিখিতে রাজী হইবে তো? কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারবাবুর জরা-শিথিল মুখমণ্ডল নীরব হাস্যে আরও কদাকার হইয়া উঠিল। রাজী হইবে না! কিছু টাকা কবুল করিলেই রাজী হইবে।

বেঁটে গ্যাঁট্টাগোঁট্টা ছোকরাটি নিঃশব্দে আসিয়া ছায়ামূর্তির মত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

কি?

নীচে মোটরকারের দালালবাবুটি এসেছেন।

বেশ, সিঁড়ির দরজাটা খুলে দাও।

ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

নীচে প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে সিঁড়িটা সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল। অচিনবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন। দ্বার উন্মুক্তই ছিল, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে ম্যানেজারবাবুর ঘরের বেগুনী বাল্‌ব নিবিয়া গিয়া সাধারণ একটি আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

অচিনবাবু প্রবেশ করিতেই ম্যানেজারবাবু বলিয়া উঠিলেন, আপনার ভাগ্য ভাল, কিছু টাকা লাভ হয়ে যাবে আপনার আজ। তাই ডেকে

পাঠিয়েছিলাম আজ আপনাকে। মাত্র ছুটি লাইন একটি চিঠি লিখে দিতে হবে, এর জন্যে কর্তামশাই নগদ এক শো টাকা স্যাংশন করেছেন। আসুন, বসুন।

কিসের চিঠি?

আরে মশাই, বসুনই না আগে।

অচিনবাবু উপবেশন করিলেন।

ম্যানেজারবাবু সত্য মিথ্যা মিশাইয়া একটি গল্পের অবতারণা করিলেন, কিছুদিন আগে, মনে আছে, যমুনা ব'লে একটি মেয়ের সন্ধান এনেছিলেন আপনি?

গল্পের এ অংশটুকু সত্য।

অচিনবাবু বলিলেন, মনে আছে, তাকে তো কোন রকমেই বাগাতে না পেরে শেষটা হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দিয়েছিলেন তো? কর্তার আর একটি এজেন্ট্ কিন্তু তার নাগাল পেয়েছে।

ম্যানেজারবাবু সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া ক্ষণকাল অচিনবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, কিন্তু মুশকিলেও পড়েছেন তিনি। মেয়েটির এখনও আপনার ওপর অগাধ বিশ্বাস। মেয়েটা বলছে যে, অচিনবাবু যদি আমাকে যেতে লেখেন, তা হ'লে আমি কলকাতা যেতে পারি।

অচিনবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, কিন্তু আমি যখন তাকে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে চেয়েছিলুম, তখন তো সে আসতে চায় নি! এই এজেন্ট্‌টি কে?

জানেন তো কর্তার কড়া হুকুম, একজন এজেন্টের নাম আর একজনের কাছে করা চলবে না।

যমুনা মেয়েটা আবার আসতে চাইছে? আশ্চর্য!

স্মিতমুখে ম্যানেজার বলিলেন, তবে আর মেয়েমানুষ বলেছে কেন?

তাহার পর বলিলেন, আরে মশাই, আপনি ও নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? দিন না দু লাইন লিখে, আমারও হুকুম তামিল করা হোক, আপনারও

কিছু লাভ হোক। তারপর কর্তা তাঁর এজেণ্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে—আপনারই বা কি, আমারই বা কি?

ম্যানেজার আর কালবিলম্ব করিলেন না, কুব্জ দেহটাকে সোজা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গৃহকোণে অবস্থিত লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া এক শত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া আনিলেন, তাক হইতে চিঠি লিখিবার প্যাড এবং ফাউণ্টেন-পেন পাড়িয়া আনিয়া বলিলেন, নিন, লিখে দিন চিঠিখানা।

কি লিখব?

লিখুন না—কল্যাণীয়াসু, তুমি লোকটির সহিত অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমিই ইহাকে পাঠাইয়াছি। বিশেষ দরকার আছে। বাস্, নামটা সই ক'রে দিন, ঠিকানাটাও দিয়ে দিন।

অচিনবাবু যথাযথ লিখিয়া দিলেন।

ম্যানেজার পত্রখানি হস্তগত করিয়া এক শত টাকার নোটখানি অচিনবাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন, এই নিন আপনার পারিশ্রমিক। তারপর আর সব খবর কি বলুন?

অচিনবাবু খবর বলিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

নোটটি পকেটস্থ করিয়া বলিলেন, ভাল খবর আছে একটা।

কি বলুন তো?

খুব ভাল জিনিসের সন্ধান পেয়েছি, কায়দা ক'রে সাপটে নিতে পারলে মালের মতন মাল একখানা।

বলুন, বলুন।

ম্যানেজারবাবু কুব্জ দেহটাকে উন্নমিত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিলেন। অচিনবাবু রঙ এবং রস দিয়া বেলা মল্লিকের বর্ণনা শুরু করিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সমস্ত শুনিয়া ম্যানেজারবাবু বলিলেন, আপনি যেমন বলছেন; তেমন জিনিস যদি হয়, টাকার জন্যে কর্তামশাই পেছপাও হবেন না।

মেয়েমানুষের পেছনে অনেক টাকা উড়িয়েছেন তিনি, আরও ওড়াবার তাকতও আছে তাঁর। তবে জিনিসটি সরেস হওয়া চাই।

জিনিস খুব সরেস।

তা হ'লে টাকার জন্মে ভাবনা নেই।

হাজার দশেক খরচ হতে পারে।

হাজার বিশেক হ'লেও কর্তা ভ্রূক্ষেপ করবেন না, জিনিস যদি ভাল হয়।

আমি বলছি, জিনিস খুবই ভাল।

তা হ'লে লেগে পড়ুন, টাকার জন্মে ভাববেন না।

অচিনবাবু উঠিলেন।

ক্ষণকাল পরে তাঁহার মোটরখানি নিঃশব্দগতিতে গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। অচিনবাবু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজারবাবুর ঘরে পুনরায় বেগুনী বাল্‌ব জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অচিনবাবু-বর্ণিত বেলা মল্লিকের কাল্পনিক মূর্তিটি ঘিরিয়া তাঁহার লেলিহান বাসনা ক্রমশ উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল। স্ফীতনাসারন্ধ্র, মুদিতচক্ষু তিনি নিস্পন্দ হইয়া এক কোণে বসিয়া ছিলেন। দ্বারে আবার শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলেন, বেঁটে গ্যাঁট্টাগোঁট্টা সেই ছায়ামূর্তি পুনরায় দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কি আবার?

সেই জু মেয়েটি ম'রে গেল।

ও। আচ্ছা প্যাক ক'রে ফেল তা হ'লে। বড় প্যাকিং কেস আছে তো?

আছে।

প্যাক ক'রে সেই বুড়ো জু-টার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস। ডাক্তারবাবু সার্টিফিকেটও একখানা দিয়ে গেছেন, সেটাও নিয়ে যেও। সেই বুড়ো জু-ই মড়ার ব্যবস্থা করবে। তার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে কাল। এক্ষুনি সরিয়ে ফেল তার বাড়িতে, দেরি ক'রো না।

ম্যানেজার এমন অনাকুলিত চিত্তে আদেশ দিলেন, যেন একটা কাচের পাত্র অসাবধানে ভাঙিয়া গিয়াছে, টুকরাগুলা সরাইয়া ফেলিতে বলিতেছেন।

ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ঘন বেগুনী রঙের নিবিড় পরিবেষ্টনীতে নিষ্ঠুর নীরবতা পুনরায় ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

২১

মৃন্ময় ছিল না।

অতিশয় তুচ্ছ একটা অজুহাত দেখাইয়া হাসির নিকট চলিয়া গিয়াছিল। অজুহাতটার তুচ্ছতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও মুকুজ্জেমশাই আপত্তি করেন নাই, বরং সস্নেহ কৌতুকভরে তাহার যাওয়াটার সমর্থনই করিয়াছিলন। সত্যই তো মৃন্ময় কি রকম ধরনের চাকরি লইবে, সে সম্বন্ধে হাসির সহিত একটা পরামর্শ করা কর্তব্য বইকি! মৃন্ময়ের অবিলম্বে চলিয়া যাওয়া উচিত। মৃন্ময় চলিয়া গেলে মুকুজ্জেমশাই অনুকম্পাভরে ভাবিয়াছিলেন, আহা বেচারা, একটা বলিষ্ঠ রকম অজুহাত খাড়া করিতে পারে নাই, চাকরি সম্বন্ধে হাসির মতামতও লইতে গিয়াছে! যেন বহু মনিব আসিয়া চাকরির জন্য তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে, কোন্‌টা গ্রহণ করিবে সে ঠিক করিতে পারিতেছে না।

মুকুজ্জেমশাই আরও একটা কারণে মৃন্ময়কে ছুটি দিয়াছিলেন। তিনি কয়েকদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, মৃন্ময় ক্রমশ কেমন যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে। এমনিই সে বড় একটা হাসে না, কিন্তু এই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে সে আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। হাসি বাপের বাড়ি যাইবার পর সেই গাম্ভীর্যের উপর একটা বিষাদের কালিমাও যেন দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। মুকুজ্জেমশাই ভাবিলেন, যাক, দিনকতক হাসির নিকট ঘুরিয়া আসুক, আমি একাই যতটা পারি করি।

মৃন্ময় কিন্তু হাসির নিকট গিয়াছিল সেই চিঠিগুলির সন্ধানে।

মুকুজ্জেমশাই এবং হাসির অভিভাবক ভদ্রলোক যদিও মৃন্ময়ের গৃহত্যাগিনী পত্নীর কথা জানিতেন, কিন্তু হাসিকে সে কথা বলেন নাই। সে পত্নীর নামও তাঁহারা জানিতেন না, এবং তাহাকে ঘিরিয়া মৃন্ময়ের অন্তরলোকে যেসব অসাধারণ কাণ্ড ঘটিতেছিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও তাঁহারা কোনদিন পান নাই। সুতরাং স্বর্ণলতাকে লিখিত চিঠিগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছিল, মুকুজ্জেমশাই বাসায় একা ছিলেন। বেশ ভালই ছিলেন। সমস্ত সকাল বিজ্ঞাপন দেখিয়া, সমস্ত দুপুর পূর্বলিখিত দরখাস্তগুলির সম্বন্ধে তদ্বির করিয়া এবং সমস্ত সন্ধ্যা নূতন বিজ্ঞাপন অনুযায়ী দরখাস্ত লিখিয়া তাঁহার ভালই কাটিতেছিল। প্রতিদিন দুপুরে বাহির হইবার মুখে রাত্রের লেখা দরখাস্তগুলি টাইপ করাইবার জন্য দিয়া আসিতেন। শিরীষবাবুর নিকট হইতে শঙ্করের নূতন ঠিকানাও তিনি পাইয়াছেন, শঙ্করের সহিত দেখাও করিয়া আসিয়াছেন। সে একটা ছোটখাটো টুইশনি যোগাড় করিয়াছে এবং কি করিয়া প্রুফ দেখিতে হয় অধ্যবসায়সহকারে তাহাই শিক্ষা করিতেছে। বিকাশবাবু নামক এম.এ.-পরীক্ষার্থী যুবকটি মুকুজ্জেমশাইয়ের মধ্যে অপ্রত্যাশিতরূপে একজন বিদ্বান অধ্যাপক আবিষ্কার করিয়া পুলকোচ্ছ্বাসের আতিশয্যবশত মুকুজ্জেমশাইয়ের কার্যে বিঘ্নোৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুকুজ্জেমশাই তাঁহার উৎসাহ-অনলে শীতল বারিসিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। অতিশয় নিরীহভাবে তিনি বিকাশবাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি নিজে ফিলজফির 'ফ'-ও জানেন না, অন্যত্র তিনি একজন এম.এ.-পরীক্ষার্থীকে ওই প্রশ্নগুলি পড়িতে দেখিয়াছেন এবং সেগুলি তাঁহার মনে ছিল বলিয়াই আকস্মিকভাবে বিকাশবাবুকে সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিজে মূর্খ মানুষ, ফিলজফির কিছুই বোঝেন না। এই কথায় মুকুজ্জেমশাইয়ের সৌভাগ্যক্রমে বিকাশবাবু নিরস্ত হইয়াছেন এবং মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট আসা কমাইয়া দিয়া সদ্য-দত্ত পরীক্ষার খবরাখবর করিতে ব্যস্ত হইয়া আছেন। একা একা

নিজের আরব্ধ কার্যে মশগুল হইয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের দিনগুলি সুন্দর কাটিতেছিল।

এমন সময় একদিন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেদিন রবিবার মুকুজ্জেমশাই বাসায়। অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে কোন খবর না দিয়া রাজমহল হইতে মনোরমা আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে কেহ নাই—একাই আসিয়াছে।

এ কি, তুমি যে হঠাৎ?

মনোরমার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না। শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, এমনই এলুম, ওখানে আর ভাল লাগছিল না।

মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চক্ষু দুইটি কৌতুকদীপ্ত হইয়া উঠিল।

একা চ'লে এলে, ভয় করল না?

না।

এ বাসার ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারলে কি ক'রে?

ঠিকানা খুঁজতে গিয়েই দেরি হ'ল, আমি হাওড়ায় এসে পৌঁছেছি সকালের ট্রেনে।

তারপর?

হাওড়া থেকে হাঁটতে হাঁটতে আর জিজ্ঞেস করতে করতে আসছি।

হাওড়া থেকে হেঁটে আসছ?

পয়সা ছিল না।

মুকুজ্জেমশাই অবাক হইয়া গেলেন।

এমন ক'রে আসবার মানেটা কি?

ওখানে আর ভাল লাগছিল না।—এইটুকু বলিয়া মনোরমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মুকুজ্জেমশাই বুঝিলেন, হাজার প্রশ্ন করিলেও ইহার বেশি আর সে কিছুই বলিবে না।

যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধোও গিয়ে। উঠোনের ও-পাশেই কল আছে। কলে বোধ হয় জল এসেছে এতক্ষণ।

মনোরমা ক্ষুদ্র পুঁটলিটি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুকুজ্জেমশাই মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, মনোরমার এ আচরণের অর্থ কি? অর্থ যাহাই থাকুক, আন্দাজ করিয়া লইতে হইবে। স্বল্পভাষিণী মনোরমা যাহা বলিয়াছে, তাহার বেশি আর কিছু বলিবে না। মাত্র চার-পাঁচ দিন পূর্বে মুকুজ্জেমশাই ভবেশকে কুড়ি টাকা এবং মনোরমার হাতখরচ পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই পাঁচ টাকা সম্বল করিয়াই মনোরমা এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আসিয়াছে তো, কিন্তু এখন তাহাকে লইয়া কি করা যায়? ভবেশের কাছে মনোরমাকে রাখিয়া মুকুজ্জেমশাই বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। হঠাৎ মনোরমার হইল কি? ভবেশকে মুকুজ্জেমশাই ভাল করিয়াই চেনেন, মনোরমার সহিত সে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিবে, ইহা তাঁহার কল্পনাতীত। সহসা মুকুজ্জেমশাইয়ের মনে হইল, মনোরমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে হয়তো অনেকক্ষণ কিছুই খায় নাই। মুকুজ্জেমশাই উঠিলেন।

ঘর হইতে বাহির হইয়া মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন না। উঠানে নামিয়া দেখিলেন, কলের কাছেও কেহ নাই, কল হইতে জল পড়িতেছে। মনোরমা গেল কোথায়? মৃন্ময় যে ঘরটায় শুইত, দেখিলেন, তাহার দরজাটা খোলা রহিয়াছে। বারান্দায় উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া মুকুজ্জেমশাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। চৌকির উপর মনোরমা উপুড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মুকুজ্জেমশাই খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপ যে কিছু একটা ঘটিবে, তাহা তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন; তথাপি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন অনাথার প্রতি করুণাবশত। কর্তব্য ক্রমশ কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। আরও কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মুকুজ্জেমশাইকে অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল।

কি হ'ল তোমার ?

মনোরমা নীরব।

মুকুজ্জেমশাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ওঠ ওঠ, কি ব্যাপার সব খুলে বল তো ?

মনোরমা উঠিয়া বসিল এবং বেশবাস সম্বৃত করিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে পিছন ফিরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

হ'ল কি তোমার ? এ রকম করার মানে কি ?

মনোরমা খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া ক্রন্দনক... মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমি আর সহ্য করতে পারি না।

কি সহ্য করতে পার না ?

আপনার দয়া।

তার মানে ?

মনোরমা সহসা ঘুরিয়া বসিল। অশ্রুবাষ্পাকুল আরক্ত নয়ন দুইটি মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, আপনি কি মনে করেন আমি মানুষ নই, আমার প্রাণ ব'লে কোন জিনিস নেই, আপনি চিরকাল দয়া ক'রে যাবেন আর আমি তা চিরকাল সহ্য করব ? আপনার দয়া পাবার কি যোগ্যতা আছে আমার ? কেন শুধু শুধু আপনি এমন ক'রে চিরকাল আমার ভার ব'য়ে বেড়াবেন ? কাশীর একটা আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে কেন সকলের কাছে আত্মীয় ব'লে পরিচয় দেবেন, আপনার ওপর যখন সত্যিকার কোন দাবিই নেই আমার ?

কে বললে দাবি নেই ?

উৎসুক-নয়নে মনোরমা প্রশ্ন করিল, কিসের দাবি ?

প্রত্যেক মানুষের ওপরই প্রত্যেক মানুষের দাবি আছে।

কেন ?

কারণ মানুষ পশু নয়।

আপনি কি যেখানে যত অসহায় আছে, সকলকেই এমনই ক'রে সাহায্য করেন ?

ক্ষমতায় কুলোলে নিশ্চয়ই করতাম, সকলকে সাহায্য করবার ক্ষমতা আমার নেই।

মনোরমা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আরও কত লোক তো আছে, যারা আমার চেয়ে আপনার দয়া পাবার ঢের বেশি যোগ্য ? আপনি আমাকেই বা বেছে নিলেন কেন ?

কে যোগ্য, কে অযোগ্য, তা বিচার করবার অধিকার আমার নেই। যে আমার সামনে পড়ে, যথাসাধ্য তাঁরই উপকার করবার চেষ্টা করি। তখন কাশীতে ছিলুম, হঠাৎ একজনের মুখে তোমার খবর পেলুম, তোমার কাছে গিয়ে তোমার মুখে সমস্ত শুনে কষ্ট হ'ল, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে চাইলাম তুমিও স্বেচ্ছায় চ'লে এলে—এর বেশি তো আর কিছু নয়। তার পর থেকে আমি যথাসাধ্য তোমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছি।

মনোরমা চৌকি হইতে নামিয়া কাপড়-চোপড় আর একবার সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

কি সহ্য করতে পারছ না ?

বললাম তো, আপনার দয়া।

সহ্য করতে পারছ না কেন ?

কারণ আমি পশু নই,—মানুষ।

নিজের উত্তরটাই এমন তির্যকভাবে নিজের কাছে ফিরিয়া আসায় মুকুজ্জেমশাই ঈষৎ কৌতুক অনুভব করিলেন। কিন্তু বিস্মিত হইলেন যখন দেখিলেন, মনোরমা নিজের ছোট পুঁটলিটি লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে।

ও কি ? কোথায় যাচ্ছ ?

যেদিকে দু চক্ষু যায়, এমনভাবে কারও দয়ার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ম'রে যাওয়া ঢের ভাল।

মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না, স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

পর-মুহূর্তেই গুরুভার পতনের শব্দে সচকিত হইয়া মুকুজ্জেমশাই বাহিরে গিয়া দেখিলেন, মনোরমা সিঁড়ির উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন; অজ্ঞান মনোরমাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন।

গভীর রাত্রে মনোরমা চক্ষু মেলিয়া দেখিল, একজন অপরিচিতা নারী তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছে।

আপনি কে ?

আমি নার্স।

আপনি কি ক'রে এলেন ?

আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এসেছিলাম, তিনিই আমাকে রেখে গেছেন।

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, ওই যে সন্ন্যাসী মতন কে একজন ছিলেন, তিনিই ডেকেছিলেন ডাক্তারবাবুকে।

তিনি কোথায় ?

তিনি আপনার সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে কোথায় যেন গেলেন। কাল সকালে আসবেন ব'লে গেছেন। আপনি বেশি কথা বলবেন না, ডাক্তারবাবু নিষেধ ক'রে গেছেন।

মুকুজ্জেমশাই বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনোরমা নির্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া বলে—চাই না, চাই না, তোমার এত দয়া চাই না আমি।

কিন্তু সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

চুন্‌চুনের দিদি মিসেস স্যানিয়াল নাতিসাধারণ-প্রকৃতির মহিলা। বলিষ্ঠ চওড়া-চওড়া গড়ন, শক্তিব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, একটু লক্ষ্য করিলে গোঁফের রেখা পর্যন্ত দেখা যায়। মনোবৃত্তিও পুরুষভাবাপন্ন নির্ভীক বলিষ্ঠ। নারীসুলভ কমনীয়তা হয়তো তাঁহার এককালে ছিল, (না থাকিলে অধুনামৃত মিস্টার স্যানিয়াল কি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন?) এখন কিন্তু তাঁহার মধ্যে নারীসুলভ কোন প্রকার মাধুর্য নাই। শুধু তাহাই নহে, বর্তমানে তিনি মাধুর্যবিরোধী, রূপসজ্জার কোন প্রকার আতিশয্য সহ্য করিতে পারেন না। কমনীয়তা এবং মাধুর্য লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে গিয়াই যে আজকালকার মেয়েরা অধঃপাতে যাইতেছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। মিস্টার স্যানিয়াল পাঁচ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন এবং মিসেস স্যানিয়াল এই পাঁচ বৎসরকাল সাতিশয় দক্ষতার সহিত নানা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে নিজের সংসার-তরণীকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন কি নিজের দূরসম্পর্কের ভগ্নিনী চুন্‌চুনকে পর্যন্ত নিজের আশ্রয়ে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন। হাব-ভাব-বিলাসিনী প্রসাধন-কুশলা সাধারণ রমণী হইলে ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না—এ কথা প্রায়ই তিনি পরিচিত-মহলে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহার এত সাবধানতা সত্ত্বেও যে চুন্‌চুন লুকাইয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের সর্বসাবধানতা-উল্লঙ্ঘিনী দুষ্টা দক্ষতার প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নহে। আজকালকার ব্যাপার দেখিয়া মিসেস স্যানিয়ালের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সাবধানতার প্রাচীর যত উচ্চই হউক, আজকালকার মেয়েরা ঠিক তাহা ডিঙাইয়া যাইবে। মিসেস স্যানিয়াল প্রতিদিন কথায় কথায় ভগবানকে ধন্যবাদ দেন যে, ভগবান তাঁহাকে একটি মেয়েও দেন নাই, তাঁহার দুইটি সন্তানই পুত্র-সন্তান। মেয়েদের উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ, তাঁহার ধারণা, আজকাল মেয়েগুলাই সমাজটাকে উচ্ছন্ন দিতেছে। মেয়েরা আশকারা না দিলে পুরুষের সাধ্য কি অগ্রসর হয়! মেয়েদেরই কর্তব্য,

অবাঞ্ছিত পুরুষসংসর্গ সযত্নে পরিহার করিয়া চলা। আজকাল কি ছেলে কি মেয়ে কর্তব্যজ্ঞান কাহারও নাই। এই যে তিনি চুনুচুনকে মানুষ করিয়াছেন, তাহার লুকাইয়া-বিবাহ-করা স্বামীর চিকিৎসার যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন এবং সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও চুনচুনকে দূর করিয়া দেন নাই—সমস্তই কর্তব্যের খাতিরে। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা প্রবল। তিনি যে কর্তব্যপরায়ণা, সৎপথবর্তিনী এবং নিষ্কলুষা—এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা শুধু যে তাঁহার নিজ সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ, তাহা নহে; তিনি নারীজাতির উন্নতিকল্পে একটি নারী-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, পাড়ার বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রত্যহ বিনা-বেতনে এক ঘণ্টা অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, উপযুক্তপাত্রে যথাসাধ্য দান করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ নহেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া, তাহার বিপন্ন অবস্থা শুনিয়া এবং তাহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া মিসেস স্যানিয়াল তাঁহাকে নিজের ছেলেদের গৃহশিক্ষকরূপে বাহাল করিয়াছেন। তাঁহার একটি ছেলে এবার কলেজে ঢুকিয়াছে, আর একটি স্কুলে পড়ে। মিসেস স্যানিয়াল কিন্তু শঙ্করকে আকারে ইঙ্গিতে এই কথাটি বারম্বার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যেহেতু শঙ্কর একটা উচ্চ আদর্শের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে এবং যেহেতু তিনি চুনচুনের স্বামীর শুশ্রূষা-সম্পর্কে শঙ্করের উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন, সেই হেতুই তিনি শঙ্করকে নিজগৃহে স্থান দিতেছেন, অখিল-অনিলের জন্য গৃহশিক্ষকের তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ সৎ অথচ সমাজ-কর্তৃক-লাঞ্ছিত যুবককে সাহায্য করা যে কোন কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরই অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

শঙ্কর কিন্তু মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় আসিয়া ঠিক যেন দুইটি উপবাসী মৎকুনের পাল্লায় পড়িয়া গেল। অখিল-অনিলের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত তীব্র। তাহারা শঙ্করের বিদ্যাবুদ্ধিকে যেন দোহন করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বড় না মিল্‌টন বড়, অ্যালজ্যাব্রা শিখিয়া কি উপকার হয়, মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডলের চাপ কি পরিমাণ, মহিলা-কবি তরু দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা কোন্‌টি, জোনাকি আলো দেয় কি উপায়ে, একই মাটি হইতে রস আহরণ করিয়া বিভিন্ন গাছ

বিভিন্ন ফল ফোটায় ও ফল ফলায় কি করিয়া, দুধ এবং ডিমের মধ্যে কোন্‌টি বেশি পুষ্টিকর এবং কেন, মানস-সরোবরে নীলপদ্ম ফোটে কি না, ওয়াটারলু যুদ্ধে কোন্ পক্ষে কত সৈন্য ছিল—ইত্যাকার নানাবিধ জটিল প্রশ্নে তাহারা শঙ্করকে বিব্রত করিয়া তুলিল। এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সব সময় সহজ নয়, ছাত্রদের নিকট উত্তর দিতে অপারগ হইলেও কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতে হয়; সুতরাং উত্যক্ত শঙ্কর যথাসাধ্য তাহাদের এড়াইয়া চলিত, পারতপক্ষে বাড়িতে থাকিত না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই সঙ্গতিহীন অসহায় অবস্থায় আশ্রয় পাইয়া শঙ্কর কিছুতেই ইহাদের উপর কৃতজ্ঞ হইতে পারিল না। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়ের জ্ঞানস্পৃহা তাহাকে এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল, কোন রকমে কোথাও একটা চাকরি জুটিলে এই উচ্চাদর্শ-প্রণোদিত পরিবারের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সে যেন বাঁচে।

প্রুফ-রীডিং সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছে এবং প্রকাশবাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী মাসে তিনি তাঁহার জানা-শোনা একটি প্রেসে তাহাকে ঢুকাইয়া দিতে পারিবেন। মুকুজ্জেমশাই নামক ব্যক্তিটিও একদিন আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি তাহার চাকরির জন্য নানা স্থানে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং যত দিন একটা কিছু না জোটে, তত দিন নাকি করিতে থাকিবেন। সেদিন তিনি শঙ্করকে দিয়া চার-পাঁচটি দরখাস্তে সহি করাইয়া লইয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই শ্বশুরবাড়ি-সম্পর্কিত লোক। শ্বশুরবাড়ির তরফ হইতে কোন প্রকার সাহায্য লইতে তাহার আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হয়। যে আত্মসম্মানের জন্য সে পিতামাতার সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছে, সেই আত্মসম্মানকে খর্ব করিয়া সে শ্বশুরবাড়ির লোকের নিকট হইতে সাহায্য লইতে যাইবে কোন্ লজ্জায়? কাহারও নিকট সে কোন সাহায্য লইবে না, নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ের উপরই তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু এই মুকুজ্জেমশাইকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। লোকটি অদ্ভুত-প্রকৃতির, তাঁহার নাকি সংসারের কোন

বন্ধন নাই, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই উপকার করা নাকি তাঁহার পেশা। তিনি বিশেষ কাহারও নন—তিনি সকলের। শিরীষবাবুর সহিতও তাঁহার পরিচয় নাকি আকস্মিক।

শঙ্কর সেদিন যে দরখাস্তগুলিতে সহি করিয়াছিল, তাহার একটির ঠিকানা বোম্বাইয়ের একটি পোস্ট বক্স। একটা বাংলা মাসিক পত্রিকার জন্য একজন সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। বোম্বাই শহরে কে বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছে? সুরমার কথা শঙ্করের মনে পড়িল। সুরমার চিঠি অনেকদিন পায় নাই, উৎপলও বহুদিন পূর্বে চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছে। আর কিছুদিন পূর্বে হইলে শঙ্কর হয়তো সুরমাকে পত্র লিখিত, কিন্তু এখন আর লিখিতে ইচ্ছা হইল না। একদা যে সুরমা তাহার মার্জিত রুচি, সংযত অথচ সাবলীল সৌন্দর্য দিয়া তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল, সে সুরমা অহরহ নিকটে থাকিলে হয়তো শঙ্করের মানসলোকে বিপর্যয় ঘটাইতে পারিত; কিন্তু সুরমা দূরে চলিয়া গিয়াছে, অন্তরাল ধীরে ধীরে আপন অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিস্মৃতির কুহেলিকায় সুরমা কখন যে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, শঙ্কর তাহা বুঝিতেও পারে নাই। দরখাস্ত-প্রসঙ্গে তাহার কথা মনে পড়িল বটে, কিন্তু চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইল না।

এখন শঙ্করের মানসলোক জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে আর একজন—অমিয়া নয়, চুন্‌চুন্। মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে আসিয়া এবং চুন্‌চুনের সান্নিধ্য লাভ করিয়া শঙ্কর চুন্‌চুনের ঘনিষ্ঠতর যে পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতে সে আরও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত মেয়ে, কিছুতেই বিচলিত হয় না। মিসেস স্যানিয়ালের গৃহের যাবতীয় কর্ম চুন্‌চুন একাই করে, কিন্তু এমন নীরবে এবং এমন হাসিমুখে করে যে, শঙ্কর অবাক হইয়া যায়। কর্তব্যপরায়ণা নিজুবা মিসেস স্যানিয়াল চুন্‌চুনের দুষ্কৃতির জন্য কথায় কথায় তাহাকে শ্লেষাত্মক উপদেশ দেন, মিসেস স্যানিয়ালের পুত্র দুইটি যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ফাই-ফরমাশ করিয়া করিয়া একদণ্ড চুন্‌চুনকে স্থির থাকিতে দেয় না, মিসেস স্যানিয়ালের দূর-সম্পর্কের অপুত্রক বিপত্নীক দেবর পীতাম্বরবাবু প্রত্যহ

সন্ধ্যাবেলা আসিয়া একমুখ কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ি ও ভ্রূ লইয়া একদৃষ্টে চুন্‌চুনের দিকে চাহিয়া থাকেন (এবং মিসেস স্যানিয়ালের সহিত কর্তব্যদ্যোতক সদালাপ করেন); কিন্তু চুন্‌চুন এতটুকু বিরক্ত বা বিচলিত হয় না। ইহাদের সহিত অকারণ বাদানুবাদ করিয়া নিজের আত্মমর্যাদা নষ্ট করে না, মুখে অসহায় ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে না, নীরবে হাসিমুখে সমস্ত সহ্য করে। শঙ্কর অবাক হইয়া যায়। তাহার মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই স্মিতমুখী শান্ত মেয়েটির মনের মধ্যে আর একজন চুন্‌চুন বাস করে, তাহার লক্ষ্য স্থির আছে এবং সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য অনিবার্য সুনিশ্চিত গতিতে সে পথ অতিবাহন করিতেছে। বাহিরে অকারণে আত্মপ্রকাশ করিয়া সে বিব্রত হইতে চাহে না, বাহিরের জগৎকে ফাঁকি দিবার জন্যই সে বাহিরের জগতে অনাড়ম্বরে অতিশয় সাধারণ বেশে থাকে। আসলে সে অসাধারণ, আসলে সে বিদ্রোহিনী, প্রেমের জন্যই প্রেমাস্পদকে বরণ করে,—সামাজিক বা আর্থিক কারণে নয়। যতীন হাজরার যক্ষ্মাবিধ্বস্ত মুখচ্ছবি শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে পড়ে। চুন্‌চুনের প্রতি সমস্ত মন শ্রদ্ধায় অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইচ্ছা করে, ওই রহস্যময়ীর অন্তরের রহস্যালোকে প্রবেশ করিয়া দিশাহারা হইয়া যায়।

শঙ্কর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে চুন্‌চুনের কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—

একখানা প্রকাণ্ড নীল রঙের মোটর সহসা শঙ্করের পাশেই থামিয়া গেল। মোটরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল শৈল।

শঙ্করদা, কোথায় চলেছ?

শৈল!

তবু ভাল, চিনতে পেরেছ।

চিনতে পারব না, বলিস কি?

কোথায় যাচ্ছ তুমি?

কোথাও না, এমনই হাঁটছি।

আমার সঙ্গে একটু মার্কেটে চল তা হ'লে। অনেক জিনিস কিনতে হবে, তুমি পছন্দ ক'রে দেবে।

তার মানে?

লক্ষ্মীটি, চল।

শৈল দ্বার খুলিয়া আহ্বান করিল, শঙ্কর 'না' বলিতে পারিল না।

ঘণ্টা-দুই পরে নানা রঙের শাড়ি, জামা, উল, ছিট, বাসন, টী-সেট এবং টুকিটাকি আরও নানাবিধ জিনিস কিনিয়া শঙ্করকে লইয়া শৈল বাড়ি ফিরিল। মিস্টার বোস বাড়িতে ছিলেন না। তিনি সম্প্রতি যে পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহাতে ক্রমাগত ট্যুর করিয়া বেড়াইতে হয়। তিনি ট্যুরে বাহিরে ছিলেন।

শঙ্কর বলিল, এবার আমি যাই।

এখনই যাবে কি! সে হবে না, ওপরে চল, কিছুই তো কথা হ'ল না।

শঙ্করকে উপরে যাইতে হইল।

উপরে গিয়া শৈল বলিল, এখনও তো আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয় নি।

কি কথা?

বউ কেমন হ'ল?

শঙ্কর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, কার বউ?

তোমার, তোমার গো, লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ভেবেছ, কেউ টের পায় নি বুঝি? সব জানি আমি।

শঙ্কর বুঝিল, আর লুকাইবার উপায় নাই।

কাউকে জানাই নি, তুই খবর পেলি কি ক'রে?

কুসুমি চিঠি লিখেছে। কুসুমিকে মনে পড়ে?

বিদ্যুৎঝলকের মত শঙ্করের মনে কুসুমির মুখখানা ফুটিয়া উঠিল। কুসুম শৈলর বাল্যসখী। শৈলর সঙ্গে প্রায় তাহাদের বাড়িতে আসিত, শঙ্করকে

দেখিলেই মুচকি হাসিয়া ছুটিয়া পলাইত। কুসুমের কচি মুখখানা তাহার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

কুসুমি খবর পেলে কি ক'রে?

সে কপাল পুড়িয়ে বিধবা হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে যে। তোমাদের বাড়ি থেকেই খবর পেয়েছে। তুমি নাকি জ্যাঠামশাইয়ের অমতে বিয়ে করেছ?

হ্যাঁ।

কেন, অমিয়াকে খুব বেশি মনে ধরেছিল?

বড্ড।

উভয়েই মুচকি হাসিয়া পরস্পরের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্কর হাসিয়া বলিল, বিয়ের আগে তাকে আমি দেখিই নি।

তবে?

বিয়ে করবারই ইচ্ছে ছিল না আমার, কিন্তু বাবা যখন পণের জন্যে আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে দর-কষাকষি শুরু ক'রে দিলেন, তখন আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে গেল। রোখের মাথায় ঠিক ক'রে ফেললুম যে, বিনাপণে ওইখানেই বিয়ে করব।

শৈল ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

তাই করলুম।

জ্যাঠামশাই কি করলেন?

কি আর করবেন, রেগে আমার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রে দিলেন।

ও মা, তাই নাকি? তারপর?—উৎকণ্ঠায় শৈলর দুইটি চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তুমি এখন কি করছ তা হ'লে?

শঙ্কর গম্ভীরভাবে মিথ্যা কথা বলিল, চাকরি করছি।

কোথায়?

একটা আপিসে।

কোথা থাক ?

একটা মেসে।

কোন্ মেসে, ঠিকানাটা বল না ?

কিছুদিন আগে শঙ্কর যে মেসটাতে ছিল, তাহার ঠিকানা বলিয়া দিল। শৈল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একবার তাহার ইচ্ছা হইল, শঙ্করকে বলে, এখানে আসিয়া থাকিতে; কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ হইল, একটু ভয়ও হইল, বলিতে পারিল না। বেয়ারা মোটর হইতে জিনিসগুলি নামাইয়া আনিয়াছিল, বাহির হইতে প্রশ্ন করিল, এগুলো কোন্ ঘরে রাখব মা ?

এখানেই নিয়ে আয়।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

শৈল বলিল, ওমা, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। দাদা যে বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। চিঠিপত্র পাও নি তুমি ?

না। কতদিন ফিরেছে ?

তা প্রায় মাস-দুই হবে। বম্বেতেই শুনছি থাকবে, কি একটা ব্যবসা করবে নাকি, শ্বশুর টাকা দিচ্ছে, শ্বশুর খুব বড়লোক তো।

ও।

শঙ্কর আর কিছু বলিল না। সুরমার কথা একবার মনে হইল, উৎপলের মুখটাও মনের মধ্যে একবার উঁকি দিয়া গেল, কিন্তু মনে তেমন কোন সাড়া জাগিল না। কিছুদিন আগে তাহার যে মন উৎপল এবং সুরমাকে লইয়া মাতিয়াছিল, সে মন আর নাই। নূতন মন নূতন জগতে নূতন প্রেরণায় নূতন স্বপ্ন দেখিতেছে। দুইটি ভৃত্য ও বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং জিনিসগুলি টেবিলে সাজাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর ইতিপূর্বে একবার বলিয়াছিল, আবার বলিল, অনর্থক এতগুলো টাকা খরচ করলি তুই।

অনর্থক কেন ?

শাড়ি, বাসন, টী সেট নিশ্চয়ই তোর যথেষ্ট আছে, তবু কি দরকার ছিল আবার কেনবার ?

কি নিয়ে থাকব তা না হ'লে ? ওদের নেড়ে-চেড়েই তো সময় কাটে। আঃ, চুলে দুলটা আটকে গেল, ছাড়িয়ে দাও না শঙ্করদা।

ছাড়াইয়া দিতে দিতে শঙ্কর বলিল, শাড়ি নেড়ে তোর সময় কাটে ? কি যে বাজে কথা বলিস !

সত্যি বলছি।

গান-বাজনা শিখছিলি যে ?

শিখেছি কিছু কিছু, শোনাব কাকে, ঘরের দেওয়ালকে ? সেইজন্যে আর ভাল লাগে না ওসব।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল।

শঙ্কর বলিল, এবার আমি যাই, আমার কাজ আছে।

কাজ, কাজ, কাজ—সবারই খালি কাজ।

একটু অস্বাভাবিক ঝাঁজের সহিত কথাগু' বলিয়া ফেলিয়া ঝাঁজটাকে মোলায়েম করিবার জন্য শৈল হাসিল।

কাজ না করলে চলে কই ?

না, তোমাকে এখন আমি যেতে দেব না, অনেকক্ষণ থাকতে হবে এখানে, তোমার সেই কবিতাগুলো তোমার মুখে শুনব আবার।

কোন্ কবিতাগুলো ?

সেই যেগুলো ইস্কুলে লিখেছিলে।

সেগুলো কোথায় ?

আমার কাছে আছে। খাতাখানা চুরি করেছিলাম, মনে নেই ? বার ক'রে আনি, থাম—তুমি বিছানার ওপর ভাল ক'রে ব'স !

একরূপ জোর করিয়া শঙ্করকে বিছানার উপর বসাইয়া শৈল বাহির হইয়া গেল এবং কয়েক মিনিট পরে জীর্ণ-মলাট একখানা খাতা আনিয়া শঙ্করের হাতে দিয়া বলিল, পড়।

নিজের লেখা সমঝদার শ্রোতাকে পড়িয়া শোনাইবার দুর্দমনীয় বাসনা শঙ্করের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল ; তবু সে বলিল, সত্যি বলছি, আমার কাজ আছে এখন।

লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি, এখনই চ'লে যেও না। চা আনতে বলছি, চা খেয়ে যেও, ততক্ষণ পড় না একটু, শুনি—বড্ড একগুঁয়ে তুমি শঙ্করদা।

শৈল ঠোঁট উল্টাইয়া অভিমান করিল। শঙ্করের সেই বহুদিন আগেকার কিশোরী শৈলকে মনে পড়িল, সে-ও ঠিক এমনই করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া কথায় কথায় মুখ ভার করিত।

দুই ঘণ্টা পরে শঙ্কর যখন শৈলর বাড়ি হইতে বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কবিতার খাতাটা সমস্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শৈল তাহাকে ছাড়ে নাই। শৈলর শেষ কথাগুলি শঙ্করের কানে বাজিতেছিল—মাঝে মাঝে তুমি এসো শঙ্করদা, আমার বড্ড একা একা লাগে। আর বাজিতেছিল শৈলর প্রশ্নটা—বউ কেমন হয়েছে সত্যি বল না, নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ; রঙ কেমন, আমার চেয়েও ফরসা ?

আসিবার সময় শৈল একটা কাগজে মুড়িয়া নূতন কেনা একখানা দামী শাড়ি অমিয়ার জন্য দিয়াছে। উপহার। শৈল কিছুতেই ছাড়িল না, শঙ্করকে লইতে হইল। প্যাকেটটা বগলে করিয়া শঙ্কর ধর্মতলার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পাশের বারান্দায় সজ্জিত পুরাতন পুস্তকগুলি শঙ্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে সরিয়া গিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। কি চমৎকার চমৎকার সব বই ! লুব্ধ আগ্রহে সে বই বাছিয়া সাজাইতে লাগিল। এসব বই সে কোনদিন পড়িবে কি না, পড়িবার সময় পাইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিল না। একগাদা বই বাছিয়া ফেলিল।

আরও ঘণ্টা-খানেক পরে শঙ্কর যখন বাসায় ফিরিল, তখন তাহার বগলে একগাদা বই, কিন্তু শাড়ির প্যাকেটটি নাই। অর্ধ মূল্যে শাড়িটি বিক্রয় করিয়া সে বইগুলি কিনিয়া আনিয়াছে।

আরও খানিকক্ষণ পরে স্তূপীকৃত বইগুলি সামনে রাখিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শাড়িখানা বিক্রয় করিয়া তাহার মনটা যেন অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিল। শৈল যদি জানিতে পারে, কি মনে করিবে? অমিয়া শুনিলেই বা কি ভাবিবে?

চুনচুন আসিয়া প্রবেশ করিল।

এত বই কোথা থেকে আনলেন?

কিনে আনলাম।

কেন?

পড়ব।

চুনচুনের দৃষ্টিতে বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

শঙ্করের মনের গ্লানিটুকু কাটিয়া গেল।

২৩

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

নিজের শূন্য ঘরে বেলা মল্লিক একা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ঘরের বাহির হইতে সাহস হইতেছিল না। সকাল হইতে একটা বদখত চেহারার লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। এখনও লোকটা গলির মোড়ে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই বসিয়া আছে। বিগত কয়েক দিনে জানালার ভিতর দিয়া আরও অশ্লীল চিঠি ও চিত্র আসিয়াছে। জনার্দন সিং চলিয়া যাইবার পর অন্য কোন চাকরও যোগাড় করা সম্ভবপর হয় নাই। কয়েক দিন হইতে অবিরত চেষ্টা করিয়াও একটা চাকর জোটে নাই, মনে হইতেছে, ষড়যন্ত্র করিয়াই সকলে যেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। শূন্য ঘরে একা বসিয়া বেলার নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে হইতেছিল। দ্বারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

বেলা দেবী তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কে?

মিহি গলায় উত্তর আসিল, আমি অপূর্ব।

ও, অপূর্ববাবু! আসুন আসুন।

অপূর্ববাবুর মত লোক আসাতেও বেলা যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বার খুলিয়া দিতেই এসেন্সের গন্ধ ছড়াইয়া, পাউডার-মণ্ডিত মুখে মৃদুহাস্য বিকীর্ণ করিতে করিতে সঙ্কুচিত বিনীত অপূর্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে সবুজ রঙের জরিদার নাগরা, পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি। চক্ষু দুইটি কিন্তু গর্তস্থ। মুখের মধ্যে কেবল গালের হাড় দুইটি এবং দাঁতগুলি প্রবলভাবে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করিতেছে।

স্মিতহাস্যে নমস্কার করিয়া বেলা বলিলেন, আসুন, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে যে, অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, কিছুদিন থেকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগছি।

অপূর্ববাবুর মুখভাব করুণ হইয়া উঠিল।

আসুন, এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল যে!

আমি কতবার এসে ফিরে গেছি, আপনার দেখাই পাই না।

তাই নাকি?

যখনই এসেছি, আপনার ওই গোঁফ-ওলা দারোয়ান এক কথায় আমাকে বিদেয় ক'রে দিয়েছে। আজ তো তাকে দেখতে পেলুম না! মানে—লোকটা একটু যেন—

অপূর্ববাবু থামিয়া গেলেন। পকেট হইতে ফিনফিনে পাতলা রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে গোঁফ-ওয়ালা দারোয়ানটির সম্বন্ধে সত্য অথচ অরূঢ় কি বলিবেন, নির্ণয় করিতে গিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

বেলা দেবীই প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন।

হ্যাঁ, লোকটা একটু রাফ-গোছের ছিল, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি আমি। ছাড়িয়ে দিয়েও কিন্তু মুশকিলে পড়েছি, একটা দারোয়ান না হ'লে চলছে না। একটা ভাল লোক পেলে এখুনি বাহাল করি।

আকস্মিক পুলকোচ্ছ্বাসে অপূর্ববাবুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আসিবার

সঙ্গে সঙ্গেই বেলা দেবীর এমন একটা উপকারে লাগিতে পারিবেন, ইহা যে অভাবনীয় ব্যাপার!

আজই তাঁহার আপিসের নেপালী দারোয়ানটা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিল, দেশ হইতে তাহার ভাই আসিয়াছে, অপূর্ববাবু যদি তাহাকে কোথাও লাগাইয়া দিতে পারেন, বড় উপকৃত হয় সে।

আছে আপনার সন্ধানে কোন লোক?

আর একবার রুমালে মুখ মুছিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, নেপালী রাখবেন?

কেন রাখব না, যদি বিশ্বাসী হয়?

আমার জানাশোনা একটি নেপালী আছে। ঠিক জানাশোনা নয়, মানে—আমাদের আপিসের যে নেপালী দারোয়ানটা আছে, তারই ভাই—তাকে আমি পার্‌সোনালি অবশ্য—তবে যতদূর মনে হয়—মানে, যদি বলেন, আমি নিজে গিয়ে, অর্থাৎ—

নিজের অসংলগ্ন বাক্যজালে বিজড়িত হইয়া অপূর্ববাবু থামিয়া গেলেন।

বেলা প্রশ্ন করিলেন, কোথা থাকে সে?

বড়বাজারে।

তার বাসাটা চেনেন আপনি?

চিনি।

তা হ'লে চলুন, এখনই গিয়ে ডেকে আনা যাক তাকে।

এখনই?

হ্যাঁ, এখনই—আজই বাহাল করব। একা এমন অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে ভয় করে।

এখান থেকে এখন বড়বাজার যাওয়া মানে—

নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া অপূর্ববাবু পুনরায় বলিলেন, মানে নটা বেজে গেছে কিনা, যেতে আসতে প্রায়—

চলুনা না, ট্যাক্সি ক'রে যাই।

বেলার সহিত ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসিয়া যাওয়াটা যদিও লোভনীয়

ব্যাপার, কিন্তু ভাড়াও তো কম লাগিবে না! বেলা যদি নিজে হইতে ভাড়াটা না দেন, তাঁহার কাছে ভাড়াটা দাবি করাও তো শোভন হইবে না! তুচ্ছ এই দুর্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া অকারণে চার-পাঁচটা টাকা ব্যয় করা— অপূর্বকৃষ্ণ পালিত ফাঁপরে পড়িয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

কি, ভাবছেন কি?

ভাবছি, এখন কেন ট্যাক্সি ক'রে হাঙ্গামা করতে যাবেন, মানে—টুমরো আমি পজিটিভ্লি—কথা দিচ্ছি আপনাকে—

সহসা বেলার নজরে পড়িল, ওদিকের জানালাটা হইতে একটা ছায়ামূর্তি যেন সরিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। গলির মোড়ের সেই লোকটার কথাও বেলার মনে হইল।

বেলা বলিলেন, না, আজ রাত্রেই আমার একজন লোক চাই। ডাকুন একটা ট্যাক্সিই।

ট্যাক্সি, মানে—

অপূর্ববাবু পুনরায় ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

বেলা বলিলেন, আশ্চর্য লোক তো আপনি! আমি ভাড়া দেব, আপনি ইতস্তত করছেন কেন?

না না, ভাড়ার কথা নয়, মানে—দেখি, কটা টাকা আছে আমার কাছে।

অপূর্ববাবু পকেটে হাত দিয়া মনিব্যাগ হাতড়াইতে লাগিলেন।

আপনি ভাড়া দিতে যাবেন কেন? কি মুশকিল! যান, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসুন।

বেশ, তাই যাই।

বাধ্য বালকের মত অপূর্বকৃষ্ণ যাইতে উদ্যত হইলেন। বেলার হঠাৎ লোকটার প্রতি অনুকম্পা হইল। ভদ্রলোক আসিতে না আসিতে তাঁহাকে এমন করিয়া ফরমাশ করাটা অনুচিত হইতেছে।

একটু চা খাবেন? চা খেয়ে বরং যান। আসুন, একটু চা-ই করা যাক

আগে, আমারও আজ বিকেলে চা খাওয়া হয় নি, চা-টা খেয়ে তারপর বেরুনো যাবে।

চা-পানান্তে কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর ট্যাক্সি খুঁজিতে বাহির হইয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। বেলা দেবী যদি চায়ের হাঙ্গামাটা না তুলিতেন, তাহা হইলে হয়তো অচিনবাবু-নিয়োজিত চরটি অচিনবাবু-নিয়োজিত ট্যাক্সিখানি ঠিক গলির মোড়টিতে আনিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার সুযোগ পাইত না।

অপূর্ববাবু বাহির হইয়া দেখিলেন, গলির ঠিক মোড়েই একটি ভাল সিডান-বডি ট্যাক্সি রহিয়াছে, ডাকিবামাত্রই হর্ন দিতে দিতে সেটি অবিলম্বে আগাইয়া আসিল। বিগত কয়েক দিবস হইতে বেলা দেবীকে কোন উপায়ে আরোহীরূপে পাইবার জন্য ট্যাক্সিখানি অচিনবাবু কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আশেপাশে অপেক্ষা করিতেছিল।

বেলা দেবীর গতি-বিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, তাঁহার ঘরে অশ্লীল চিঠি ছবি ফেলিয়া উত্যক্ত করিবার জন্য এবং তাঁহার ঘরের আনাচে-কানাচে আড়ি পাতিবার জন্য একটি চরও অচিনবাবু নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ট্যাক্সির প্রয়োজন হইতে পারে শুনিবামাত্র চরটি গিয়া ট্যাক্সিখানাকে ডাকিয়া আনিয়া মোড়ে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল।

বেলা দেবী এবং অপূর্বকৃষ্ণ পালিত ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া বলিলেন, চল, বড়বাজার।

অপূর্ববাবু বেলার সন্নিকটে ঘেঁষিয়া বসিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, পিয়ানোর সেতারের এস্রাজের অনেক ভাল গৎ যোগাড় করেছি, অনেক দিন থেকে দেব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে উঠছে না, মানে—

আজ আনলেই পারতেন।

আজও যে আপনার দেখা পাব, তা আশা করি নি। তা ছাড়া—

মোটর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

অপূর্ববাবু এবং বেলা দেবী কেহই লক্ষ্য করিলেন না যে, গাড়ি বড়বাজার অভিমুখে যাইতেছে না। সিডান-বডি গাড়ির অভ্যন্তরে তাঁহারা কথোপকথনে অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ দ্রুতগতিতে চলিবার পর গাড়িখানা সহসা থামিয়া গেল।

ড্রাইভার বলিল, আপনারা নামুন, গাড়ির তেল ক'মে গেছে। আমি আর একখানা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি আপনাদের মোড় থেকে।

অপূর্ববাবু বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, সে কি! তেল ফুরিয়ে গেছে, মানে, আগেই তোমার—

এরূপ একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়াছেন বলিয়া অপূর্ববাবু নিজেই নিজের কাছে অপরাধী হইয়া পড়িলেন এবং মুখভাবে তাহা ব্যক্ত করিলেন।

বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন, এক পয়সা ভাড়া দেব না তোমাকে।

এ সংবাদে ড্রাইভার বিচলিত হইল না, অ্যাল্‌বার্ট টেরিতে একবার হাত বুলাইল, বুক-খোলা জামার পকেট হইতে সুদৃশ্য একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল এবং একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, বেশ, তাই যদি আপনার ধর্ম্মো হয়, দেবেন না। এখন আমার গাড়িটা ছেড়ে দিন দয়া ক'রে।

নামিতেই হইল।

ড্রাইভার ভাড়ার জন্য অধিক জেদ না করিয়া গম্ভীরমুখে গাড়ি হাঁকাইয়া গলিটা হইতে বাহির হইয়া গেল। ভয়ঙ্কর অন্ধকার গলি। কলিকাতা শহরেও যে এমন একটা অন্ধকার গলি থাকিতে পারে, তাহা ধারণা করা শক্ত।

বেলা বলিলেন, চলুন, হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যাক, তারপর সেখান থেকে ট্যাক্সি নিলেই হবে।

বেশ, তাই চলুন। উঃ, কি ভীষণ অন্ধকার!

অন্ধকার গলিটার দুই পাশের বাড়িগুলা বিরাটকায় জন্তুর মত মনে

হইতেছে। কোন বাড়িতে যে কোন লোক আছে মনে হয় না, চারিদিক নিস্তব্ধ।

অন্ধকারে দুইজনে কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, গলিটা আঁকিয়া বাঁকিয়া কতদূরে গিয়া বড়রাস্তায় পড়িয়াছে, কে জানে! খানিক দূরে গিয়া একটা বাঁক ফিরিতেই দেখা গেল, হেলিয়া-পড়া একটা থামের উপর একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিতেছে।

অপূর্ববাবু বলিলেন, যাক, বাঁচা গেল, তবু একটা আলো পাওয়া গেল, মানে—অন্ধকারে যেন ক্রমশ, ঠিক ভয় নয়, একটু যেন গা-ছমছমের মত—

অপূর্ব কথা শেষ করিতে পারিলেন না। আচম্বিতে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পাশের আর একটা ক্ষুদ্রতর গলি হইতে বলিষ্ঠ একটা লোক ছুটিয়া আসিল এবং অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে জাপটাইয়া ধরিয়া ভূশায়ী করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের কয়েকটা বাড়ির কপাট খুলিয়া গেল, দুই-একটা ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ভূপতিত অপূর্বকৃষ্ণকে ঘিরিয়া একটা ছোটলোকের জনতা কলরব শুরু করিয়া দিল। ঘটনাটার আকস্মিকতায় বেলা দেবী ক্ষণিকের জন্য দিশাহারা হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ক্ষণপরেই আত্মস্থ হইয়া আগাইয়া গেলেন এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশের ভঙ্গীতে বলিলেন, এই, এই, ছেড়ে দাও ওঁকে, উনি চোর নন।

জনতা হইতে কে একজন বলিল, ইস্, ভারি দরদ যে দেখছি!

আর একজন ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে সায় দিল, হ্যাঁ, পীরিত একেবারে উথলে পড়ছে!

বেলার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গেলেন এবং ভিড়ের মধ্যস্থলে গিয়া দেখিলেন, বলিষ্ঠ গুণ্ডাটা অপূর্ববাবুর উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

এই, কি করছ? ওঠ, ওঠ বলছি, ছেড়ে দাও ওঁকে।

গুণ্ডাটা ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, ছেড়ে দেব কি ঠাকরুণ। আমার ঘড়ি চুরি ক'রে ভাগছিল শালা, ওকে আমি ছেড়ে দেব?

কই তোমার ঘড়ি?

এই যে, ত্যাখেন না—শালার পকেট থেকে টান মেরে বার করলাম।

রূপার চেনসুদ্ধ একটা নিকেলের ঘড়ি সে তুলিয়া দেখাইল।

ও ঘড়ি ওঁর কাছে ছিল না। শিগগির ওঠ বলছি তুমি।

মজা ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া জনতার ভিতর হইতে রোগা-গোছের এক ছোকরা আনন্দাতিশয্যে মুখের ভিতর আঙুল পুরিয়া সিটি দিল।

আর একজন বলিল, নাঃ, এমন পীরিত মাইরি নাটক-নভেলেও দেখা যায় না।

ফতুয়া-পরা প্রৌঢ়-গোছের একজন ভদ্রলোক বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি, এই মাগীকে সুদ্ধু নিয়ে ওই ব্যাটাকে টানতে টানতে থানায় যাও। ছি ছি ছি ছি! ভদ্রলোকের পোশাক প'রে যত ব্যাটা ছিঁচকে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরছে আজকাল! কালে কালে কতই যে দেখব বাবা!

একটি দ্বিতল বাড়ির জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া একটি যুবকও সবিস্ময়ে সব দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল। বেলা দৃপ্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ওকে ছাড়বে কি না?

জনতার ভিতর হইতে উত্তর আসিল, মাইরি আর কি!

এমন সময় একটা মোটরের হেড-লাইট পড়িয়া সমস্ত স্থানটা আলোকিত হইয়া উঠিল। মোটরখানি নিঃশব্দ-গতিতে আসিয়া হর্ন দিয়া জনতার মুখে থামিয়া গেল, অচিনবাবু স্টিয়ারিং ছাড়িয়া মোটর হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্ব আয়োজন অনুযায়ী পটভূমিকা ঠিক প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার স্বকীয় ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইলেন।

অতীব বিস্মিতকণ্ঠে ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, এ কি, মিস্ মল্লিক নাকি, আপনি হঠাৎ এখানে? বাই জোভ!

বেলা মল্লিক যেন অকূলে কূল দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আপনি অপূর্ববাবুকে উদ্ধার করুন আগে।

নিশ্চয়।

অচিনবাবু রুষ্ট ভঙ্গীতে আগাইয়া গিয়া গুণ্ডাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন এবং তাহাতে ঠিক যেন জাদুমন্ত্রের মত কাজ হইল। গুণ্ডাটা হঠাৎ অপূর্ববাবুকে ছাড়িয়া দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গলিটার মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। লোকটার অভিনয়দক্ষতায় অচিনবাবু সন্তুষ্ট হইলেন। বেলা দেবী লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইতেন, অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি হইতে একটা চাপা কৌতুকের হাসি উপচাইয়া পড়িতেছে। গুণ্ডাটা পলায়ন করিতেই বেলা পুনরায় অপূর্ববাবুর কাছে গেলেন, দেখিলেন, মূর্ছিত অপূর্ববাবুর নিস্পন্দ দেহটা ধূলায় লুটাইতেছে; আদ্দির পাঞ্জাবি ছিন্ন, নাগরা পদচ্যুত হইয়াছে। অপূর্ববাবুর সংজ্ঞাহীন দেহটার উপর ঝুঁকিয়া বেলা ডাকিতে লাগিলেন, অপূর্ববাবু, অপূর্ববাবু, ও অপূর্ববাবু!

অপূর্ববাবুর তবু জ্ঞান হয় না। অচিনবাবু তখন অপূর্ববাবুর দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিলেন, ঝাঁকানি খাইয়া তাঁহার জ্ঞান হইল, এবং জ্ঞান হইতেই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মিস মল্লিক—অ্যাঁ—আমি কোথায়—মিস মল্লিক—আমি—আপনি—

প্রিয়নাথ মল্লিক মোটরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া ভগ্নীর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করিতেছিলেন। অচিনবাবু তো তাহা হইলে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। অচিনবাবু আজকাল প্রায় প্রতিদিনই বলিতেছেন যে, শুধু শঙ্কর নয়, বেলার আজকাল নিত্য নূতন বন্ধু জুটিতেছে। আজ একটু আগেই অচিনবাবু প্রিয়নাথবাবুকে বলিয়াছিলেন, মিস মল্লিকের পুরানো গানের মাস্টারের সঙ্গে আজকাল খুব মাখামাখি। আমার এক চর এসে খবর দিলে, এখনই ওঁরা ট্যাক্সি ক'রে বেলগাছিয়া অঞ্চলে এক এঁদো আড্ডায় যাবেন ঠিক করেছেন। শুনে আমার রাগ হয়ে গেল মশাই; আমি একটা গুণ্ডা ঠিক করেছি,

অপূর্ববাবুকে ধ'রে বেশ ক'রে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দেয় যেন। এই সময় আমরাও চলুন যাই, মিস মল্লিককে পাকড়াও ক'রে আনা যাক যদি পারি। যায় বুঝলেন না, এ একটা মস্ত সুযোগ।

সত্যই তো, অপূর্ববাবুর সঙ্গে বেলা বেলগাছিয়ায় এই অন্ধকার গলিটায় আসিয়াছে! এখানে আসিবার তাহার কি কারণ থাকিতে পারে? ক্রুদ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রিয়নাথ বেলার আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বেলা অপূর্ববাবুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে সান্ত্বনা দিতেছিলেন।

না না, ভয় কি আপনার। চলুন, উঠুন, এই যে নিন, জুতো পায়ে দিন।

প্রিয়নাথের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল।

গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তিনি বলিয়া বসিলেন, ঢের হয়েছে, আর সোহাগ জানাতে হবে না। বদমায়েস পাজি কোথাকার!

অগ্রজের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বেলা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু বিচলিত হইলেন না। অন্তত বাহিরে তাহার কোন অভিব্যক্তি দেখা গেল না। তিনি প্রিয়নাথের দিকে একবার মাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহার পর তাঁহার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অপূর্ববাবুকে বলিলেন, উঠুন, এই নিন, আমার কাঁধে হাত দিন।

প্রিয়নাথের চক্ষু দুইটি হিংস্র হইয়া উঠিল। স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া শ্বাপদের মত দন্ত প্রদর্শন করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বিচ, বিচ, এ কমান বিচ! কুকুরেরও অধম!

বেলা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

অচিনবাবু কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। এই লোকটা সব মাটি করিল। এত করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া আনিলেন যে, বেলা মোটরে উঠার আগে কিছুতেই তিনি যেন আত্মপ্রকাশ না করেন। আত্মপ্রকাশ করিলে বেলা হয়তো মোটরে উঠিতেই চাহিবেন না। বেলাকে মোটরে উঠাইয়া

স্টার্ট দিয়া তবে আত্মপ্রকাশ করিলেই চলিত। সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল। অচিনবাবুর প্ল্যান ছিল. অপূর্ববাবুকে পৌঁছাইয়া দিয়া বেলা এবং বেলার দাদাকে লইয়া তিনি সোজা বাহির হইয়া যাইবেন। বেলার দাদাকে বলিবেন যে, তাঁহার একটু কাজ আছে, কাজটুকু সারিয়া তিনি তাঁহাকে এবং বেলাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। কলিকাতার বাহিরে কয়েকজন গুণ্ডা এবং একটা ট্যাক্সি তিনি ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলেন। বন্দোবস্ত ছিল যে, বেলা এবং বেলার দাদাকে লইয়া একটি জনবিরল মাঠের কাছাকাছি তিনি মোটর থামাইবেন এবং কাজের ছুতায় নামিয়া গিয়া গুণ্ডাগুলিকে খবর দিবেন। তাহারা অচিনবাবুর অনুপস্থিতিতে আসিয়া বেলাকে হরণ করিবে এবং বেলার দাদাকে অচিনবাবুর মোটরে হাত পা মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যাইবে। প্রিয়নাথের চোখের সম্মুখে গুণ্ডা কর্তৃক বেলা অপহৃত হইলে এবং পরে অচিনবাবু আসিয়া প্রিয়নাথকে উদ্ধার করিলে অচিনবাবুর সহিত বেলা-অপহরণের যে কোন সংস্রব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কার করা শক্ত হইবে। কিন্তু প্রিয়নাথ সহসা আত্মপ্রকাশ করাতে সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল।

বেলার কাঁধে ভর দিয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অচিনবাবু সহাস্য মুখে সহৃদয় ভঙ্গীতে মোটরের দ্বার খুলিয়া বলিলেন, আসুন আসুন, চলুন, পৌছে দিই আপনাদের। আপনি উঠুন প্রিয়নাথবাবু। বেলার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়নাথবাবু উঠিয়া বসিলেন। অপূর্ববাবুও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

আপনিও উঠুন।

অনেক ধন্যবাদ, আপনি অপূর্ববাবুকে ওঁর বাসায় পৌছে দিন, আমি যাব না।

চলুন না, আপনাকেও আপনার বাসায় নাবিয়ে দিয়ে যাই।

না, আমি এখন বাসায় ফিরব না।

বেশ তো, কোথায় ফিরবেন বলুন, সেইখানেই নাবিয়ে দিয়ে যাই।

না, তার দরকার নেই, আপনারা যান।

মোটরের ভিতর হইতে প্রিয়নাথ গর্জন করিয়া উঠিলেন, চুলের ঝুঁটি ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে আসুন ওকে, সোজা কথায় ও আসবে না।

অচিনবাবু বলিলেন, আঃ, থামুন আপনি, কি যে বলেন! তার পর বেলার দিকে ফিরিয়া একটু অনুনয়ভরে বলিলেন, চলুন চলুন, ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না আপনি, চলুন। এবং হাত ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিলেন।

হাত ছেড়ে দিন আমার।

আপনি যাবেন না?

না।

কারণটা কি?

আমার খুশি।

সহসা বেলার নজরে পড়িল, আজ সকাল হইতে যে লোকটা তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল জনতার মধ্যে সেও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেলার সন্দেহ হইল, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কি যেন একটা যোগাযোগ রহিয়াছে। বহুকাল পূর্বে প্রফেসর গুপ্ত অচিনবাবু সম্বন্ধে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথাটাও মনে পড়িয়া গেল।

চলুন চলুন, ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না।—অচিনবাবু পুনরায় অনুরোধ করিলেন।

আমি যাব না, কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন, অপূর্ববাবুকে পৌঁছে দিন আপনি।

জোর ক'রে যদি ধ'রে নিয়ে যাই, কি করতে পারেন আপনি?

মোটরের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া প্রিয়নাথ পুনরায় গর্জন করিলেন, জোর ক'রেই আনুন না আপনি, কি করে ও দেখি একবার!

আসুন, কি ছেলেমানুষি করছেন!

অচিনবাবু এবার একটু জোরেই বেলার হস্তাকর্ষণ করিলেন। বেলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া সহসা অচিনবাবুর গণ্ডে সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া বারান্দায় দণ্ডায়মান প্রৌঢ়টিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একজন

মহিলাকে এরা সবাই অপমান করছে আর আপনারা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন! কেউ একটু সাহায্য করবেন না আমাকে?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আর পাঁচজনের মত দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে দেখিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন। সহসা এই প্রশ্নে একটু থতমত খাইয়া গেলেন।

সাহায্য! আরে, বলে কি? আমাকে সুদ্ধ জড়াতে চায়, কি আপদ!

আর কিছু না পারেন, আমাকে অন্তত সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে থানায় পৌঁছে দিন। পুলিসের আশ্রয়ে তবু খানিকটা ভরসা পাব।

দ্বিতলের বাতায়ন হইতে যুবকের মুখটি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং ক্ষণপরেই সশরীরে তিনি বাহিরে আসিয়া বেলা মল্লিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি আসুন, আমার এই বাইরের ঘরে এসে বসুন, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করছি আমি।

সকলেই ফিরিয়া দেখিল, স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি একটি যুবক।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন, এইবার ঠিক হয়েছে, রতনে রতন চিনেছে। এবং সমস্ত ঘটনাবলীর উপর যবনিকাপাত করিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দিলেন।

বেলা মল্লিক অবিলম্বে গিয়া যুবকের বাহিরের ঘরে বসিলেন। অচিনবাবুর যদিও ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং এখন ইহা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা অনুচিত হইবে ভাবিয়া গম্ভীরভাবে মোটরে উঠিয়া মোটরে স্টার্ট দিলেন। প্রিয়নাথ এবং অপূর্ববাবু বেলার কাণ্ড দেখিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। নিঃশব্দ-গতিতে মোটর গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

জনতাও ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

প্রফেসর গুপ্ত খোলা ছাদে বসিয়া কাব্য-আলোচনা করিতেছিলেন। দক্ষিণা বাতাস বহিতেছিল, পাশের তেপায়ার উপর রক্ষিত সুদৃশ্য কাচপাত্রে

স্তূপীকৃত বেলফুলগুলি হইতে মৃদু সৌরভ সমীরিত হইতেছিল, সবুজ রেশমের ঘেরাটোপ-দেওয়া ইলেকৃট্রিক বাতির আলোকে পরিবেষ্টনী শ্যামস্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, একটি আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া আবেশবিহ্বল-নয়নে মিষ্টিদিদি বসিয়া ছিলেন এবং প্রফেসর গুপ্ত তন্ময়চিত্তে মহাকবি ভাস বিরচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটক পাঠ করিতেছিলেন—

"যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্॥

কাব্যের ছন্দ-মন্ত্রে উভয়েই স্থান কাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ইহা যে বিংশ শতাব্দী এবং তাঁহারা কলিকাতা শহরে আছেন—প্রত্যক্ষভাবে এ চেতনা প্রফেসর গুপ্তের অন্তত ছিল না। অতি-দূর বিগত রূপলোকের আবেষ্টনীতে উদয়ন-বাসবদত্তা-পদ্মাবতীর আনন্দ-শঙ্কা-শিহরণের মধ্যে নিজেকে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

সহসা স্বপ্নভঙ্গ হইল।

বাহিরের দুয়ারে কে কড়া নাড়িতেছে!

এখানে আবার কে আসিল! এই সব উপদ্রবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই প্রফেসর গুপ্ত আলাদা এ ছোট বাসাটি ভাড়া করিয়াছেন। স্ত্রীপুত্রকন্যা আলাদা বাসায় থাকে, প্রফেসর গুপ্ত সকালে সেখানে থাকেন, রাত্রেও সেখানে ফিরিয়া যান, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সামাজিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে। কলিকাতার নির্জন অংশে এই ছোট বাসাটি তিনি ভাড়া করিয়াছেন—সংসারের কলরব, স্ত্রীর মুখর ভাষণ এবং কৌতূহলী প্রতিবেশী-গণের আপ্যায়ন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অবসরটুকু বিনোদন করিবার জন্য। নিতান্ত অন্তরঙ্গ দুই-চারিজন বান্ধব-বান্ধবী ভিন্ন এ বাসার ঠিকানাই কেহ জানে না। এত রাত্রে কে আসিল?

প্রফেসর গুপ্ত উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

পাশের বাড়িতে নয় তো?

আবার শব্দ হইল।

মিষ্টিদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, এই বাড়িতেই। যান, দেখে আসুন, কে এল! আমাকেও এবার পৌঁছে দিয়ে আসুন, রাত অনেক হ'ল। রিনিটা এতদিন ছিল, কোন ভাবনাই ছিল না।

প্রফেসর গুপ্ত উঠিতে উঠিতে বলিলেন, রিনি কি চ'লে গেছে?

হ্যাঁ, পরশুদিন ওর স্বামী এসে নিয়ে গেছে ওকে।

লক্ষ্ণৌ?

হ্যাঁ।

প্রফেসর গুপ্ত নামিয়া গেলেন।

কপাট খুলিয়া যাঁহাকে তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই, মিস বেলা মল্লিক অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া গ্রীবাভঙ্গী-সহকারে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রফেসর গুপ্তের মনে পড়িল, এই নূতন বাসাটার ঠিকানা দিয়া কিছুদিন পূর্বে তিনি বেলাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু বেলা আসেন নাই। রাস্তার উপরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল এবং ট্যাক্সিতে একজন কে যেন বসিয়া ছিলেন।

হঠাৎ তুমি এ সময়ে যে?

যখন নেমন্তন্ন করেছিলেন, আসতে পারি নি, আজ বিপদে প'ড়ে এসেছি। আমাকে এক রাত্রির জন্যে আজ আশ্রয় দিতে পারবেন?

কেন, ব্যাপার কি?

আমি এখনই বাসায় ফিরে দেখলাম, আমার ঘরে তালা ভেঙে কে ঢুকেছিল। আমার চাকরবাকর এখন কেউ নেই, একা ও-বাসায় থাকতে ভয় করছে।

জনার্দন সিং কোথা গেল?

সে দেশে গেছে। আশ্রয় দিতে পারবেন এক রাত্রের মত?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, ভেতরে এস। মিসেস মিত্রও আছেন এখানে।

মিষ্টিদি?

হ্যাঁ।

দাঁড়ান, ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিই।

ট্যাক্সির নিকট গিয়া বেলা সেই যুবকটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে এবং ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন, যেন সে তাঁহাকে ...রে বেলগাছিয়া পৌঁছাইয়া দেয়, এজন্য তিনি অগ্রিম ভাড়াও দিয়া দিলেন। ট্যাক্সি চলি গেল। প্রফেসর গুপ্ত ও বেলা উপরে উঠিয়া গেলেন।

মিষ্টিদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, এ কি, বেলা নাকি? তারপর, হঠাৎ কি মনে ক'রে?

এমনই এলাম।—তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, আজ থাক রাত্রে এখানে।

তার মানে?

প্রফেসর গুপ্ত উত্তর দিলেন, ওর বাড়িতে তালা ভেঙে কে যেন ঢুকেছি আজ, সেই ভয়ে ও পালিয়ে এসেছে, এখানে থাকতে চাইছে রাত্রে।

মিষ্টিদিদির মুখের হাসিটা একটু যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তবু জো করিয়া একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, কি ভীতু মেয়ে বাবা!

বেলা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রফেসর গুপ্ত সহসা সবিস্ময়ে বলিলেন, ও কি, তোমার কোমরে ওটা কি

ছোরা। এখুনি কিনলাম।

কেন?

কাছে একটা থাকা ভাল।

মিষ্টিদিদিও ক্ষণকাল কুচকুচে কালো খাপটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয় রহিলেন এবং পুনরায় আর একটু হাসিয়া পুনরুক্তি করিলেন, কি ভীতু মেয়ে বাবা!

বলা বাহুল্য, প্রফেসর গুপ্ত একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন প্রথমত, বেলার এই আকস্মিক আবির্ভাব সত্যই যে আকস্মিক, প্রফেস গুপ্ত ইহার বিন্দুবিসর্গও যে পূর্বাহ্ণে জানিতেন না, তাহা হয়তো মিসে মিত্র বিশ্বাস করিবেন না। কারণ তাঁহার হাসির অন্তরালে যাহ

বিচ্ছুরিত হইতেছিল, তাহা আনন্দজনিত অথবা আনন্দ...

দ্বিতীয়ত, তিনি ভাবিতেছিলেন, বেলাকে লইয়া কোথায় রাখা যায়? এ বাসায় প্রফেসর গুপ্ত থাকেন না, রাত্রে বাড়িতে ফিরিয়া যান, সেখানে বেলাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। অথচ এখানেও বেলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া অসঙ্গত। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। বেলা এবং মিষ্টিদিদি নীরবে পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। প্রফেসর গুপ্ত ভাবিতেছিলেন, কি করা যায়!

সহসা মিষ্টিদিদি সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

বেলা এখানে কোথা থাকবে? তার চেয়ে চলুক আমার সঙ্গে, রিনিটা চ'লে গিয়ে বাড়িটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে।

প্রফেসর গুপ্ত সোৎসাহে সায় দিলেন।

বেশ তো, সেই ভাল।

বেলাও নিশ্চিন্ত হইলেন। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে প্রফেসর গুপ্তের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। মিষ্টিদিদির সাহচর্য মনোরম না হইলেও নিরাপদ। একটা রাত্রি কোনরকমে তাঁহার সহিত কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বেশ তো, তাই চলুন।

সকলে নীচে নামিয়া আসিলেন।

২৪

শঙ্করের পক্ষে মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় থাকা শ্বাসরোধকর হইয়া উঠিয়াছিল। মিসেস স্যানিয়ালের পুত্র দুইটির অত্যাচার আর সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহারা শঙ্করের অজ্ঞতার কিছু-না-কিছু নিদর্শন প্রায় প্রত্যহই গোপনে মাতৃসমীপে উপস্থাপিত করিত। কর্তব্য-পরায়ণা মিসেস স্যানিয়াল তাহা লইয়া শঙ্করকে সোজাসুজি কিছু বলা যদিও অকর্তব্য মনে করিতেন, কিন্তু বাঁকাপথে শঙ্করকে সচেতন করিয়া

দিতে ইতস্তত করিতেন না। যেমন আজ সকালে বলিতেছিলেন, দেখুন শঙ্করবাবু, অনিলটার সব বিষয়ে জানবার এমন আগ্রহ! আমাকে কাল থেকে ও বিরক্ত ক'রে মারছে পেঙ্গুইন পাখিদের বিষয় জানবার জন্যে। আপনাকে হয়তো ভয়ে বলতে পারে নি, আপনি তো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যান, পেঙ্গুইন পাখিদের বিষয় দয়া ক'রে [illegible] আসবেন তো একটু, আপনারও হয়তো সব জানা নেই ও-সম্বন্ধে। আসল ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। ভয়ে ভয়ে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, এরূপ ভীতু প্রকৃতির বালক অনিলচন্দ্র নয়। সে শঙ্করকে পেঙ্গুইনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে এবং শঙ্কর অজ্ঞতা প্রকাশ করায় মুখ টিপিয়া হাসিয়াছে। কারণ নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি-মানসে তো সে শঙ্করকে প্রশ্ন করে নাই, সে শঙ্করের বিদ্যার দৌড় কত দূর তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য প্রশ্নটা করিয়াছিল এবং তজ্জন্য একজন সহপাঠীর বাড়িতে একটা মাসিক-পত্রে পেঙ্গুইন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজে পূর্ব হইতেই এ বিষয়ে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হইয়া বসিয়াছিল। শঙ্করকে বিব্রত করাই তাহার উদ্দেশ্য। শঙ্কর মিসেস স্যানিয়ালকে মৃদু হাসিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, সে যত শীঘ্র সম্ভব পেঙ্গুইন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া অনিলের জ্ঞান-পিপাসা নিবারিত করিয়া দিবে। অনিল সম্বন্ধে সত্য সত্যই তাহার যাহা মনে হইতেছিল, তাহা সে মিসেস স্যানিয়ালকে বলে নাই। অকস্মাৎ সহায়-সঙ্গতি-বিহীন হইয়া ক্রমশ সে এই সত্যটি উপলব্ধি করিতেছিল যে, জটিল সংসার-পথে স্বচ্ছন্দে চলিতে হইলে সব সময় মুখের কথা এবং মনের কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। অনুগৃহীত ব্যক্তির মুখের রূঢ় সত্যভাষণ কেহই শুনিতে চাহে না। প্রফেসর গুপ্ত তাহাকে যে টুইশনিটি জুটাইয়া দিয়াছিলেন, একটু মানাইয়া চলিলে তাহা থাকিত এবং তাহাকে এমন দুর্দশায় পড়িতে হইত না। স্পষ্টভাষণের তীক্ষ্ণতা কমাইয়া না আনিলে যে উপায় নাই, তাহা সে বুঝিয়াছিল বলিয়াই মিসেস স্যানিয়ালকে বলিতে পারিল না, আপনার

পুত্র দুইটি ডেঁপো হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ডেপোমির প্রশ্রয় দিলে উহারা উচ্ছন্ন যাইবে। মিসেস স্যানিয়ালের পুত্রদ্বয়কে আদর্শ মানবে পরিণত করিবার দায়িত্ব তাহার নহে। তাহার কর্তব্য সর্বাগ্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হওয়া। যেমন করিয়া হউক নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। যতদিন তাহা না পারিতেছে, ততদিন একটা অন্তঃসারশূন্য আত্মসম্মানকে উগ্রভাবে আস্ফালিত করিয়া লাভ নাই। যতদিন একটা কিছু না জুটিতেছে, ততদিন পেটভাতায় থাকিয়াও অখিল-অনিলের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইবে। শঙ্কর ভাবিয়া পাইত না, অখিল-অনিল তাহাকে ক্রমাগত এমন জ্বালাতন করে কেন? শঙ্কর না জানিলেও একটা কারণ ছিল। শঙ্কর আসিবার পূর্বে চুনচুন ইহাদের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, শঙ্কর খুব বিদ্বান, নানা বিষয়ে তাহার প্রচুর জ্ঞান। শঙ্করের বিদ্যাবত্তাকে পদে পদে বিমলিন করিয়া দিয়া তাহারা চুনচুনের উক্তি যে মিথ্যা, মিসেস স্যানিয়ালের নিকট তাহাই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইত। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই সম্ভবত তিনি শঙ্করকে বিদায় করিয়া দেন নাই। শঙ্কর যে প্রতিদিন দুই বেলা অখিল-অনিলের পাঠ্যবিষয়গুলি অতিশয় পরিশ্রমসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেয়—সে সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া তিনি প্রায় প্রত্যহই বিপত্নীক দেবর পীতাম্বরবাবুকে বলিয়া থাকেন, যদিও আমার অখিল-অনিলকে পড়াবার মত বিদ্যে শঙ্করবাবুর নেই, তবু ছেলেটিকে রেখেছি বাড়িতে, ভদ্রলোকের ছেলে, বিপদে পড়েছে, হাজার হোক—। কাঁচাপাকা-গোঁফ-দাড়ি-ভ্রূ-সমন্বিত পীতাম্বরবাবু চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটাইয়া তোলেন, যাহার অর্থ—এই তো আপনার মত মহিয়সী মহিলার উপযুক্ত কথা। শঙ্কর-সম্পর্কীয় আলোচনা অবশ্য বেশিক্ষণ চলিত না। কারণ পীতাম্বরবাবু আসিলেই মিসেস স্যানিয়াল কোন না কোন ছুতায় চুনচুনকে আহ্বান করিতেন এবং তাহাকে পীতাম্বরবাবুর দৃষ্টির সম্মুখবর্তী করিয়া দিতেন। এই ঈষন্নির্বোধ প্রৌঢ় বিপত্নীক দেবরটির স্কন্ধে চুনচুনকে চাপাইয়া দিবার সুবুদ্ধি সম্ভবত কর্তব্যপরায়ণতার জন্যই তাঁহার মস্তিষ্কে কিছুদিন হইতে অঙ্কুরিত

হইয়াছিল। চুনচুন আবার কখন কি করিয়া বসে, সে সম্বন্ধে তাঁহা
দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। পীতাম্বরবাবু শুধু বিপত্নীক নহেন, অপুত্রক এব
শাঁসালো। চুনচুনের সহিত ইঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে সব দিং
দিয়াই সুখের হইবে—ইহাই কর্তব্যপরায়ণা মিসেস স্যানিয়ালের বিশ্বাস, এব
সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি চলিতেছিলেন। বিধবা-বিবাহ তে
আজকাল অনেকেই করিতেছে, ইহারাই বা করিবে না কেন? চুনচু
যদিও কিছু বলে নাই, তবু শঙ্কর দুই-চারি দিনের মধ্যেই ব্যাপারট
বুঝিয়াছিল। কিন্তু শুধু বুঝিয়া কি করিবে? চুনচুনকে এ বিপদ হইতে
উদ্ধার করিবার কোন সঙ্গতিই এখন তাহার নাই। নিজের সামর্থ্য থাকিতে
চুনচুনকে হয়তো সাহায্য করিতে পারিত, কিন্তু এখন সে নিজেই নিরুপায়
চুনচুনের এই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা শঙ্করকে আরও যেন উদ্যোগী করিয়
তুলিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব, একটা চাকুরি তাহাকে যোগাড় করিয়
ফেলিতেই হইবে।

অখিল-অনিলকে পড়াইয়া রাত্রি প্রায় নয়টার পর শঙ্কর বাহির হইয়
পড়িল। প্রকাশবাবুর সহিত দেখা করিয়া আজই সে ঠিক করিয়া ফেলিবে
যে, ওই প্রুফ-রীডারের চাকুরিটা তাহার হইবে কি না! প্রুফ সংশোধন
করা বিদ্যাটা সে তো ভালরূপেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আজকাল
দুপুরবেলাটা সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটায়। সাহিত্য, বিশেষত
সাহিত্য-সমালোচনার বইগুলি তাহার বড় ভাল লাগে। আমাদের দেশে
সাহিত্য বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা যে কতদূর অসাহিত্য, ক্রমশ তাহ
সে বুঝিতে পারিতেছে। বিদেশী সাহিত্যের নকলে মৌলিকতা জাহির
করিতে গিয়া যেসব অসুন্দর রচনা ছদ্মবেশে আসর জমাইতেছে, তাহাদের
ব্যঙ্গ করিয়া সে কয়েকটা কবিতাও লিখিয়া ফেলিয়াছে।

প্রকাশবাবুর বাড়ির কাছে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে গিয়া শঙ্কর
সহসা থামিয়া গেল। ঠিক বাহিরের ঘরে প্রকাশবাবু এবং আরও বে

একজন বসিয়া তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন। উৎকর্ণ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

কই মশাই, প্রুফ-রীডার সেই যে ছেলেটির কথা আপনি বলেছিলেন, তাকে আনলেন না তো?

বক্তা সম্ভবত প্রেসের মালিক।

প্রকাশবাবু একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, তাকে হাতে রেখেছি, একটু অপেক্ষা করুন না মশাই দুদিন।

কেন?

আরে মশাই, ও হ'ল গিয়ে (ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে) পরের ছেলে। একটি নিজেদের ছোকরা যদি পাই, তা হ'লে আর ওকে ডাকি কেন, বুঝলেন না? আমাদের মাইতি মশায়ের একটি ভাইপো দেশ থেকে নাকি আসবে শিগগির শুনেছি, সে যদি আসে, তা হ'লে আর—। শঙ্কর আর দ্বারে করাঘাত করিল না, দাঁড়াইলও না। বিপরীত মুখে সোজা হনহন করিয়া চলিতে লাগিল।...নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে খানিকক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে হাঁটিবার পর শঙ্করের খেয়াল হইল, এইবার বাড়ি ফেরা দরকার, রাত হইয়াছে। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য একটা গলিতে ঢুকিবামাত্রই একটি দ্রুতগামী সাইকেলের সহিত ধাক্কা খাইয়া সে পড়িয়া যাইবার মত হইল। সাইকেল-আরোহী নামিয়া পড়িল।

এ কি, চাম গ্যানৃঢঅ যে!

ভনৃটু!

কোথাও লাগে নি তো?

না।

এত জোরে বেল দিচ্ছিলাম, তুই শুনতে পাস নি? থিঙ্কিং আপিস খুলতে খুলতে আসছিলি বুঝি? একদিন ডাইং আপিস খুললি দেখছি। অনেকদিন তোর খবর-টবর পাই না—ব্যাপার কি বল্ তো, কোথা যাচ্ছিস?

বাসায়।

বাসা আবার কোথায় ?

গড়পার।

যদিও ভন্টু সব জানিত, তবু জিজ্ঞাসা করিল, হস্টেলে থাকিস না আজকাল ?

না।

চল্, আমাদের বাড়ি চল্। বিড্‌ডিকার আজ ফৈশিয়ু অ্যাফেয়ারে ঢুকেছে, এতদিন পরে তোকে দেখলে খুশি হবে। কাল রবিবার, আমার ছুটি আছে, হোল নাইট প্রোগ্রামে ঢুকি চল্, আজ তোর সমস্ত হদিস ইন ডিটেল আয়ত্ত করব।

শঙ্কর দোটানায় পড়িয়া গেল। দুঃখের দিনে পুরাতন বন্ধু ভন্টুকে দেখিয়া ভালও লাগিতেছিল, অথচ তাহার সহিত যাইতেও কেমন যেন ইচ্ছা করিতেছিল না, কেমন যেন সঙ্কোচ হইতেছিল। যে ভন্টুকে সে এতকাল অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়াছে, তাহাকে সে নিজের সব কথা খুলিয়া বলিবে কি করিয়া ? কোনও একটা অজুহাতে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু ভন্টু কিছুতেই ছাড়িল না।

শঙ্কর তখন বলিল, তা হ'লে বাসায় একটা খবর দিয়ে যেতে হয়, তা না হ'লে ওরা ভাববে।

বেশ, তাই চল্।

শঙ্কর যখন ভন্টুর বাসায় পৌঁছিল, তখন প্রায় রাত এগারোটা। ভন্টুর বউদিদি রান্নাবাড়া শেষ করিয়া ভন্টুর অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। ভন্টুর সহিত শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

ওমা, এতদিন পরে পথ ভুল্লে না কি ?

শঙ্কর একটু হাসিল।

ভন্টু বলিল, ও একটা চোর, চেন না ওকে।

এস, ব'স।

বউদিদি তাড়াতাড়ি একটা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, খাওয়াদাওয়া সেরে এসেছ না কি?

ভন্টু পুনরায় উত্তর দিল, ভুলে যাও সেসব কথা, মুচ্ছি মুলে খাবে ও এখন।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, শুনলাম, আপনি মাছ-টাছ অনেক রকম রান্না করেছেন, সেই লোভে এলাম।

বেশ তো।

ভন্টু বাইকটা উঠানে রাখিবার জন্য সেটাকে ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

শঙ্কর বউদিদিকে বলিল, আমি খবর-টবর না দিয়ে অসময়ে এলাম, কম প'ড়ে যাবে না তো?

একমুখ হাসিয়া বউদিদি উত্তর দিলেন, যা আছে তিন জনে ভাগ ক'রে খাব।

ঘরের ভিতর হইতে দরাজ গলায় বাকু হাঁক দিলেন, ও বউমা, ভন্টু ফিরল? চারদিকে যা দাঙ্গা হচ্ছে!

বউদিদি ঘরের ভিতর গেলেন।

ভন্টু ফিরেছে, বাঁচা গেল! ও, তাই নাকি? শঙ্করও এসেছে, ভাল ভাল। কিন্তু চারদিকে ভীষণ দাঙ্গা, সব লোক ক্ষেপে উঠেছে, শঙ্করকে আজ আর যেতে দিও না এত রাত্রে, এইখানেই খাওয়াদাওয়া ক'রে শুয়ে থাক্। 'বঙ্গবাসী' যা লিখছে—ভীষণ কাণ্ড।

বউদিদি হাস্য-স্নিগ্ধ মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ভন্টু বাইক রাখিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বউদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, লর্ড বাক্‌ল্যাণ্ড কি বলছেন?

উনি আজ সন্ধ্যে থেকে নিজের আলোটি জ্বেলে খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজে বেরিয়েছে হিন্দু-মুসলমানে নাকি দাঙ্গা শুরু হয়েছে, তুমি এতক্ষণ ফিরছিলে না, খুব ভাবছিলেন উনি।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, দাঙ্গা তো বড়বাজার অঞ্চলে গত সপ্তাহে হয়েছিল, এখন তো আর কিছু নেই।

ভনুটু বলিল, লর্ড বাক্‌ল্যাণ্ডের কাণ্ডকারখানাই আলাদা, তুই তার কি বুঝবি?

বউদিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাবা যে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পড়েন, ওঁর কাছে খবরটা আজ এসে পৌঁছেছে। উনি কানে তো একদম কিছু শোনেন না, 'বঙ্গবাসী' প'ড়েই বাইরের খবর যা কিছু পান।

ভনুটু জিজ্ঞাসা করিল, নতুন আলোটা বাকুর পছন্দ হয়েছে?

খুব। কাউকে হাত দিতে দেন না, আমি সন্তর্পণে খালি তেলটি ভ'রে দিই। উনি নিজের হাতে চিমনি ডোম সমস্ত পরিষ্কার করেন। এ তুমি এক আপদ জুটিয়েছ বাপু।

কেন?

ছাইয়ের গুঁড়ো, ফরসা ন্যাকড়া, কাঁচি—ওঁর বাতি জ্বালার তরিবৎ করতে করতে সমস্ত বিকেলটা যায় আমার।

ভনুটু শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে নাচাইতে বলিল, বা কুর কুর কুর কুর কুর কুর—

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, বউয়ের কাছে ও-রকম ঢঙ করলে বউ কাছেও ঘেঁষবে না ব'লে দিচ্ছি। শঙ্কর-ঠাকুরপোকে বলেছ সব কথা?

শঙ্কর বলিল, শুনেছি।

একমুখ হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, আপিসের বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, অনেক দেবে থোবে।

ভনুটু বাকুর ঘরের জানালায় উঁকি দিয়া দেখিতেছিল। শঙ্করকে বলিল, দেখ্ দেখ্, লর্ড বাক্‌ল্যাণ্ডকে দেখবি আয়।

শঙ্করও উঠিয়া উঁকি দিয়া দেখিল, ধপধপে ফরসা বিছানায় বসিয়া পরিষ্কার-ওয়াড়-দেওয়া এবং দামী-তোয়ালে-আবৃত তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া বাকু 'বঙ্গবাসী' পাঠ করিতেছেন। পাশে টুলের উপর প্রকাণ্ড গড়গড়া, রূপালী-জরি-লাগানো জমকালো নল, মাথার দিকে টেবিলে শুভ্র-ডোম-সমন্বিত সুদৃশ্য টেবিল-ল্যাম্প্। চশমার পুরু লেন্স্ হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছে।

শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিহীন ধপধপে ফরসা মুখমণ্ডলে একটা গম্ভীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠিক যেন হাইকোর্টে চীফ জাস্টিস বসিয়া রহিয়াছেন।

বউদিদি দুইখানি আসন পাতিয়া গ্লাসে জল গড়াইতে গড়াইতে বলিলেন, আর রাত ক'রো না, ব'স তোমরা।

উভয়ে আসিয়া উপবেশন করিল।

ভন্টু বলিল, দাদা বোধ হয় আজ স্টার্ট্ করবেন বউদি।

বউদিদি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, তাই তো লিখেছিলেন।

শঙ্কর খবরটা শোনে নাই, বলিল, দাদা ফিরে আসছেন নাকি?

বউদিদি নিজের আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, শরীর বেশ সেরে গেছে, জ্বর-টর আর হয় না।

জলের গ্লাস দুইটি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বউদিদি ভাত বাড়িবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে যাইতেছিলেন।

ভন্টু বলিল, বউদি, শোন, মাছের মুড়োটা এই ছোকরাকে দিও। অত্যন্ত সৎকার্য করছেন ইনি আজকাল; বিয়ে ক'রে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরির চেষ্টায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গ্রে-ট সোল!

বিবাহের কথায় বউদিদি শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

ভন্টু শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, অমন গোমড়া-গোছের মুখ ক'রে কেন ব'সে আছিস রে রাস্কেল! ভরপেট খেয়ে আজ ঘুমো, কাল জালফিদারিক ব্যাপারে ঢুকব, দেখি কি করতে পারি!

জালফিদারিক মানে?

জুলফিদার শব্দের উত্তর ষ্ণিক প্রত্যয় করলে জালফিদারিক হয় না?

তাতে কি?

আমাদের আপিসের বড়বাবুকে দেখিস নি কখনও?

না।

হি ইজ জুলফিদার দি গ্রেট—মাই প্রস্পেক্টিভ ফাদার-ইন-ল। কাল

তাকে খুঁজলে দেখব, তোর জন্যে যদি কিছু করতে পারি। আজ ভরপেট খেয়ে বাফেলোয়িং করব্।

বাফেলোয়িং শব্দটাও শঙ্কর বুঝিতে পারিল না এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া ভন্টু বলিল, মোষের মত ঘুমো।

বউদিদি দুই হাতে দুইটি থালা লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং উভয়ের সম্মুখে তাহা রাখিয়া বলিলেন, খাও, নেবু কেটে রেখেছি, নিয়ে আসছি।

ভন্টু বলিল, সেটি হচ্ছে না। তোমার যা কিছু আছে—পাই পয়সা সমস্ত নিয়ে এস, আর একখানা থালাও নিয়ে এস, যা আছে তিনজনে সমান ভাগ ক'রে খাব। আমরা ইডিয়টের মত গোগ্রাসে গিলে যাব আর তুমি উপোস ক'রে গ্রেট্নেসের লদ্‌কালদ্‌কি করবে, সেটি হচ্ছে না।

ব'স না তোমরা, বসছি আমিও।

আমাদের সামনে বসতে হবে, তোমাকে চিনি না আমি—থিফ কোথাকার!

বাবা বাবা, বড় জ্বালাতন কর তুমি ঠাকুরপো!

শঙ্কর বলিল, ভাগ ক'রে খাওয়ারই তো কথা হয়েছিল।

অগত্যা বউদিদি আর একটি থালা আনিতে গেলেন।

২৫

পরদিন সকালে শঙ্কর বাসায় ফিরিয়াই শুনিল যে, মুকুজ্জেমশাই কাল রাত্রে তাহার চলিয়া যাইবার পর আসিয়াছিলেন এবং শঙ্করকে অবিলম্বে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঠিকানাও দিয়া গিয়াছেন। ঠিকানাটা সার্পেন্টাইন লেনের। মুকুজ্জেমশাই বাসা পরিবর্তন করিয়াছেন, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায় আর তিনি থাকেন না। সংবাদটা শুনিয়াই শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় মিসেস স্যানিয়াল বলিলেন, আপনি এখন আবার বেরুচ্ছেন নাকি কোথাও?

হ্যাঁ।

অখিল ডিনামিক্‌সের কি যেন একটা বুঝতে পারছে না। কাল রাত্রে আপনি চ'লে যাবার পর থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে ও। ভেবেছিল, আপনি ফিরলে সকালেই বুঝিয়ে নেবে। কাল তো আপনি সারারাত বাইরে রইলেন, আজ আবার এসেই বেরিয়ে যাচ্ছেন! ওরে অখিল!

অখিল পাশের ঘরে বসিয়া ক্যারম খেলিতেছিল। শঙ্করের মেজাজটা ভাল ছিল না, তথাপি যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া উত্তর দিল, এখন আমাকে যেতেই হবে, আমি ফিরে এসে বুঝিয়ে দেব।

মিসেস স্যানিয়ালের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া গেল। মিসেস স্যানিয়াল শঙ্করের গমন-পথের দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন এবং তাহার পর চুনচুনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, ক্রমশ গুণ বেরুচ্ছে ভদ্রলোকের। শুধু শুধু কি আর ভগবান কাউকে বিপদে ফেলেন! তা ফেলেন না। কি ছেলে, কি মেয়ে—আজকাল কারও কর্তব্যবোধ নেই, সেইজন্যেই এত দুঃখ তাদের। চুনচুন ঘরের টেবিলটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছিল, নীরবে তাহাই করিতে লাগিল: মিসেস স্যানিয়াল তাহার দিকে একটা রুষ্ট দৃষ্টি হানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর দ্রুত পথ অতিবাহন করিতেছিল। মনটা ভাল ছিল না। সারা মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি। ভন্টু, ভন্টুর বউদিদি কাল তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছে; ভন্টু তাহাকে আশ্বাসও দিয়াছে যে, যেমন করিয়া হউক সে তাহার হবু-শ্বশুরকে ধরিয়া তাহাকে তাহাদেরই আপিসে একটা চাকরি যোগাড় করিয়া দিবে। তাহাদের আপিসে শীঘ্রই একজন নাকি লোক বাহাল করা হইবে, বেতন পঁচাত্তর টাকা হইতে শুরু—দেড়শোর গ্রেড। ভন্টু বলিয়াছে, এখন এইটাতেই ঢোক্‌, তারপর জুল্‌ফিদারকে চুমরে লিফ্‌ট্‌ করিয়ে দেব তোর। একবার সুড়ঙ্গ কেটে ঢোক্‌ তো। এই দেখ্‌ না, আমার আড়াইশোর গ্রেডে লিফ্‌ট্‌ হয়ে গেছে। চাকরির এমন একটা আশু এবং সুনিশ্চিত-প্রায় সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিন্তু শঙ্করের চিত্ত আনন্দিত হইয়া উঠে নাই।

মনের ভিতরটা কেমন যেন করকর করিতেছিল। যে ভনুটু বিদ্যায় বুদ্ধিতে সব বিষয়ে তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল, সে-ই তাহাকে ডিঙাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। ধনীর একমাত্র কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে, আড়াই শত টাকা বেতনের পদে উন্নীত হইয়াছে, ইতিমধ্যে কিছু লাইফ ইনুসিওর করিয়াছে এবং শীঘ্র আরও করিবে। অথচ সে আত্মীয়পরিজন বিচ্যুত হইয়া অত্যন্ত ঝুটা একটা আদর্শের পতাকা স্কন্ধে করিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ আদর্শের মূল্য কি? তা ছাড়া, সত্যই কি আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল? সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়—ঝোঁকের মাথায় নিজের ক্ষুধিত বাসনা-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার জন্য। সে উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই। ওই অতি-সরল হাবা-গোবা অমিয়া ইন্ধনের যোগ্যতাও লাভ করিতে পারে নাই। বাসনা-বহ্নিকে উদ্দীপ্ত করিবার মত ক্ষমতা ওই ঘোমটা-দেওয়া জড়তরত প্রকৃতির অমিয়ার মধ্যে নাই। শঙ্করের বারম্বার মনে হইতে লাগিল, সে ঠকিয়া গিয়াছে—ভয়ঙ্কর ঠকিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর উপায় নাই, এই ভুলটাকে লইয়াই সারা জীবন চলিতে হইবে। ঈর্ষার ক্ষুদ্র কীটটা অন্তরের অন্তস্তলে বসিয়া দংশন করিতেছিল, নিজের দুরবস্থায় এবং ভনুটুর সচ্ছলতায় সমস্ত অন্তঃকরণ কেমন যেন বিষাইয়া উঠিয়াছিল, মনে এতটুকু স্বস্তি ছিল না।

খানিকক্ষণ হাঁটিবার পর অনেক খুঁজিয়া সে অবশেষে সার্পেন্টাইন লেনে মুকুজ্জেমশাইয়ের নূতন বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। একটি ছোট দ্বিতল বাসা। নীচের বসিবার ঘরটি খোলাই ছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিয়া দেখিল, মুকুজ্জেমশাই নাই, আর একজন প্রৌঢ়-গোছের ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন।

মুকুজ্জেমশাই কোথায়?

তিনি একটু বেরিয়েছেন, আপনার নামই কি শঙ্করবাবু?

হ্যাঁ।

বসুন, আপনাকে বসতে ব'লে গেছেন তিনি, এখনই আসবেন।

শঙ্কর নিকটের বেঞ্চিতে উপবেশন করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি শঙ্করের

মুখের দিকে সস্মিত ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আপনাকে যেন কোথায় দেখছি ব'লে মনে হচ্ছে।

শঙ্করও হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আপনার মুখটাও চেনা চেনা ঠেকছে।

ভন্টু থাকিলে আস্‌মি-দাব্‌জির পিতা নিবারণবাবুকে অবিলম্বে চিনিতে পারিত। শঙ্কর মাত্র একদিন ভন্টুর সহিত নিবারণবাবুর দোকানে চা পান করিতে গিয়াছিল; সুতরাং নিবারণবাবুকে ঠিক কোথায় দেখিয়াছে মনে করিতে পারিল না। এই ছোট দ্বিতল বাড়িখানি নিবারণবাবুরই, মুকুজ্জেমশাই ভাড়া লইয়াছেন। নিবারণবাবু যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়িটিও পাশেই। শুধু ভাড়াটে হিসাবেই নয়, মুকুজ্জেমশাই লোকটি পরোপকারপ্রবণ এবং নানা স্থানে তাঁহার অনেক জানা-শোনা লোক আছে শুনিয়া নিবারণবাবু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন। আস্‌মির কোন সন্ধানই এখনও মেলে নাই। পুলিসে সংবাদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু পুলিস কিছু করিতে পারিতেছে না। নিবারণবাবু মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, মুকুজ্জেমশাইকে সব কথা বলিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

আপনি বসুন শঙ্করবাবু, আমি উঠি। আপনাকে আটকাবার জন্যেই মুকুজ্জেমশাই আমাকে বসিয়ে রেখে গেলেন। মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে তিনি এই একটু বেরিয়েছেন, এখনই এসে পড়বেন।

মৃন্ময়বাবু এখানে আছেন নাকি ?

হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন, ওপরে আছেন। আচ্ছা, বসুন তা হ'লে, আমাকে দোকানে বেরুতে হবে।

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন। মৃন্ময়ের স্ত্রীর কথায় বহুদিন আগেকার একটা ছবি শঙ্করের মনে জাগিয়া উঠিল। মৃন্ময় মোটর চাপা পড়িয়া হাসপাতালে ছিল এবং তাহার স্ত্রীকে রাত্রে সেখানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। রোরুদ্যমানা হাসির মুখখানা মনে পড়িল। সহসা রিনির মুখখানাও মনে পড়িয়া গেল। লক্ষ্ণৌয়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে রিনির বিবাহ হইয়াছে। শঙ্করকে কি তাহার এখনও মনে আছে ? শঙ্করকে কি সে

কথা কহিতে পারিয়াছে? বহুদিন পরে রিনির স্মৃতিকে ঘিরিয়া তাহার কল্পনা স্বপ্নলোক সৃজন করিতে লাগিল।

শঙ্কর এসে পড়েছ দেখছি!

অন্যমনস্ক শঙ্কর সচকিত হইয়া দেখিল, মুকুজ্জেমশাই আসিয়াছেন, সঙ্গে মৃন্ময়। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু বসিলেন না, বলিলেন, তুমি এইখানেই খেয়ে যেও, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে, পালিও না যেন। আমি সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট থেকে আসছি এখনই ঘুরে।

ও বাসায় কে আছে?

ও বাসায় একটি রুগী আছে। আমারই চেনা-শোনা একজন, রাজমহল থেকে এসেছে; যে দাইটা রাত্রে থাকত সেখানে, সে দু দিন থেকে আসছে না। তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসছি আমি এখনই। তুমি যেও না, বম্বে থেকে চিঠি এসেছে, হয়তো হয়েও যেতে পারে কাজটা। ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন তারা তোমার ফোটো চেয়েছে একখানা। আমি একজন ফোটোগ্রাফারকে ব'লে এলাম, সে বিকেলের দিকে আসবে।—মৃন্ময়, ও মৃন্ময়, তুমি এসে শঙ্করের সঙ্গে গল্প-সল্প কর ততক্ষণ।

শঙ্করও মৃন্ময়ের দিকে পিছন ফিরিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত কথা কহিতেছিল, কখন সে উপরে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সে টের পায় নাই।

আপনি যান, আমি বসছি।

মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর পুনরায় বেঞ্চিটিতে উপবেশন করিল এবং বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ফোটো চাহিয়াছে কেন? ফোটো লইয়া তাহারা কি করিবে? সম্ভব-অসম্ভব নানা কল্পনা মনে জাগিতে লাগিল। মনে হইল, যিনি মাসিক-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, হয়তো তিনি একটি কন্যারত্নেরও স্বত্বাধিকারী। পছন্দসই একটি সহকারী সম্পাদক পাইলে তাহাকে জামাই-পদেও বরণ করিবেন। এবার ফোটো চাহিয়াছেন। ফোটো পছন্দ হইলে বোধ হয় কুষ্ঠি চাহিয়া পাঠাইবেন। মনে মনে শঙ্কর এক ব্যক্তিকে জামাই সহকারী

সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া কল্পনায় রঙ চড়াইতে লাগিল। মেয়েটি হয়তো লাবণ্যময়ী পুষ্পিত-যৌবনা তন্বী, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতি মাসে হয়তো একটি করিয়া কবিতা লিখিতে হইবে, হয়তো কবিতা তাহার পছন্দ হইবে না, হয়তো সেই বিম্বাধরোষ্ঠীকে বিগলিত করিবার সাধনায় নব নব ছন্দ উপমার অনুসন্ধানে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইবে। হয়তো—

সহসা উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়া একটা উচ্চ নারীকণ্ঠস্বর তাহার কল্পনার জাল্‌কে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

জানি গো জানি, সব জানি—আমার কাছে আর অত ভালবাসা ফলাতে হবে না; তোমার স্বর্ণলতার কাছে ওসব সোহাগ জানাওগে যাও, তোমাকে বুঝতে আর বাকি নেই আমার।

স্বর্ণলতা! চকিতের মধ্যে শঙ্করের মনে বহুকাল পূর্বের আর একটি রাত্রির কথা মনে পড়িল। স্বর্ণলতার নামাঙ্কিত সেই চিঠিখানি এখনও তাহার কাছে আছে। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল এবং ক্ষণপরেই মৃন্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর লক্ষ্য করিল, তাহার চক্ষু দুইটি হইতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে।

আমার একটু দেরি হয়ে গেল।—মৃন্ময় হাসিয়া বলিল।

তা হ'লই বা। আমি বেশ তো ব'সেই আছি।

একটু ইতস্তত করিয়া মৃন্ময় বলিল, আমার সব কথা শুনেছেন আপনি?

না, কিছুই শুনি নি।

শোনবার কথা অবশ্য নয়, কারণ কাউকেই আমি জানাই নি, এমন কি ভন্টুকে পর্যন্ত নয়। মুকুজ্জেমশাই অবশ্য জানেন সব কথা, কিন্তু তাঁকেও হাসি, মানে—আমার স্ত্রী বলেছে, আমি বলি নি।

তাহার পর জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা পাঁচজনকে ব'লে বেড়িয়ে লাভ কি বলুন?

মিনিটখানেক অস্বস্তিকর একটা নীরবতার পর শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি?

আমার এক ছোট ভাই ছিল, চিনতেন তাকে আপনি? আপনাদের কলেজেই পড়ত।

কি নাম বলুন তো?

চিন্ময়।

শঙ্কর মনে করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মনে পড়িল না। তথাপি বলিল, মনে হচ্ছে যেন নামটা শোনা।

আমার সেই ভাই বোমার দলে যোগ দিয়ে হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে জেলে আছে এখন। আর সেইজন্যেই আমার চাকরিটি গেছে। আমি পুলিসের আই.বি.তে চাকরি করতাম। যার নিজের ভাই রেভলিউশনারি, তাকে আই.বি.তে রাখবে কেন? মৃন্ময় সহসা চুপ করিয়া গিয়া আবার বলিল, দুঃখ তাও নয়, আসল দুঃখ—। পুনরায় থামিয়া গেল, আবার তাহার চক্ষু দুইটিতে একটা অস্বাভাবিক জ্বালা ফুটিয়া উঠিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে হঠাৎ আবার জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আসল দুঃখ, I am a fallen man—আমার পতন হয়েছে, সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। I have bungled my whole life—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছি।

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল, মৃন্ময় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

এক মিনিট বসুন, আমি ব'লে আসি—আপনি খাবেন আজ দুপুরে। আসল কথাটা বলতে ভুলে গেছি।

শঙ্করকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

২৬

যে দিন মনোরমা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায় অজ্ঞান হইয়া গেল, সেদিন হইতে মুকুজ্জেমশাই ও-বাসায় আর রাত্রিবাস করেন নাই। ডাক্তার, নার্স ডাকিয়া তিনি মনোরমার চিকিৎসার

বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রে সেখানে থাকা উচিত মনে করেন নাই। পরদিন গিয়া একজন রাঁধুনী ও একজন চাকরানী বাহাল করিয়া মনোরমাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, আমি রোজ আসব। বুড়ী রাঁধুনী তার ছেলেকে নিয়ে রাত্রে থাকবে, চাকরানীও রাত নটা পর্যন্ত থাকবে। আমার সঙ্গে আর একটি ছেলে আছে, তাই আমি আর একটি বাসা নিয়েছি। আমি রোজ এসে খবর নিয়ে যাব তোমার, কোন ভাবনা নেই।

মনোরমা কোন আপত্তি করে নাই, বস্তুত কোন উত্তরই সে দেয় নাই। অজ্ঞান হইয়া যাইবার পর হইতে সে অসম্ভব রকম নীরব হইয়া গিয়াছে, মুকুজ্জেমশাই প্রত্যহ আসেন, খোঁজ-খবর করেন, সে চুপ করিয়া থাকে। তাহার শেষ বক্তব্য যেন সে বলিয়া দিয়াছে, আর যেন তাহার বলিবার কিছু নাই।

আজ মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা নাই। রাঁধুনী বলিল, সেও সকাল হইতে মনোরমাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঘরের ভিতর মুকুজ্জেমশাইয়ের নামে একটি পত্র পাওয়া গেল। অতি ক্ষুদ্র পত্র।

শ্রীচরণেষু, আমি চলিলাম। আমাকে খুঁজিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। ইতি—

প্রণতা
মনোরমা

২৭

যদিও মিষ্টিদিদির স্বামী অধ্যাপক মিত্রের কিছুদিন হইতে 'হার্ট্ ট্রাব্‌ল্' বাড়িয়াছিল, তথাপি তিনি একটি থিসিস লিখিতেছিলেন এবং তাহাতেই তন্ময় হইয়া ছিলেন। অধ্যাপক মিত্রের সহিত মিষ্টিদিদির সম্পর্ক কোনদিনই বেশি রকম ঘনিষ্ঠ হইতে পারে নাই। থিসিস লিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি আরও যেন দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যে গ্রীক নাটকের প্রভাব

লইয়া তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য কিছুর খবর রাখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। মিষ্টিদিদি কখন বাড়িতে থাকেন, কখন থাকেন না, কখন আসেন, কখন যান, কাহার সঙ্গে মেশেন, কাহার সঙ্গে মেশেন না—এ সকল খবর রাখিবার কোন প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন না, কারণ এ সকল খবরের সহিত তাঁহার থিসিসের কোন সম্পর্ক নাই। গ্রীক নাটকের কোন প্রভাব ইংরেজী নাটকে পড়িয়াছে কি না এবং পড়িয়া থাকিলে কতটুকু পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতেই তিনি ব্যস্ত। ইহা লইয়াই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কলেজে এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নিজের বাড়ির লাইব্রেরি-ঘরে অতিবাহিত হয়। পুরাতন ভৃত্য জগদীশ তাঁহার স্নান, আহার, বেশ-পরিবর্তন হইতে শুরু করিয়া কখন তাঁহার কলেজ যাইবার সময় হইল, কবে কোথায় কাহার সহিত এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে, কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় বইগুলি হাতের কাছে রাখিতে হইবে, সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে। অর্থাৎ জগদীশ যদি স্ত্রীলোক হইত, তাহা হইলে জগদীশকে ব্যাকরণসম্মতভাবে প্রফেসর মিত্রের জীবন-সঙ্গিনী বলা চলিতে পারিত। মিষ্টিদিদি সামাজিক আসরে মিসেস মিত্র, মিস্টার মিত্রের সহিত সামাজিক সম্পর্ক ছাড়া তাঁহার আর কোন সম্পর্ক নাই। রঙ্গমঞ্চের বাহিরে দুইজন দুই জগতের লোক।

মিষ্টিদিদির প্রতি প্রফেসর মিত্রের মনোভাব কিন্তু অদ্ভুত-ধরনের। প্রফেসর মিত্র মিষ্টিদিদিকে যেন ভয় করেন। অপরাধী বালক যেমন ভয়ে ভয়ে অভিভাবককে এড়াইয়া চলে এবং অভিভাবক কোন একটা কিছু লইয়া অন্যমনস্ক থাকিলে নিশ্চিন্ত হয়, প্রফেসর মিত্রও ঠিক তেমনই মিষ্টিদিদিকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন এবং মিষ্টিদিদি যা-হোক-একটা কিছু লইয়া মাতিয়া থাকিলে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন। প্রফেসর মিত্র মিষ্টিদিদিকে যে চেনেন না তাহা নয়, কিন্তু না চিনিবার ভান করেন। মিষ্টিদিদি নিকটে আসিলে সমস্ত দন্তপাঁতি বিকশিত করিয়া এমন আন্তরিকতার সহিত আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিটি হাসেন যে, মনে হয়, তিনি কিছুই জানেন না; মনে হয়, তিনি মিষ্টিদিদির খোশামোদ করিতেছেন; মনে হয়, তিনি মিষ্টিদিদির প্রীত্যর্থে

সব-কিছুই করিতে প্রস্তুত। মিষ্টিদিদি সরিয়া গেলেই তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়, জগদীশকে ডাকিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিতে বলেন এবং রুদ্ধ দ্বারের দিকে চকিত দৃষ্টিতে দুই-একবার তাকাইয়া পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। শুধু যে মিষ্টিদিদিকে দেখিয়াই তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন তাহা নয়, মিষ্টিদিদির ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরটা তাঁহার পড়ার ঘরে ঢুকিলেও তিনি সমান অস্বস্তি বোধ করেন এবং অনুরূপ আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া তাহার গায়ে মাথায় আলতো আলতো হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। মিষ্টিদিদি অথবা মিষ্টিদিদির কুকুর উভয়ের সম্বন্ধেই প্রফেসর মিত্রের মনোভাব অনেকটা এক রকম, অধ্যয়নের অন্তরায় হিসাবেই যেন উভয়কেই তিনি ভয় করেন এবং উহাদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেন না বলিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করেন। তাঁহার নিজের ধারণা অর্থাৎ যে ধারণাটাকে তিনি সচেতন মনের সদরে কিঞ্চিৎ কপটতার সহিত প্রশ্রয় দেন তাহা এই যে, দুর্নিবার অধ্যয়ন-স্পৃহাই একটা নেশার মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে এবং বহুবিধ কর্তব্যকর্ম হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এই বিচ্যুতির জন্য তিনি সর্বদাই লজ্জিত। ইহার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই তিনি যেন মিষ্টিদিদির স্বেচ্ছাচারকে সহ্য করেন; শুধু তাহাই নয়, স্বেচ্ছাচারের আবিলতরঙ্গে গা ভাসাইয়া মিষ্টিদিদি যে দয়া করিয়া তাঁহাকে রেহাই দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার প্রতি একটা কৃত্রিম কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। প্রফেসর মিত্র কোন দিন আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই, দেখিতে চাহেন নাই—আসল গলদ কোন্‌খানে! নিজের দুর্বলতা কেহ স্বীকার করিতে চাহে না, এমন কি নিজের কাছেও নহে। সর্বগ্রাসী অধ্যয়ন-স্পৃহার উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়া মিত্রমহাশয় সুখে ছিলেন, দোষারোপ করিবার মত একটা কিছু না পাইলে তিনি পাগল হইয়া যাইতেন।

প্রফেসর মিত্র অ্যারিস্টোফ্যানিস পড়িতেছিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে। মিষ্টিদিদি বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। ফিরিলেও তিনি সোজা উপরে চলিয়া যাইবেন, প্রফেসর মিত্রকে বিরক্ত করিবেন না, ইহাই চিরাচরিত

প্রথা। কিন্তু আজ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল, সশব্দে দ্বার ঠেলিয়া মিষ্টিদিদি প্রবেশ করিলেন। সর্বাঙ্গে কমলা রঙের জরিদার শাড়ি ঝলমল করিতেছে, চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখা। মনে মনে বিব্রত হইলেও প্রফেসর মিত্র নাক হইতে চশমাটি কপালে তুলিয়া আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, ও, তুমি! কোথায় গিয়েছিলে, সিনেমায়?

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, কি বই ছিল?

সিনেমায় যাই নি, প্রফেসর গুপ্তের বাড়ি থেকে আসছি।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-মিশ্রিত একটি তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া এক হাত কোমরে দিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ঠামে মিষ্টিদিদি দাঁড়াইলেন, টেবিলে স্তূপীকৃত বইগুলির দিকে একবার চাহিয়া প্রফেসর মিত্রের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি হইতে ঘৃণা যেন উপচাইয়া পড়িতেছিল। প্রফেসর মিত্র বিচলিত হইলেন না, বলিলেন, ওঃ, প্রফেসর গুপ্ত। বেশ বেশ।

মিষ্টিদিদি কাজের কথা পাড়িলেন, আমাকে দুশো টাকার একখানা চেক দাও দিকি।

দুশো টাকার চেক? কেন?

কাল আমি দার্জিলিং যাব, এখানে আর ভাল লাগছে না।

ও। প্রফেসার গুপ্তও যাবেন নাকি?

না, একাই যাব।

প্রফেসর মিত্র আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। ড্রয়ার খুলিয়া চেক-বহি বাহির করিলেন এবং দুই শত টাকার চেক লিখিয়া দিলেন। মিষ্টিদিদি চেক লইয়া অবিলম্বে বাহির হইয়া গেলেন। কাল সত্যই তিনি দার্জিলিং চলিয়া যাইবেন। প্রফেসর গুপ্তকে উতলা করিবার জন্যই অল্প কিছুদিন সরিয়া থাকা দরকার। বেলা যদিও পরদিন উঠিয়াই নিজের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্য প্রফেসর গুপ্তের দুর্ভাবনার বহরটা মিষ্টিদিদির নিকট মোটেই উপাদেয় মনে হয় নাই। আজ মিষ্টিদিদি প্রফেসর গুপ্তের সহিত ছদ্ম কলহ করিয়া আসিয়াছেন, কাল ছদ্ম অভিমান করিয়া

কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। পুরুষ-মানুষকে বশে রাখিতে হইলে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।

২৮

মৃন্ময়ের সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া, বিশেষত মৃন্ময়ের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, শঙ্কর একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকটা শুধু যে মুষড়াইয়া গিয়াছে তাহা নয়, কেমন যেন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করের নিজের দুঃখও কম নয়, কিন্তু মৃন্ময়ের দুঃখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। শঙ্কর স্বেচ্ছায় খেয়ালের বশবর্তী হইয়া দুঃখকে বরণ করিয়াছে, নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, দুঃখের ভারে ভগ্নমেরুদণ্ড হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়ে নাই। তাহার আদর্শ ঝুটা হইতে পারে, সে কিন্তু সে আদর্শ হইতে এতটুকু বিচ্যুত হয় নাই, তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকেই এখনও আঁকড়াইয়া আছে অর্থাৎ তাহার এই কৃচ্ছ্রসাধন একটা বলিষ্ঠতা দ্বারা মহিমান্বিত। পিতামাতার বিরুদ্ধে অমিয়াকে বিবাহ করিয়া সে হয়তো ভুল করিয়াছে, কিন্তু সেই ভুলটাকে সংশোধন করিবার নিমিত্ত সে নিজের অহঙ্কৃত পৌরুষকে অপমানিত করে নাই। সগৌরবে উন্নত শিরে নিজের স্বেচ্ছাকৃত ভুলের লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছে ও করিবে। এমন কিছুই করে নাই বা করিবে না, যাহা আত্মধিক্কারের গ্লানিতে সমস্ত অন্তর অহরহ বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। মৃন্ময়ের কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছে। হাসিকে বিবাহ করিয়া অন্তর্হিতা স্বর্ণলতার প্রেমে একনিষ্ঠ থাকিয়া পুলিসে চাকরি করিতে করিতে তাহার অনুসন্ধানে প্রয়োজন হইলে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া দিব—এই অসম্ভব আদর্শকে অনুসরণ করিতে গিয়া মৃন্ময় স্বাভাবিক নিয়মে আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারে স্বর্ণলতাকে ভুলিয়া হাসিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। বিনিময়ে হাসির ভালবাসা সে পাইয়াছিল। কিন্তু স্বর্ণলতার চিঠিগুলি আবিষ্কার করিয়া হাসি যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হাসি যদি মৃন্ময়কে আর একটু কম ভালবাসিত

অথবা সে যদি আর একটু চাপা গম্ভীরপ্রকৃতির মেয়ে হইত, তাহা হইলে তাহার ঈর্ষাক্ষুব্ধ অন্তর এমন প্রখরভাবে হিংস্র হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে মৃন্ময়কে অকপটে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া এবং মনের ভাষার সহিত মুখের ভাষার পার্থক্য রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অকপটে সে মৃন্ময়কে এই প্রতারণার জন্য ধিক্কার দিতেছে। মৃন্ময়ের চাকুরিবিহীন জীবন হাসির বাক্যবাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময়ের আর একটা মুশকিল হইয়াছিল, কাহারও কাছে সব কথা খুলিয়া বলিয়া সে মনের ভার লাঘব করিতে পারিতেছিল না। কাহার নিকট বলিবে? সে মুখ-চোরা-প্রকৃতির লোক, কাহারও সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারে না, কাহারও সহিত তাহার হৃদ্যতা জন্মে না। ভন্টু তাহার পরিচিত, কিন্তু ভন্টুর অভিধান-বহির্ভূত বাক্যাবলীকে সে ভয় করে। হয়তো তাহার মর্মান্তিক বেদনাকে কেন্দ্র করিয়াই সে কতকগুলা অদ্ভুত শব্দ সৃজন করিয়া বসিবে এবং যেখানে সেখানে আওড়াইতে থাকিবে। তা ছাড়া ভন্টুর পরিবারের সকলেরই সম্বন্ধে মৃন্ময়ের আর একটা কারণে কিঞ্চিৎ বিরূপ মনোভাব ছিল। স্বর্ণলতার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা ইহারা কেহই সহানুভূতির চক্ষে দেখে নাই, ইহাকে একটা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে ফেলিয়া তাহা লইয়া হাস্য-পরিহাস করিয়াছে। মৃন্ময়কে তাহারা অবশ্য অনুকম্পার চক্ষে দেখিত, কিন্তু মৃন্ময় পুনরায় যখন বিবাহ করিল, তখন তাহা তাহাদের নিকট আর একটা স্থূল রসিকতার খোরাক যোগাইল মাত্র। সেজন্য মৃন্ময় ভন্টুকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে।

সেদিন শঙ্করকে নিকটে পাইয়া, শঙ্করের নিজের জীবন-কাহিনী শুনিয়া এবং তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ সহৃদয় আলাপে মুগ্ধ হইয়া মৃন্ময় নিজের সমস্ত কথা শঙ্করকে খুলিয়া বলিয়াছিল। অনুরোধ করিয়াছিল, শঙ্কর যেন আবার আসে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির ফেরত তাই সে পুনরায় একদিন মৃন্ময়ের বাসায় গিয়া হাজির হইল। দেখিল, মৃন্ময় একাই আছে, মুকুজ্জেমশাই বাহিরে গিয়াছেন। শঙ্কর বলিল, চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

চলুন।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

খানিকদূর নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর মৃন্ময় বলিল, জ্বালাতন হয়ে উঠেছি।

কেন?

মৃন্ময় কোন উত্তর দিল না। শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, সে অন্য দিকে চাহিয়া আছে। ক্ষণকাল নীরবতার পর সহসা মৃন্ময় বলিল, চানাচুর খাবেন?

আপত্তি কি!

মোড়ে একটা লোক চানাচুর বিক্রয় করিতেছিল, মৃন্ময় আগাইয়া গিয়া তাহার নিকট হইতে তিন ঠোঙা চানাচুর খরিদ করিয়া ফেলিল। মনিব্যাগের ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটি পয়সা বাহির করিয়া কিছুক্ষণ সেটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল। ব্যাগটা উপুড় করাতে একটা আনি বাহির হইল। চানাচুরের দাম চুকাইয়া পয়সা দুইটি ব্যাগে পুরিতে পুরিতে বলিল; বাস্, দুটি পয়সা মাত্র বাকি রইল আর।

তিন ঠোঙা কিনলেন কেন?

একটা আমার স্ত্রীর জন্যে নিয়ে যাব, ভারি ভালবাসেন চানাচুর খেতে।

হাসিয়া মৃন্ময় একটি ঠোঙা পকেটে পুরিল। আসলে চানাচুরওয়ালাকে দেখিয়া হাসির কথাই তাহার মনে হইয়াছিল; হাসির জন্য কিনিতে গিয়াই ভদ্রতার খাতিরে আরও দুই ঠোঙা কিনিতে হইল।

চানাচুর চিবাইতে চিবাইতে নীরবে উভয়ে হাঁটিতে লাগিল। মিনিট-খানেক পরে শঙ্কর সহসা দেখিল, মৃন্ময় পাশে নাই, সে যে কখন একটা কাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, ভিড়ে শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারে নাই। শঙ্কর দেখিল, একটা শো-কেসের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া মৃন্ময় দাঁড়াইয়া আছে।

কি দেখছেন?

কি চমৎকার শাড়িখানা দেখুন, কি অদ্ভুত ময়ূরকণ্ঠী রঙ।

মৃন্ময় খানিকক্ষণ শাড়িটার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিল, যাই, চলুন।

আবার উভয়ে চলিতে শুরু করিল।

খানিকক্ষণ নীরবতার পর মৃন্ময় আপন মনেই যেন বলিল, কে জানে! তাহার পর শঙ্করের দিকে হঠাৎ ফিরিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনার কি ধারণা বলুন তো?

কি বিষয়ে?

আবার নতুন ক'রে শুরু করলে শান্তি ফিরে পাওয়া যাবে?

নিশ্চয়।

মৃন্ময় কোন উত্তর দিল না। শঙ্কর দেখিল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

শঙ্কর পুনরায় বলিল, না পাবার কোন কারণ নেই।

মৃন্ময় ইহারও কোন জবাব দিল না, আবার নীরবে দুইজনে পথ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া বলিল, কিছুতেই জুটছে না, আশ্চর্য!

কি?

চাকরি।

আমারও তো সেই অবস্থা।

আপনার চাকরি তো হয়ে গেছে।

কে বললে?

আপনি আসবার একটু আগে ভন্টু এসেছিল। সে বললে, তার আপিসে যে চাকরিটা ছিল, সেটা আপনি পেয়ে গেছেন।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, আমিও ওই চাকরিটার জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, ভন্টু বললে, সে তা জানত না। আমিও অবশ্য ভন্টুকে কিছু বলি নি, মানে—আপনি তো সবই জানেন।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

মৃন্ময় হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল, চলুন, ফেরা যাক। আর বেড়াতে ভাল লাগছে না।

বেশ, চলুন।

ফিরিবার পথে মৃন্ময় বলিল, একটা উপকার করবেন আমার?

কি?

আমি খবরের কাগজে মুড়ে আমার শালখানা লুকিয়ে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রি ক'রে হোক, কিছু টাকা কাল এনে দিতে হবে। এসব জিনিস কোথায় বিক্রি করে আমার জানা নেই, আপনার হয়তো জানা থাকতে পারে।

মৃন্ময়ের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া শঙ্কর দেখিল, মৃন্ময় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

২৯

সমস্ত শুনিয়া মুকুজ্জেমশাই নিবারণবাবুকে বলিলেন, আপনার মেয়ে দোষী কি নির্দোষ, সে কথা এ ক্ষেত্রে অবান্তর।

নিবারণবাবু সকরুণভাবে মুকুজ্জেমশাইয়ের দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করুন আপনি, একেবারে নির্দোষ সে। তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

আহা, আপনি অমন করছেন কেন? সে দোষী হোক নির্দোষ হোক, তাতে কিচ্ছু এসে যায় না।

খুব এসে যায়। সে নির্দোষ—এ বিশ্বাস না থাকলে কি তাকে ফিরে পাবার জন্যে আমি এমন উতলা হতাম?—নিবারণবাবুর গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, আপনি বিশ্বাস করুন, তার নিজের কোন দোষ নেই।

মুকুজ্জেমশাই হাসিমুখে উত্তর দিলেন, বেশ, বিশ্বাস করলাম।

নিবারণবাবু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চাহিতেই মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আমি তো আপনার কথাতে অবিশ্বাস করি নি, আমি বলতে চাইছিলাম যে, সে যদি দোষীও হয়, তা হ'লেও তাকে আমি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতাম।

নিবারণবাবু অবুঝের মত পুনরায় বলিলেন, না, সে দোষী নয়। মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন, আর উত্তর দিলেন না। একটু পরে নিবারণবাবু বলিলেন, তা হ'লে আপনি—

এ কাজে আমি কয়েকদিন পরে হাত দেব। শঙ্কর আর মৃন্ময়ের যতক্ষণ না একটা কিছু হচ্ছে, ততক্ষণ আমি অন্য কোন কাজে হাত দিতে পারছি না। আর একজনেরও খোঁজ করতে হবে আমাকে। আপনাকে এ বিষয়ে আর বার বার এসে বলতে হবে না, আমার যথাসাধ্য আমি ঠিক যথাসময়ে করব। আচ্ছা, এবার আমি উঠি। বেরুতে হবে একবার।

আচ্ছা, আমি এখন যাই তা হ'লে।

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন।

মুকুজ্জেমশাই কয়েকখানি টাইপ-করা দরখাস্ত গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিবারণবাবু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িলেন। মৃন্ময়কে এবং শঙ্করকে তিনি দুই স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি নিজে আরও দুই স্থানে যাইবেন, তা ছাড়া তিনটি আপিসে তিনখানি দরখাস্ত দিয়া আসিতে হইবে, পোস্টে না পাঠাইয়া সেখানকার পৈরবি-চুনরায়িত বাবুদের হাতে দিলে বেশি ফলপ্রদ হইবে। শিরীষকে পত্রখানিও অবিলম্বে পোস্ট্ করা দরকার, তাহা না হইলে সে আবার অকারণে ছুটি লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া পড়িবে। শঙ্করের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দ্রুতপদে পথ চলিতে চলিতে মুকুজ্জেমশাইয়ের সহসা মনে হইল, শিরীষকে বোধ হয় সুশীলাই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহা না করিলে শিরীষ মনে মনে হাজার চিন্তিত হইলেও একা এতদূরে আসিবার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে চাহিত কি না সন্দেহ। কিছুদূর গিয়া মুকুজ্জেমশাই

থামিলেন এবং অবশেষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে হইল, সুশীলাকে এ বিষয়ে কিছু লেখা উচিত। ফিরিয়া আসিয়া শিরীষবাবুর নামে লেখা খামটি জল দিয়া ভিজাইয়া খুলিয়া লিখিলেন—

কল্যাণীয়া সুশীলা,

তুমি সম্ভবত শঙ্করের জন্য বেশি উতলা হইয়াছ এবং শিরীষকে উত্যক্ত করিতেছ। শিরীষ অবশ্য তাহা আমাকে লেখে নাই, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি। শিরীষকে, উত্যক্ত করিও না, শঙ্কর ভাল আছে, শীঘ্রই তাহার একটা চাকরি জুটিবেই। অমিয়াকেও চিন্তিত হইতে বারণ করিও। ইতি—

মুকুজ্জেমশাই

খামটি জুড়িয়া মুকুজ্জেমশাই আবার বাহির হইয়া গেলেন।

৩০

দিন-দশেক পরে শঙ্কর সহসা কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিল যে, মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে সে আর থাকিবে না। নিজের জন্য নয়, চুনচুনের জন্যই তাহাকে মিসেস স্যানিয়ালের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার জন্য চুনচুনকে অহরহ বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইতেছে। চুনচুন নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু শঙ্করের আর সহ্য হইতেছে না। শঙ্কর হাঁটিতে হাঁটিতে বেলার বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বেলার বাসাতেই বরং সে আপাতত কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় লইবে, কিন্তু মিসেস স্যানিয়ালের ওখানে আর নয়। বেলার বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর কিন্তু অবাক হইয়া গেল। বাড়ির সামনে 'টু লেট' ঝুলিতেছে, দরজায় তালা-লাগানো। বেলা বাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে! শঙ্কর খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ গেল কোথায়? পাশের বাড়ির একটি ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, প্রায় পনেরো-ষোল দিন পূর্বে মিস মল্লিক বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ইহার বেশি কোন খবর সে আর বলিতে পারিল না, আশে-পাশে কেহই পারিল না। আশ্চর্য এই কলিকাতা শহর! কেহ কাহারও খবর রাখে না, প্রতিবেশীর খবর রাখার প্রয়োজনও কেহ অনুভব করে না। এখানে অতি-পরিচিত লোকেরও নাগাল পাইতে হইলে বাড়ির রাস্তা এবং নম্বর জানা থাকা প্রয়োজন। ঠিকানার সূত্রটুকু হারাইয়া গেলে, এই বিরাট জনসমুদ্রে লোকটাই হারাইয়া যাইবে। যদি দৈবানুগ্রহে অকস্মাৎ কোনদিন দেখা না হইয়া যায়, তাহা হইলে বেলাও হয়তো হারাইয়া গেল। হঠাৎ শঙ্করের মনে হইল, প্রফেসর গুপ্তের নিকট খোঁজ করিলে হয়তো কোন খবর পাওয়া যাইতে পারে, এ বাড়িটা তো প্রফেসর গুপ্তেরই একজন বন্ধুর বাড়ি। প্রফেসর গুপ্তের বাড়িতে গিয়া শঙ্কর শুনিল, প্রফেসর গুপ্ত বাড়িতে নাই। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গলিটা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক করিল, আর একদিন আসিয়া খোঁজ করিবে। আরও খানিকক্ষণ অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় ঘুরিয়া সে ঠিক করিল, ভন্টুর বাসায় যাওয়া যাক, এতক্ষণ সে হয়তো আপিস হইতে ফিরিয়াছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটিয়া ভন্টুর বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর দেখিল যে, আর একটু দেরি হইলে ভন্টুর সহিতও দেখা হইত না। এক-একদিন এ রকম হয়, কাহারও সহিত দেখা হয় না, যাত্রাটাই নিষ্ফল হইয়া যায়। ভন্টু বাইকে চড়িতে যাইতেছিল, শঙ্করকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তোর কাছেই যাব ভাবছিলাম, জালৃফিদারিক অ্যাফেয়ার সাক্সেস্ফুল, চাকরি হয়ে গেছে, দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই অ্যাপয়েণ্ট্মেণ্ট্ লেটার পাবি। জুলৃফিদার প্রথমটা একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্র নই, কচলে কচলে ব্যাঙ তেতো ক'রে ফেললাম, শেষটা দিক হয়ে জুলৃফিদার রাজী হ'ল।

শঙ্কর বলিল, আমার কিন্তু ভাই একটা অনুরোধ আছে।

কি?

চল্, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। কোন্ দিকে যাচ্ছিস তুই?

উন্মাদ হয়ে গেলি নাকি হঠাৎ? বাবার কাছে ফিরে যাবি না, চাকরি জুটিয়ে দিলে করবি না, একাধিক মোল্লা জুটিয়েছিস—

শঙ্কর হাসিয়া ফেলিল।

কোন ভয় নেই তোর, সব ঠিক হয়ে যাবে। মৃন্ময়কে এ চাকরিটায় ঢুকিয়ে দে তুই।

তার মানে জুলফিদারকে ফ্রেশ খজলাতে হবে। খজলে খজলে লোকটাকে এমনিই তো ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেলেছি, বেশি খজলালে আবার দক্‌চে না যায়!

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না, নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। সে বারম্বার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। মুক্তো মনের মধ্যে বারম্বার আনাগোনা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হাঁটিয়া শঙ্কর বলিল, আমি আর দশরথবাবুর কাছে যাব না, তুই যা।

ভন্টু মুখটা স্থচালো করিয়া বলিল, কেন, লজ্জা করছে বুঝি?

অনর্থক একটা অপ্রিয় জিনিসের ভেতর গিয়ে লাভ কি?

ওরিজিন্যাল কম্‌প্লিট্‌লি চেঞ্জ্‌ড্‌, সে মানুষই আর নেই। গুম হয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে, কথা-টথা একদম বলে না। যে মেয়েমানুষটাকে রেখেছিল, সেটা খুন হয়ে যাবার পর মিস্টার ফাইভ কেমন যেন হয়ে গেছে, তা ছাড়া হাঁপানিতে ধরেছে।

কে খুন হয়ে গেছে? মুক্তো?

খবরের কাগজে পড়িস নি তুই? মহা হৈ-চৈ হ'ল যে কদিন তাই নিয়ে।

খবরের কাগজের সঙ্গে অনেক দিন সম্পর্ক নেই। সত্যি জানিস তুই? কে খুন করলে?

কতকগুলো গুণ্ডা। তাকে খুন ক'রে তার গয়নাপত্তর টাকাকড়ি যা ছিল সব নিয়ে গেছে। একটা ভাঙা তোরঙ্গ খালি প'ড়ে ছিল, ওরিজিন্যালের কাছে আছে সেটা।

খানিকক্ষণ হাঁটিয়া উভয়ে ওরিজিন্যালের বাসার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়িখানা যেন স্তূপীকৃত পুঞ্জীভূত খানিকটা অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলো নাই। ভন্টু সাইকেলের ঘণ্টা বাজাইতেই সম্মুখের দ্বার খুলিয়া এক ব্যক্তি সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, কে, ভন্টুবাবু নাকি? 'কদিন আসেন নি, আমি ভাবছিলাম, কি হ'ল আবার আপনার! কেমন আছেন?

অবুস্থবু।

ভেতরে আসুন, একটু পরামর্শ আছে। সঙ্গে উনি কে?

চাম গ্যান্ঢঅ।

দাঁড়ান, আলোটা জ্বালি।

ভদ্রলোক পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন।

ভন্টু শঙ্করের কানে কানে চুপি চুপি বলিল, ইনি হচ্ছেন নেপো, দই মারতে এসেছেন। ওরিজিন্যালের দূরসম্পর্কের ভাগনে হয়, নিঃসন্তান বড়লোক মামার দুঃখে বিগলিত হয়ে সেবা করতে এসেছে রাস্কেল। হাড় কিপ্‌টে।

ঘরের ভিতর আলো জ্বলিয়া উঠিল।

ভন্টু বলিল, চল্‌, এবার যাওয়া যাক।

শঙ্কর ভিতরে গিয়া লোকটিকে প্রত্যক্ষ করিল। লোকটি যুবক নয়, প্রৌঢ়। গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া, গোঁফ দাড়ি নাই, গলায় কণ্ঠি, চোখে মুখে চতুরতার সহিত বৈষ্ণবভাবের অদ্ভুত একটা সমন্বয়। ভন্টু বলিল, আপনি কি এতক্ষণ অন্ধকারে ব'সে ছিলেন নাকি?

ভদ্রলোক এতক্ষণ চাহিয়া ছিলেন, ভন্টুর কথা শুনিবামাত্র প্রশান্তভাবে চোখ দুইটি বুজিয়া ফেলিলেন এবং কথাটা যেন ভালভাবে প্রণিধান করিয়া পুনরায় চাহিলেন।

কেরোসিনের আলো জ্বেলে কতখানি অন্ধকার আমরা দূর করতে পারি, বলুন?

লন্‌কালন্‌কি রেখে আসল কথাটা কি বলুন ?

মামা যে একেবারে কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, তার উপায় কি করি বলুন আগে আপনি।—এইটুকু বলিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন এবং খানিকক্ষণ বুজাইয়া রাখিয়া আবার খুলিলেন। শঙ্কর লক্ষ্য করিল যে, নিজের এবং অপরের কথোপকথনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তিনি চক্ষু বোজেন এবং খোলেন। ইহার মধ্যে বেশ একটা ছন্দ আছে।

শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন এবং ভন্‌টুর দিকে ফিরিয়া চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

উনি চাম্‌ গ্যান্‌চঅ—শঙ্কর, আমার একজন পুরোনো বন্ধু। এবং শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, ইনি হচ্ছেন নেফিউ-শ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্র কর—দশরথবাবুর ভাগ্নে, মামার জন্যে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন ক'রে ফেলছেন।

সতীশবাবু সবিনয়ে শঙ্করকে নমস্কার করিতে শঙ্করও প্রতি-নমস্কার করিল।

ভন্‌টু বলিল, দশরথবাবুর সঙ্গে দেখা হবে এখন ?

সতীশবাবু স্মিতহাস্যসহকারে চক্ষু দুইটি বুজিয়া এবং খুলিয়া বলিলেন, কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই, তিনি একটিও কথা বলবেন না, খালি বিরক্ত হবেন। আগে যা-ও দু-একটা কথা বলছিলেন, আজকাল তা-ও বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। দূর থেকে অবশ্য দেখে যেতে পারেন।

বেশ তো, এসেছি যখন, দূর থেকেই দেখে যাওয়া যাক।

তা হ'লে আসুন দোতলায়। আলো-টালো নিয়ে যাব না, জানলা দিয়ে লুকিয়ে দেখে যান। লোকজন কেউ এলে বড্ড অসোয়াস্তি বোধ করেন। অবশ্য এক আপনি ছাড়া আজকাল আর বিশেষ কেউ আসেনও না, সুখের পায়রারা সব উড়ে চ'লে গেছে। আপনিই যা মাঝে মাঝে খবর-টবর নেন।

সতীশবাবু চক্ষু বুজিলেন এবং খুলিলেন।

ভন্‌টু কণ্ঠ হইতে বার-দুই গোঁক গোঁক শব্দ করিল।

শঙ্কর কিছুই বলিল না, মুক্তোর মৃত্যু-সংবাদে তাহার সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সতীশবাবুর পিছু পিছু শঙ্কর ও ভন্টু দোতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দোতলাও অন্ধকার। প্রকাণ্ড দালানটার এক প্রান্তে শুধু মৃদু একটা আলোর রেখা দেখা যাইতেছিল।

সতীশবাবু চুপিচুপি বলিলেন, ওই ঘরটাতে আছেন উনি, আপনারা চুপিচুপি এগিয়ে যান, একটু গেলেই জানলা দিয়ে দেখতে পাবেন।

কিছুদূর গিয়াই ওরিজিন্তালকে দেখা গেল। ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে, একটা কালো র‍্যাপারে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ওরিজিন্তাল বসিয়া আছেন। মুখটা ভাল দেখা যাইতেছে না, কিন্তু যতটুকু দেখা যাইতেছে ততটুকুই যথেষ্ট ভীতিকর। সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, রগের এবং কপালের শিরাগুলি স্ফীত, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি যেন অক্ষিকোটর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। একটা তীব্র ঘৃণা সমস্ত চোখে মুখে যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। দুই হাতে দুইটা বালিশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া ওরিজিন্তাল হাঁপাইতেছেন।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সতীশবাবুর পিছু পিছু শঙ্কর ও ভন্টু পুনরায় নামিয়া আসিল। ভন্টু যে জন্য আসিয়াছিল, তাহা এখন উত্থাপন করা যদিও একটু অসমীচীন মনে হইল, তথাপি একবার চেষ্টা করিতে সে ছাড়িল না।

আচ্ছা, সাইকেলের একটা ভাল সীট সস্তায় বিক্রি ছিল, দশরথবাবু সেটা দেবেন বলেছিলেন আমাকে। সেটা কি ক'রে পাওয়া যেতে পারে বলতে পারেন?

চক্ষু দুইটি বুজিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সতীশবাবু চক্ষু দুইটি পুনরুন্মীলন করিলেন এবং অত্যন্ত নিরীহভাবে মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, আমি তো ওসবের কিছুই জানি না, দোকানের খবর নেবার কি আর অবসর আছে?

দেখিল, চুনচুন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্করের মনে হইল, সে যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

৩১

একটা বিরাট প্রান্তরে বীভৎস তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। সুরা-উন্মত্ত ঘূর্ণিত-লোচন ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ একদল পুরুষ অট্টহাস্য করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। তাহাদের গলায় নারী-মুণ্ডের মালা, কটি বেষ্টন করিয়া নারী-হস্ত-পদ-রচিত মেখলা। মুক্তোর দেহটা অদূরে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই বিচ্ছিন্ন দেহটা ঘিরিয়াই নৃত্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদূরে একদল বন্দিনী—মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, শৈল, রিনি, চুনচুন—তাহাদের ঘিরিয়াও একদল উন্মত্ত পুরুষ পাশব চীৎকারে প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে, সকলের হাতে খড়্গ। নিকটে অভ্রভেদী একটা রক্তাক্ত যূপকাষ্ঠ...

সহসা শঙ্করের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। স্বপ্নের ঘোরটা তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই, মাংসলোলুপ নরপশুদের উন্মত্ত চীৎকার তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল। খানিকক্ষণ মূহ্যমানের মত সে বিছানায় বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হাত-মুখ ধুইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিতেই মিসেস স্যানিয়াল আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন, দু দিন থেকে আপনার এই চিঠিখানা এসে প'ড়ে আছে, আমার আর দিতেই মনে থাকে না। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, মনে থাকবে কি ক'রে, আপনার দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল। মিসেস স্যানিয়াল ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া অগ্নিগর্ভ এবং কর্তব্যদ্যোতক একটা দৃষ্টি শঙ্করের দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং শঙ্করকে চিঠিখানা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর খামটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, দামী নীল রঙের খাম, হাতের লেখা চিনিতে পারিল না। খুলিয়া দেখিল, বেলার চিঠি—

শঙ্করবাবু,

আপনাকে ইতিপূর্বে কখনও চিঠি লিখি নি এবং জীবনে আর হয়তো কখনও লেখবার সুযোগও হবে না। আজও না লিখলে চলত, কিন্তু দেশ ছেড়ে চ'লে যাবার আগে আপনার সঙ্গে (কেবল আপনার সঙ্গেই) একবার দেখা ক'রে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি যে চ'লে যাচ্ছি, এ খবর কাউকে জানালাম না; জানাতে ইচ্ছে হ'ল না। যে বুড়ো সায়েবটিকে রোজ পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতাম, তাঁর সঙ্গে বিলেত চললাম। তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সংসারে আপন জন কেউ নেই, তিনি অনেক দিন থেকেই আমাকে বলছিলেন তাঁর সঙ্গে যেতে। দেশ ছেড়ে চ'লে যেতে ইচ্ছে ছিল না ব'লে এতদিন রাজী হই নি। কিন্তু এখন দেখছি, এ দেশে আমার মত মেয়ের পক্ষে ভদ্রভাবে বাস করা অসম্ভব। এ দেশে যে কোন মেয়ে, তা সে সুরূপা কুরূপা যাই হোক, যদি ভদ্রভাবে থাকতে চায়, তা হ'লে তাকে বিয়ে ক'রে অর্থাৎ একজন পুরুষের পদানত হয়ে থাকতে হবে—সে পুরুষটি যুবক বৃদ্ধ, মূর্খ বিদ্বান, সচ্চরিত্র দুশ্চরিত্র যাই হোন। অধিকাংশ মেয়ের পক্ষে এইটেই হয়তো বাঞ্ছিত পরম গতি এবং সমাজের কল্যাণের পক্ষে এই হয়তো সুচিন্তিত সুষ্ঠু ব্যবস্থা। আমি কিন্তু পারলাম না, আমার বিদঘুটে রুচি নিয়ে কিছুতেই এ ব্যবস্থা মানতে প্রবৃত্তি হ'ল না আমার। এর জন্যে অহরহ ক্ষণে ক্ষণে অপমানিত হয়েছি, কিন্তু দমি নি; তবে শেষটা হার মানতেই হ'ল। এবার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছি। কারণ এখন এটা নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে, এ দেশে থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। ও-দেশ নিরাপদ কি না জানি না, কিন্তু যত দূর শুনেছি তাতে মনে হয়, ওরা আর যাই করুক, নারীকে অপমান করে না। বহুকালব্যাপী স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে ওদের সে ভয় ঘুচেছে। এসব অবশ্য আমাদের কল্পনা, সত্যি সত্যি ব্যাপারটা যে কি, স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যাবে না। সেখানেও যদি গিয়ে দেখি যে, ও-দেশও এ দেশেরই মত, তা হ'লে অনতিক্রম্য নিয়তিকে মেনে নিয়ে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করব যে, আমরা কাগজে কলমে যতই

না কেন নিজেদের মহিমার ঢাক পেটাই, আসলে এখনও মেয়েরা পুরুষ-পদানত জীব ছাড়া আর কিছু নয়, এবং মানব-সভ্যতার পরিধি তার আদিম গুহা ছেড়ে বেশি দূর অগ্রসর হয় নি।

আমাদের জাহাজ ৩রা ছাড়বে। আমি বাসা ছেড়ে দিয়েছি, মিস্টার স্মিথের ফ্ল্যাটেই আছি, ৭৫০নং চৌরঙ্গী স্ট্রীট। আপনি যদি সময় ক'রে একবার দেখা ক'রে যান, বড়ই সুখী হব। আপনি আমাকে যে বায়রন-গ্রন্থাবলী দিয়েছিলেন, সেটা আমি সযত্নে রেখেছি এবং যতদিন বাঁচব সযত্নে রাখব। কিন্তু আপনার একটি অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি—I could not accept Byron.

কাল নিশ্চয়ই আসবেন, সকালের দিকে আমি বাসায় থাকব। ইতি—

বেলা মল্লিক

শঙ্কর ক্যালেণ্ডারের পানে চাহিয়া দেখিল, আজ পাঁচ তারিখ। পরশুদিন বেলার জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছে। শঙ্কর কল্পনায় দেখিতে লাগিল, জাহাজের রেলিঙে ভর দিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বেলা তাহার পথপানে চাহিয়া আছেন।

৩২

দেখিতে দেখিতে সাত দিন কাটিয়া গেল।

এই সাতটা দিন শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটাইয়া দিল। যেদিন সে বেলার চিঠি পাইল, সেই দিনই সে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া মৃন্ময়ের বাসায় আসিয়া উঠিল। মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ভন্টুর আপিসে মৃন্ময়ের চাকরিটা হইয়া যাওয়াতে মুকুজ্জেমশাই শঙ্করের চাকরির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে একটি ভাল চাকরি খালি ছিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের পরিচিত পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের একজন পদস্থ

অফিসার সিমলায় ছিলেন, চিঠি লেখার চেয়ে নিজে গেলে বেশি কাজ হইবে ভাবিয়া মুকুজ্জেমশাই নিজেই সেখানে গিয়াছিলেন। মৃন্ময় কাজে যোগদান করিয়াছিল, সুতরাং শঙ্করের দিনগুলি রাস্তায় এবং ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটিতেছিল। দিনে সে মৃন্ময়ের সহিত খাইয়া বাহির হইয়া যাইত এবং রাত্রে ফিরিত সকলে ঘুমাইয়া পড়িবার পর। তাহার খাবার বাহিরের ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকিত। সে মৃন্ময়কে এড়াইয়া চলিতেছিল। তাহার অত্যুচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা সে হজম করিতে পারিতেছিল না; কারণ ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত যে, নিজের অহঙ্কারের প্রেরণাতেই সে মৃন্ময়ের উপকারটা করিয়াছে। ব্যাপারটা কাকতালীয়বৎ। মৃন্ময় যদি না-ও থাকিত, তাহা হইলেও সে ভন্টুর আপিসে ভন্টুর অধস্তন কর্মচারী হইয়া কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু মৃন্ময় ইহা জানে না, সে শঙ্করকে দেখিলে এমন একটা মুগ্ধভাব করে, যেন সে দেব-দর্শন করিতেছে। শঙ্কর মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়ে, অনুপার্জিত এই শ্রদ্ধা গ্রহণ করিতে তাহার সঙ্কোচ হয় এবং এইজন্যই তাহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। একজন মানুষ আর একজন মানুষের সান্নিধ্য যে কত কারণেই এড়ায়!

শঙ্কর শুধু যে মৃন্ময়কে এড়াইয়া চলিতেছিল তাহা নয়, সে সকলকেই এড়াইয়া চলিতেছিল। মানুষের সঙ্গই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মিল্‌টন, শেক্‌স্‌পীয়ার, শেলী, কীট্‌স্‌, রবীন্দ্রনাথের জগতে পরিভ্রমণ করিয়া, অবাস্তব কল্পলোকের নর-নারীর সাহচর্যে সে নিজেকেও ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। ধীরে ধীরে আবিষ্কার করিতেছিল যে, এই অবাস্তব লোকের প্রাণীগুলিকেই বাস্তব জীবনের স্থায়ী অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ উহারা নির্ভরযোগ্য, চিরকাল উহাদের এক রূপ। শেলী কীট্‌সের স্কাইলার্ক নাইটিঙ্গেল কখনও বেসুরা গাহিবে না, রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কখনও জরাগ্রস্ত হইবে না, শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের চরিত্রগুলি চিরদিন এক সুরে এক ভাবে এক ভঙ্গীতে কথা বলিবে, ব্রুটাস কখনও দেশদ্রোহী হইবে না, ওফেলিয়া কখনও পাপীয়সী হইবে না, ইয়াগো কখনও মহাত্মা হইবে না। কিন্তু বাস্তব

জগতের ক্ষণভঙ্গুর মানুষেরা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া বুদ্‌বুদের মত অবশেষে একদিন বিলীন হইয়া যাইবে। তাহাদের উপর নির্ভর করিলে নিরাশ হইতে হইবে। কল্প-জগতের সার্থক সৃষ্টিগুলি অমর এবং অপরিবর্তনীয় বলিয়াই নির্ভরযোগ্য। তাহারা আজ এক কথা—কাল আর এক কথা বলে না। স্বপ্নের পাখায় ভর করিয়া শঙ্করের মন দিব্যলোকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সহসা একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে রূঢ় মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিতে হইল। বাসায় ফিরিয়া টেলিগ্রাম পাইল, সন্ন্যাসরোগে বাবা মারা গিয়াছেন। টেলিগ্রামটার দিকে সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

ট্রেনে বসিয়া সে ভাবিতেছিল, বাবার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল না কেন? সমস্ত অন্তরটা মাঝে মাঝে মুচড়াইয়া উঠিতেছে, মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা, কিন্তু চোখে জল নাই। কিছুতেই সে কাঁদিতে পারিল না, ট্রেনের কামরায় একা শুষ্ক চক্ষে অন্ধকারের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

৩৩

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল মাস-দেড়েক পরে। আসিয়া স্টেশন হইতে সে সোজা ভন্টুর বাসায় গেল।

কবে এলি?

এখনই, সোজা স্টেশন থেকে তোর কাছেই এসেছি।

কেন?

তোর সেই কানা করালীর খবর কি বল্ তো?

তাকে নিয়ে কি করবি?

বাবা এক অদ্ভুত উইল ক'রে গেছেন। আমি জানতাম না, করালীচরণ বক্‌সির সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব ছিল। বাবা মায়ের নামে ব্যাঙ্কে একটা ফিক্‌সড্

ডিপোজিট ক'রে গেছেন, তারই সুদ থেকে মায়ের চ'লে যাবে। দেশের বাড়িটাও মাকে দিয়ে গেছেন। আর বাকি সম্পত্তির সমস্ত ভার দিয়ে গেছেন করালীচরণ বক্‌সির ওপর। উইলে লেখা আছে—করালীচরণ যদি দেখেন যে, আমি নিজের পায়ে ভালভাবে দাঁড়াতে পেরেছি, তা হ'লে, এবং যদি তিনি সমীচীন মনে করেন, তা হ'লে তাঁর বাকি সম্পত্তি আমি নয়—আমার স্ত্রী পাবে। আমি নিজের পায়ে যদি ভালভাবে দাঁড়াতে না পারি, তা হ'লে সমস্ত সম্পত্তি কোন সৎকার্যে দান ক'রে দিতে হবে, আমার স্ত্রী কিছু পাবে না।

ভন্টু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, করালীচরণ তো দ্রাবিড়ে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। তবু চল্, তার বাড়ির একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আসা যাক। অনেক দিন যাওয়া হয় নি সেখানে।

মহা মুশকিলে প'ড়ে গেছি ভাই, মা ভয়ানক মুষড়ে গেছে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না আমাকে ; অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি আমি। উইলের কথা মা জানে না। আমি করালীচরণকে শুধু বলতে এসেছি, এ কথা মাকে কিছুতে যেন জানানো না হয়। একটা চাকরি জুটলেই মাকে এনে নিজের কাছে রাখব আমি।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি তুই রাস্কেল, তোর কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। মুকুজ্জেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর ? সে চাকরিও তোর হয় নি, উনি যাবার আগেই লোক বাহাল হয়ে গেছে।'

উভয়ে করালীচরণের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

গলিতে ঢুকিয়াই পানওয়ালীর সঙ্গে দেখা হইল। ঠিক মোড়েই তাহার দোকান। দোকানে দুইজন খরিদ্দার দাঁড়াইয়া ছিল। ভন্টুকে দেখিবামাত্র মিশিমণ্ডিত দন্ত বাহির করিয়া একমুখ হাসিয়া পানওয়ালী বলিল, ঘর খোলাই

আছে, আপনারা বসুন গিয়ে, আমি এই পান ক খিলি সেজে দিয়েই যাচ্ছি।

এই বলিয়া নিপুণ ত্বরিতহস্তে চেরা পানগুলিতে সে চুন ও খয়েরগোলা মাখাইতে লাগিল। ভন্‌টু ও শঙ্কর বক্‌সিমশায়ের বাড়ির দিকে আগাইয়া গেল। দ্বার উন্মুক্তই ছিল। তাহা দেখিয়া ভন্‌টু বলিল, দেখেছিস মাগীর আক্কেল, কপাট খুলে রেখে দিয়েছে, কেউ ঢোকে যদি! বক্‌সিমশায়ের অনেক জিনিসপত্তর আছে ঘরের মধ্যে, এই মোল্লাদের কোন কাজ দিয়ে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া উভয়েই একটা দুর্গন্ধ অনুভব করিল। পচা ঘায়ের গন্ধ। মোস্তাক চৌকির উপর শুইয়া ছিল, তাহারা প্রবেশ করিতেই উঠিয়া বসিল এবং মুখবিকৃতি করিতে করিতে অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিলিটারি কায়দায় তাহাদের স্যালিউট করিল। মোস্তাকের বাঁ পায়ের পাতায় ময়লা ন্যাকড়া দিয়া বাঁধা প্রকাণ্ড একটা ঘা। পুঁজরক্তে ন্যাকড়াটা ভিজিয়া রহিয়াছে এবং তাহা ঘিরিয়া বহু মাছি ভনভন করিতেছে। মোস্তাকের মুখময় গোঁফ-দাড়ি, মাথায় অবিন্যস্ত চুলের বোঝা ধুলায় অযত্নে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত-বেদনাতুর। স্যালিউট করিয়া মোস্তাক আবার চোখ বুজিয়া চৌকির উপর শুইয়া পড়িল, কোন কথা বলিল না, যেন তাহার যাহা করিবার ছিল করিয়া ফেলিল, আর কিছু করিবার নাই। ভন্‌টু ও শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এ কে?

ও মোস্তাক, বক্‌সিমশায়ের বন্ধু।

পানওয়ালী আসিয়া প্রবেশ করিল।

ওকে নিয়েই বিপদে পড়েছি বাবু। বলছে, পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চ'লে গেছে। পরশু থেকে এখানে এসেছে, কিন্তু ওষুধ-বিসুধ কিছু লাগাতে দেবে না, পাড়ার ডাক্তারবাবুটির খোশামুদি ক'রে ডেকে এনে দেখালুম, তাঁর ব্যবস্থামত তুলো আইডিন ব্যাণ্ডেজ কিনে আনলুম; কিন্তু আনলে কি

হবে, ও পায়ে হাত দিতে দেবে কি? একে নিয়ে আমি কি করি বলুন তো?

ভন্টু বলিল, হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।

পানওয়ালী ইহাতে আপত্তি করিল। মাথা নাড়িয়া বলিল, না, তা আমি পারব না, হাসপাতালে শুনেছি বড় কষ্ট দেয় গরিবদের। ওরে পাগলা, ভাত খেয়েছিস?

মোস্তাক কোন জবাব দিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। পানওয়ালা ঘরের কোণের দিকে আগাইয়া গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল।

খেয়েছে দেখছি। কত ভাত ছড়িয়েছে! কাল তো সমস্ত রাত খেলে না, সকালে এসে দেখি, ভাতের থালা যেমনকার তেমনই প'ড়ে আছে; সে ভাত আবার কুকুরকে ধ'রে দিই। আ আমার কপাল, একেই বলে পাগল: শাকচচ্চড়ি সব খেয়েছে, মাছটা খায় নি! মাছের পেটিটা দিলাম বেছে কাঁটা নেই ব'লে—ভাগ্যিস বেরালে নিয়ে যায় নি! নে, খা।

পানওয়ালী মাছের পেটিটা তুলিয়া মোস্তাকের মুখে ধরিল, মোস্তাক কুপ করিয়া খাইয়া ফেলিল। ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, কাকটা কই?

ওধারে উঠোনে আছে। কি দস্যি কাক! পরশু হলুদজল ক'রে নাওয়াতে গেছি, এমন ঠুকরে দিয়েছে হাতে যে, জ্ব'লে মরি!

পানওয়ালী হাতের ক্ষত দেখাইয়া হাসিল। আচ্ছা, এই বইগুলোর কি করি বলুন তো? উই ধরেছে, ঝেড়ে ঝেড়ে রোদে দিয়েছিলুম। কবে আসবে? কোন খবর পেয়েছেন?

কিছু না।

খবর পেলে আগে থাকতে জানাবেন আমাকে একটু। তা না হলে আমাকে এখানে দেখলে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে যাবে।

মিশি-মাখানো দাঁত বাহির করিয়া পানওয়ালী হাসিল।

বইগুলো চল তো দেখি! অনেক দামী বই আছে।

দেখুন না।

শঙ্কর চুপ করিয়া ছিল। পানওয়ালী, মোস্তাক এবং খাঁচায় পোরা দাঁড়কাকের সহিত একচক্ষু করালীচরণকে সংযুক্ত করিয়া তাহার মন এক বিচিত্র রসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই লোকটিরই হাতে বাবা বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়া গিয়াছেন! সহসা একটা কথা মনে করিয়া লোকটার উপর শঙ্করের শ্রদ্ধা হইল। তাহার বিবাহ-সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করালীচরণ করিয়াছিলেন, তাহা তো অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে।

ভন্টু আলমারি খুলিয়া দেখিতেছিল।

ওরে, এখানে একটা লম্বা খামে কি একটা দলিলের মত রয়েছে, দেখ্ তো, এটাই তোর ব্যাপার কি না!

হ্যাঁ, এ তো বাবার হাতের লেখা।

খুলিয়া দেখিল, বাবার উইলের একটা কপি এবং করালীর নামে একখানি চিঠি। চিঠিতে অম্বিকাবাবু করালীচরণকে এই ভার গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। সমস্ত পড়িয়া শঙ্কর বলিল, এগুলো এখন এখানেই থাক্, করালীবাবু এলে তখন যা হয় করা যাবে।

ভন্টু পানওয়ালীকে বলিল, আমরা চললাম এখন।

পানওয়ালী চোখের ইশারায় ভন্টুকে একটু আড়ালে ডাকিয়া বলিল, পাগলাটাকে আপনি একটু ভয় দেখিয়ে শাসন ক'রে দিয়ে যান, যাতে ও ওষুধ লাগাতে দেয় আমাকে।

ভন্টু মোস্তাকের কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, তুমি যদি ওষুধ লাগাতে না দাও, কালই তোমাকে হাসপাতালে দিয়ে আসব, সেখানে পা কেটে দেবে তোমার।

মোস্তাক চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

পানওয়ালী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ভন্টু ও শঙ্কর বাহির হইয়া আসিল।

শঙ্কর বলিল, চল্, মৃন্ময়ের বাসায় যাই।

তুই যা, আমাকে জুল্‌ফিদারের কাছে যেতে হবে।—বলিয়া সে বাইকে সওয়ার হইল।

৩৪

মৃন্ময় বাড়িতে ছিল না। গিয়াই মুকুজ্জেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল।

সব নির্বিঘ্নে হয়ে গেল তো?

হ্যাঁ।

শিরীষের সঙ্গে দেখা হ'ল? অমিয়া এসেছিল?

সকলেই এসেছিল। শ্বশুরমশায় চ'লে গেলেন, অমিয়া মায়ের কাছেই রইল।

তোমার বাবা কোন উইল ক'রে গেছেন নাকি?

শঙ্কর উইলের কথা খুলিয়া বলিল, মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট ইহা গোপন করার কোন প্রয়োজন সে দেখিল না। সব শুনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের চোখ দুইটি হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নিজের পায়ে তো তুমি দাঁড়িয়ে গেছই, চাকরি তোমার হয়ে গেছে।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া ইংরেজীতে লেখা একখানি চিঠি আনিয়া দিলেন। জনৈক পি. দত্ত তাহাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে 'আদর্শ' নামক বাংলা মাসিক-পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত করিতেছেন। তিনি শঙ্করকেই কলিকাতায় আপিস খুলিবার ভার দিয়াছেন। মাসিক এক শত টাকা বেতনের মধ্যে একজন সহকারী সম্পাদক ও একটি ক্লার্ক নিয়োগ করিতে এবং একটি ভাল প্রেসে কাগজ ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। কাগজের ছাপা এবং গেট-আপ যেন ভাল হয়, প্রেসের বিল তিনি আলাদা দিবেন। লেখকদেরও যথোচিত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। শঙ্করের পত্র পাইলেই তিনি কলিকাতার ব্যাঙ্কে টাকাকড়ির সব বন্দোবস্ত করিবেন।

উত্তেজনায় শঙ্করের কানের দুই পাশ গরম হইয়া উঠিল। কে এই পি. দত্ত তাহার স্বপ্ন সফল করিবার জন্য বোম্বেতে বসিয়া আছেন?

মৃন্ময় উপরে ছিল, নামিয়া আসিল।

আপনার আর একখানা চিঠি এসেছে, আমার কাছে আছে।

টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একটি মোটা খামের চিঠি মৃন্ময় শঙ্করকে দিল। শঙ্কর দেখিল, সুরমার চিঠি।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আমার কাজ তো শেষ হয়ে গেল। আজ রাত্রেই আমি খুলনায় যাচ্ছি।

খুলনা? কেন?

দরকার আছে।

মুকুজ্জেমশাই মনোরমা এবং আসুমির খোঁজে বাহির হইতেছেন সে কথা আর বলিলেন না, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা তাঁহার স্বভাব নয়। তিনি নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলেন।

লোকের সঙ্গ শঙ্করের আর ভাল লাগিতেছিল না; সুরমার পত্রটা পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

গড়ের মাঠে একটি নির্জন অংশে বসিয়া শঙ্কর সুরমার পত্রখানি পড়িতেছিল। খামের ভিতর দুইখানি চিঠি ছিল—একটি সুরমার, আর একটি উৎপলের। সুরমা লিখিয়াছে—

শঙ্করবাবু,

এই আপনার কাছে আমার প্রথম চিঠি। অর্থাৎ এ চিঠির ভাব, ভাষা, হাতের লেখা সবই আমার। এতদিন আপনাকে যে সব চিঠি আমি লিখেছি, সেগুলোর হাতের লেখা আমার ছিল বটে, কিন্তু ভাব ভাষা আমার ছিল না। আপনার বন্ধু চিঠিগুলো বিলেত থেকে লিখে পাঠাতেন, আমি সেগুলো টুকে দিতুম। আপনার বন্ধুকে চেনেন তো? একটা অদ্ভুত রকম কিছু ক'রে মজা দেখতে পেলে আর কিছু চান না উনি। এমন কি সেবারে যে ফোটোগুলো পাঠিয়েছিলুম, সেগুলোও উনি বিলেত থেকে তুলে পাঠিয়েছিলেন। ওঁর পাল্লায় প'ড়ে আপনার সঙ্গে এ

যে সামান্য চাতুরীটুকু করেছি, এর জন্যে আমি লজ্জিত এবং এর জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি—যদিও পনেরো আনা দোষ আপনার বন্ধুটিরই। উনিও এই সঙ্গে আপনাকে চিঠি দিচ্ছেন, তাতে সব কথা জানতে পারবেন। আমার নমস্কার নিন। আশা করি, ভাল আছেন। ইতি—

শ্রীসুরমা ঘোষ

উৎপল লিখিয়াছে—

ভাই শঙ্কর,

এতদিন সুরমার বেনামীতে তোমাকে যে চিঠিগুলি লিখেছি, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তোমার নাড়ী পরীক্ষা করা। কলকাতায় লক্ষ্য করেছিলাম যে, সুরমার সান্নিধ্যে তোমার নাড়ী কিঞ্চিৎ দ্রুত হয়েছিল। সে ধারণা আরও দৃঢ় হ'ল, যখন দেখলাম, তুমি আমার আসবার দিন হন্তদন্ত হয়ে হাওড়া স্টেশনে একরাশ লাল লাল গোলাপ নিয়ে হাজির হ'লে। ট্রেনে যেতে যেতে মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগল, সুরমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে ফেলা গেল যে, তোমার ঈষৎ-সচেতন রস-পিপাসাকে উতলা ক'রে তুলতে পারে এমন একটা কিছু ক'রে দূর থেকে ব'সে মজা দেখতে হবে। চিঠি লেখাই সাব্যস্ত হ'ল, কিন্তু সুরমা নিজে কিছুতেই চিঠি লিখতে রাজী হ'ল না। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? আমাদের দেশের মেয়েরা সব বিষয়েই সর্বক্ষণ সিরিয়াস, রসিকতাকে নিছক রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করা ওদের সাধ্যাতীত। যাই হোক, সুরমাকে অনেক কষ্টে রাজী করালুম যে, আমি চিঠিগুলো লিখে দেব, ও টুকে পাঠিয়ে দেবে এবং তোমার উত্তর এলে উত্তরগুলো আমার কাছে পাঠাবে। এটা অবশ্য আশা করি নি যে, তুমি 'যাও পাখি ব'লো তারে' মার্কা গোলাপী চিঠির কাগজে সবুজ কালি দিয়ে রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট বাষ্পাচ্ছন্ন নয়নে উচ্ছ্বসিত প্রেম-পত্র লিখতে থাকবে। তবে এটা নিশ্চয়ই আশা করেছিলুম যে, তোমার সভ্যভব্য চিঠির মধ্যেও এমন এক-আধটা খোঁচ থাকবে, যা উপভোগ ক'রে আমরা আনন্দ পাব। তুমি কিন্তু আমাদের নিরাশ করেছ। অমন নিরামিষ চিঠি বোধ হয় ভাইও বোনকে লেখে না। নিরাশ হয়ে অবশ্য আনন্দিতই হয়েছি এবং বুঝেছি, কলকাতায় সুরমার সান্নিধ্যে তোমার মনে যে রস-সঞ্চার

হয়েছিল, সে রকম রস-সঞ্চার যে কোন সুন্দরী যুবতীর সান্নিধ্যে যে কোন সুস্থ যুবকের মনে হওয়া জৈবিক ধর্ম অনুসারেই স্বাভাবিক। বিলেতে থাকবার সময় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ সত্য দু-চারবার হৃদয়ঙ্গম করেছি। রস-সঞ্চার হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু রস-দমন করাটাই মনুষ্যত্ব। সে মনুষ্যত্বের পরিচয় তোমার মধ্যে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

যাক ওসব কথা, এইবার কাজের কথা বলি শোন। বিলেত গিয়েছিলাম ব্যারিস্টারি পড়তে, প'ড়ে এসেছি জার্নালিজ্‌ম্‌। অক্স্‌ফোর্ডের একটা ডিগ্রী অর্জন করেছি। সেই ডিগ্রী নিয়ে বহু তৃতীয় শ্রেণীর লোকের দ্বারস্থ হয়ে তাঁদের দৈহিক নানা স্থানে প্রচুর তৈলনিষেক করতে পারলে হয়তো দুশো আড়াইশো টাকা বেতনের একটা চাকরি যোগাড় করতে পারা যেত, কিন্তু তা করতে প্রবৃত্তি হ'ল না। তুমি তো তাই জানই, চাকরি করা জিনিসটাকে আমি বরাবর ঘৃণা করি। সেই-জন্যেই বোধ হয় কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান আমাকে একটি শাঁসালো শ্বশুর জুটিয়ে দিয়েছেন। আমার শ্বশুর ব্যবসা ক'রে ব্যাঙ্কে যে টাকা সঞ্চয় করেছেন, তার পরিমাণ ঠিক কত আমি জানি না। তবে তিনি মেয়েকে (অর্থাৎ সুরমাকে) পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই টাকাটা অযাচিতভাবে হাতে এসে পড়াতে ঠিক করেছি যে, একখানা বাংলা এবং একখানা ইংরেজী মাসিক-পত্র বেশ ভাল ভাবে বার করব। খুব ভাল মাসিক-পত্র আমাদের দেশে নেই, উঁচু আদর্শ রক্ষা ক'রে যদি চালাতে পারা যায়, নিশ্চয়ই ভাল ভাবে চলবে। বাংলা কাগজটার নাম দিয়েছি 'আদর্শ', ইংরেজীটার 'The Ideal'। ইংরেজী কাগজটা আমি এখানে থেকে চালাব, বাংলা কাগজটার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি প্রথমে বাংলা কাগজটার একজন সহকারী সম্পাদকের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আবেদন-কারীদের মধ্যে একজন শঙ্করসেবক রায় দেখে সন্দেহ হ'ল যে, হয়তো এ আমাদেরই শঙ্কর। ফোটো চেয়ে পাঠালাম। ফোটো আসতে সন্দেহ দূর হ'ল। তোমার বাড়ির ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে কোন উত্তর পাই নি, তাই ফোটো চাইতে হয়েছিল। তোমাকে সহকারী নয়, পুরোপুরি সম্পাদকই হতে হবে। পি. দত্তের সই-করা চিঠি নিশ্চয়ই পেয়েছ। পি. দত্ত অপর কেউ নয়, আমার বড় সম্বন্ধী—প্রবীর

মত। আমি ইংরেজী কাগজটার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত আছি; প্রবীর আমার হয়ে কাগজটার সম্পর্কে চিঠিপত্র লেখালেখি করছে।

এই সম্পর্কে আমার অনেক হিতৈষী বাঙালী-চরিত্রের অতীত নজির উদ্ধার ক'রে আমাকে সাবধান করেছেন যে, টাকাটা মারা যাবে অর্থাৎ তোমার অপটুতা অথবা অসাধুতা অথবা দুইই এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মপ্রকাশ করবে যে, আমি চমকে যাব। বন্ধু-প্রীতি বিষয়ে নাতিক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ রচনা ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার এমন একটা সুযোগ পেয়েও আমি সেটা ছেড়ে দিলাম, তার কারণ জিনিসটা অত্যন্ত 'ভাল্‌গার' শোনাবে। দ্বিতীয়ত, টাকাগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়েছি, অপ্রত্যাশিতভাবে যদি যায়ও, বেশি লাগবে না আমার। তবে এ বিষয়ে আমার সত্যিকার মত কি, তা তোমাকে বলছি। বেশি জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না। সাঁতার শিখতে গিয়ে দু-চারজন ডুবে মরে তা সত্যি, কিন্তু এই দু-চারজনের উদাহরণ আস্ফালন ক'রে সব সাঁতার-শিক্ষার্থীদের ভড়কে দেওয়ার কোন সার্থকতা দেখতে পাই না। বন্ধু হিসেবে তোমাকে এইটুকু শুধু অনুরোধ করছি যে, যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন ক'রে সাঁতারটা শিখে ফেল। অগাধ জলে স্বচ্ছন্দে সাঁতরাবার কৌশলটা আয়ত্ত করা সহজ নয়, কিন্তু তোমাকে যত দূর জানি, অসাধ্যসাধন করবার শক্তি তোমার আছে। আর একটা কথা, যদি ডোব, আর কারও কিছু হবে না, তুমিই ডুববে। যত শীঘ্র সম্ভব কাজ শুরু ক'রে দাও। আশা করি, অন্যান্য সব খবর ভাল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হলাম। শৈলর চিঠিতে তোমার সব খবর জেনেছি। অবিলম্বে উত্তর দিও। ইতি—

উৎপল

কে, শঙ্করবাবু নাকি, এখানে একা ব'সে কি হচ্ছে?

শঙ্কর চমকাইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, ঠিক পিছনে অচিনবাবু দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভদ্রলোক যে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, শঙ্কর মোটেই টের পায় নাই।

এখানে কি করছেন?

এমনিই বেড়াতে এসেছি।

আচ্ছা, একটা খবর আমাকে বলতে পারেন? এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, খবরটা জানবার জন্যে নেমে পড়লাম।

কি খবর?

মিস বেলা মল্লিক আজকাল কোন্ ঠিকানায় আছেন?

তিনি এ দেশে নেই, বিলেতে গেছেন।

বলেন কি, বিলেত! কার সঙ্গে?

একটি বুড়ো সায়েবকে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন, তাঁরই সঙ্গে।

অচিনবাবু গভীর বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

যাক, তা হ'লে তো মিটেই গেল। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।

না, আমি এখন যাব না।

কবিতা ভাবছেন বুঝি?—মৃদু হাসিয়া অচিনবাবু কারে গিয়া আরোহণ করিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শঙ্কর বাসায় ফিরিল। ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় সাইকেলের ঘণ্টা দিতে দিতে ভন্‌টু আসিয়া হাজির হইল এবং হাসিয়া বলিল, তুই কোথাও বেরুচ্ছিস নাকি?

না, আমি এই ফিরছি।

তা হ'লে তো ভালই হ'ল। আমি জুল্‌ফিদারের কাছে গিয়েছিলাম; সব বলছি, চ, জুল্‌ফিদার দি গ্রেট আবার এক হাত দেখিয়েছে। কড়া নাড়্।

কড়া নাড়িতেই মৃন্ময় দ্বার খুলিয়া দিল।

মৃন্ময়কে দেখিয়া ভন্‌টু বলিল, মিস্টার ক্যাণ্ডল, তুই আর মিসেস স্মাইল পরশুদিন সকালে আমাদের বাসায় যাস। শঙ্কর, তুইও যাস। পরশু রবিবার আছে, জুল্‌ফিদার আমাকে ব্লেসিং আপিস খুলবে ঠিক করেছে।

সে আবার কি?

আশীর্বাদ করবে রে রাস্কেল, এটা বুঝতে পারছিস না? জুলফিকার কিন্তু এগেন এক হাত দেখিয়েছে।

কি রকম?

তোর কথা আজ আবার জুলফিকারকে বলেছিলাম। জুলফিকার বললে যে, আমাদের আপিসে তো আর চাকরি খালি নেই, তবে ... অ্যাণ্ডারসনে একটা পোস্ট্ শিগগিরই খালি হবে, সেটা আমি যোগাড় ক'রে দিতে পারি।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল, ওঁর খুব ভাল চাকরি হয়ে গেছে।

কোথায়?

মৃন্ময় সব কথা খুলিয়া বলিতে ভন্টু খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার পর সহসা তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া গেল।

চোর কোথাকার, আমাকে তো কিছু বলিস নি এতক্ষণ! তা হ'লে চা খাওয়া ছাড়া তো আর উপায় নেই। স্মাইলকে খুব কড়া ক'রে চা করতে বল্। চা খেয়ে এখুনি বেরুতে হবে।

মৃন্ময় চায়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

আবার কোথায় বেরুবি এখন?

ওহো, তোকে বলতেই ভুলে গেছি, ওরিজিন্যাল গন। তাকে পোড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মারা গেলেন?

বেঁচে গেলেন বল্।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ভন্টু বলিল, বাবাজীর কাণ্ড শুনেছিস?

না।

বাবাজীকে বিয়ের খবর দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম, বাবাজী কি উত্তর দিয়েছে দেখ্।

ভন্টু পকেট হইতে একটি পোস্ট্কার্ড বাহির করিয়া দিল।

কল্যাণবরেষু,

তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্ত রকম ছিল। তুমিও যে শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুচরণের মত বিবাহ করিয়া এক দঙ্গল অপোগণ্ড সৃষ্টি করিতে থাকিবে, ইহা আমি ভাবি নাই। আমি প্রায় পনেরো দিন হইল প্রয়াগে আসিয়াছি, ইচ্ছা ছিল, তোমাকে গিয়া একবার দেখিয়া আসিব। কিন্তু তোমার পত্র পাইয়া আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সংসারের কীট তোমরা, সংসারের পাঁকেই সমস্ত জীবন কাটাও। আমাকে আর উহার মধ্যে টানিও না। দূর হইতে আশীর্বাদ করিতেছি, ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। ওই অবস্থায় যতটা সুখ সম্ভব, ততটা সুখ যেন তোমাদের ভাগ্যে ঘটে। ইতি—

আশীর্বাদক

তোমার মেজকাকা

পড়িয়া শঙ্কর পোস্ট্‌কার্ডখানি ফেরত দিল।

ভন্টু হাসিয়া বলিল, চাম চামাটু বাবাজী।

কিন্তু বাবাজীর চিঠিতে ভন্টু যে মর্মাহত হইয়াছে, তাহা সে হাসি দিয়া ঢাকিতে পারিল না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজিল।

চা খাইয়া ভন্টু চলিয়া গেল, খানিকক্ষণ পরে মৃন্ময় উপরের ঘরে উঠিয়া গেল, তাহার ঘুম পাইয়াছিল। নীচের ঘরে শঙ্কর একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অপরিচিত পি. দত্তের চিঠি পাইয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিলেও সুরমা ও উৎপলের চিঠি পাইয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল যে, এ চাকরি সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। শৈলর দাদা ও সুরমার স্বামী বাল্যবন্ধু উৎপলের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া সে জীবনযাপন করিতে পারিবে না। যাহাদের চক্ষে সে নিজেকে এতদিন মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কাছে নিজের গৌরব খর্ব করিতে পারিবে না। ভন্টু এবং উৎপল শ্বশুরের প্রসাদে প্রসন্নমনে থাকুক এবং নিজেদের লইয়াই থাকুক, শঙ্করের উপর তাহাদের

কৃপাবর্ষণ করিতে হইবে না। ঈর্ষায়, ক্ষোভে, তিক্ততায় তাহার সমস্ত অন্তরটা জ্বালা করিতে লাগিল। সে তখনই কাগজ কলম লইয়া আসিল এবং উৎপলের চিঠির জবাব লিখিয়া ফেলিল।—

ভাই উৎপল,

তোমার চিঠি পেয়ে এবং তোমার আর্থিক সচ্ছলতার কথা শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিলাস-ব্যসনে মন না দিয়ে সাহিত্য-সেবায় মন দিয়েছ, এটাও আনন্দের কথা। আমি যদিও তোমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে স-ফোটো দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, যে ভার আমাকে তুমি দিতে চেয়েছ সে ভার নিতে আমি অক্ষম। প্রথমত, তোমার সাহিত্যিক আদর্শের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আদর্শ না মিলতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোন বন্ধুর অধীনে কাজ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। বন্ধু প্রভু হ'লে উভয় পক্ষকেই অশান্তি ভোগ করতে হয়। সাহিত্য-সেবা আমিও করব, কিন্তু এ ভাবে করতে পারব না। কারণ মনের প্রসন্নতা এবং স্বাধীনতা না থাকলে সাহিত্যচর্চা করা যায় না। তুমি অন্য লোক দেখ।

তোমরা দুজনে ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে যে পরীক্ষায় ফেলেছিলে, তা থেকে যে আমি মানে মানে উত্তীর্ণ হয়েছি, এটা উভয়েরই সুখের বিষয়। সেদিন আমার সর্বস্ব ব্যয় ক'রে লাল লাল গোলাপ ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ—তখন আমি বোকা ছিলাম। নি-খরচায় ঠোঁটের কোণে একটু হাসি আর চোখের কোণে একটু ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা বিকিরণ ক'রে কাজ হাসিল করবার আর্টটা তখনও ভাল ক'রে আয়ত্ত করতে পারি নি। বোকার মত অর্থব্যয় ক'রে বসেছিলাম। এখন এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করবার চেষ্টা করছি যে, আমার বোকামিটাকে কেন্দ্র ক'রে তোমরা দুজনে আনন্দলাভ করেছিলে তো! পরোক্ষভাবেও বন্ধু-দম্পতিকে খুশি করতে পেরেছি—তাই বা কম কি!

তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ সুরমার মত মহিলা তোমার সহধর্মিণী এবং সুরমার বাবার মত সহৃদয় ব্যক্তি তোমার শ্বশুর। আশা করি, ভাল আছ সব। মাঝে মাঝে গরিব বন্ধুর খবর নিও। ইতি—

শঙ্কর

চিঠিটা খামে পুরিয়া সে ঠিকানা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল, চিঠিটা এখনই পোস্ট করিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ কি জানি আবার যদি মত বদলাইয়া যায়! পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে বিবেকের যুক্তি হয়তো নাও টিকিতে পারে। টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া দেখিল, একটা টিকিটও আছে। খামে টিকিট আঁটিয়া কপাট খুলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। নিকটে কোন ডাকবাক্স ছিল না, হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্কর বড়রাস্তায় গিয়া পড়িল। বড়রাস্তাতেও খানিকক্ষণ হাঁটিয়া তবে সে ডাকবাক্স পাইল। চিঠিখানা পোস্ট্ করিয়া দিয়া যেন সে বাঁচিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ির সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের কপাট খোলা। মনে পড়িল, সে নিজেই কপাট খুলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ভিতরে ঢুকিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত সাহেবী-পোশাক-পরা এক ব্যক্তি তাহার বিছানায় শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। সর্বাঙ্গে মদের গন্ধ। শঙ্কর খানিকক্ষণ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ আবার কে?

গায়ে হাত দিয়া একটু ঠেলিতেই সাহেব উঠিয়া বসিলেন এবং মদিরাবিহ্বল চক্ষু মেলিয়া শঙ্করের মুখের দিকে এক সেকেণ্ড চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কে?

আমি এইখানে থাকি।

আপনি এখানে থাকেন? You mean this is your house?

আমার নিজের বাড়ি নয়, আমরা ভাড়াটে। আপনি কে?

মাই গড! এটা কি বীডন স্ট্রীট নয়?

আজ্ঞে না, এটা সার্পেন্টাইন লেন।

আই সী।

সাহেব খানিকক্ষণ খোলা দ্বারটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, সাধারণত গেরস্ত-বাড়িতে এত

রাত্রে কপাট খোলা থাকে না, তাই ভাবলাম, বুঝি আমারই বাড়ি। আই অ্যাম সো সরি, এটা সারপেন্টাইন লেন! আই অ্যাম সো সরি।

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না।

শঙ্কর বলিল, বসুন, যাচ্ছেন কেন?

ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া সাহেব বলিলেন, আই সী, you are a gentleman. না, আমি আর বসব না, উঠি এবার।

ভদ্রলোকের টলমলায়মান অবস্থা দেখিয়া শঙ্কর আবার বলিল, না না, বসুন।

O, you are a damned good fellow.

তাহার পর শঙ্করের মুখের দিকে খানিকক্ষণ স্মিতমুখে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি কি স্টুডেন্ট?

না।

No? But you look it. কি করেন আপনি?

কিছুই করি না আপাতত।

No? কিছু করবার ইচ্ছে রাখেন?

তাহার পর ঘাড়টা একটু কাত করিয়া সাহেব বলিলেন, What is your propensity? To swindle or to dwindle? These are the two things one must choose between.

কথাবার্তা শুনিয়া লোকটিকে নেহাত খেলো বলিয়া শঙ্করের মনে হইল না। শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। এই অদ্ভুত অতিথিটিকে তাহার বেশ লাগিতেছিল।

সাহেব বলিলেন, নিজে যদিও আমি একজন রটার, কিন্তু বাপের দৌলতে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। I can shunt you on to any one of those two lines, I mean, swindling and dwindling. There are marvelous possibilities in both of them. আপনার মনের ঝোঁক কোন্ দিকে?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আমি সাহিত্য-চর্চা করতে চাই।

O God Almighty, you are a poet !

That's funny and that's great !

সাহেব পকেট হইতে একটা কার্ড-কেস বাহির করিলেন; তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, Will you lend me your poet's plume please ?

শঙ্কর হাসিয়া দোয়াত কলম আগাইয়া দিল।

সাহেব কার্ডের পিছনে লিখিলেন, "Hiron, he is a gentleman. Please take him in your gang." তাহার নীচে নিজের নাম সই করিয়া কার্ডখানি শঙ্করের হাতে দিলেন এবং বলিলেন, হিরণ is a bright boy—সেও সাহিত্যচর্চা করছে, at least that's his present pose—চ'লে যান তার কাছে। আমি উঠি—I am so sorry, I disturbed you.

সাহেব উঠিলেন।

আমি কি আপনার সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব ?

No, thanks. মোটরে উঠে ব'সে স্টিয়ারিং ধরতে পারলে I am as steady as a rock.

সাহেব টলিতে টলিতে গিয়া মোটরে উঠিলেন এবং মোটর স্টার্ট করিয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কার্ডখানি উল্টাইয়া দেখিল, নাম লেখা রহিয়াছে—যোগেন রায়।

কে এই যোগেন রায় ?

শঙ্কর কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ তাহার ঘুম আসিল না, সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনকে নানাভাবে নাড়া দিতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িবার পর স্বপ্ন দেখিল, সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নয়—অমিয়াকে।

পরদিন সকালে উঠিয়াই শঙ্কর ঠিক করিল, হিরণবাবু বলিয়া কেহ আছে কি না খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে কার্ডখানি বাহির করিল এবং কার্ডখানির দিকে চাহিয়া নির্বাক হইয়া গেল। স্বরাগত যোগেন রায় সবই লিখিয়াছেন, কিন্তু ঠিকানা দেন নাই। নিজেরও না, হিরণবাবুরও না। শঙ্কর তবু বাহির হইয়া পড়িল। বীডন স্ট্রীটটা খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

প্রায় প্রতি বাড়িতে জিজ্ঞাসা করিয়া বেলা বারোটা-নাগাদ শঙ্কর যোগেন রায়ের বাড়িটা বাহির করিল বটে, কিন্তু যোগেন রায়ের দেখা পাইল না। শুনিল, যোগেনবাবু সকালের ট্রেনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। হতাশ হইয়া শঙ্কর ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটা বুক্‌স্টলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। স্টলে নানারকম বই ও মাসিক পত্রিকা। শঙ্কর তাহার প্রিয় ও পরিচিত মাসিক-পত্রিকা 'সংস্কারক'খানা উল্টাইতে লাগিল। একটু পরে তাহার নজরে পড়িল, 'ক্ষত্রিয়' নামে একটা নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে। টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাগজ, সম্পাদক—জ্যোতির্ময় বসু। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—পিছনের দিকে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। "একজন সুদক্ষ প্রূফ-রীডার চাই। শ্রীহিরণকুমার রায়ের নিকট আবেদন করুন। ঠিকানা—"। ঠিকানা দেওয়া আছে। ইনি যোগেনবাবুর হিরণ নয় তো! শঙ্কর অবিলম্বে হিরণবাবুর ঠিকানার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

আধ ঘণ্টা পরে শঙ্কর হিরণবাবুর বাহিরের ঘরে বসিয়া অধীর-চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল।

দ্বার ঠেলিয়া একটি নাতিস্থূল সুদর্শন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। পরিধানে ঢিলা পায়জামার উপর ড্রেসিং গাউন, ঈষৎ কটা চুলগুলি ব্যাক্

ব্রাশ করা, বাঁ হাতের অনামিকায় দামী-পাথর-বসানো একটি আঙটি। ডান হাতে মোটা বর্মা চুরুট।

আপনিই আমাকে খুঁজছেন?

আমি হিরণবাবুকে খুঁজছি।

আমারই নাম হিরণ, কি চান আপনি?

আপনি কি যোগেন রায় ব'লে কাউকে চেনেন?

চিনি।

শঙ্কর কার্ডখানি তাহার হাতে দিল।

হিরণবাবু কার্ডে লেখা কথাগুলি পড়িলেন, কার্ডখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, যোগীনদার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?

শঙ্কর আদ্যোপান্ত সব খুলিয়া বলিল।

যোগীনদা দুদিনের জন্যে কলকাতায় এসেই একটা ইতিহাস ক'রে গেছেন দেখছি!

একটু থামিয়া হিরণবাবু বলিলেন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন?

শুনলাম, আপনারা একটা কাগজ বার করছেন, তাতে যদি আমাকে কোন কাজে—

আপনি লেখক?

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, কিছু কিছু লিখি।

কি লেখেন?

বেশির ভাগই কবিতা।

বেশ, আপনার লেখা নিয়ে আসবেন।

কখন আসব?

আজ বিকেলেই আসতে পারেন।

শঙ্কর কয়েক সেকেণ্ড নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি

এখন একেবারে বেকার। গ্রাসাচ্ছাদনের মত একটা কোন কিছু যদি জুটিয়ে দিতে পারেন ভাল হয়, আমি যে কোন কাজ করতে রাজী আছি।

কবিতা লেখা ছাড়া আপনার আর কি কোয়ালিফিকেশন আছে? কতদূর লেখাপড়া করেছেন আপনি? বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

শঙ্কর একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল, হিরণবাবুও বসিলেন।

আমি এম. এস-সি. পর্যন্ত পড়েছি, পরীক্ষা দিই নি।

বেশ করেছেন। পরীক্ষাটা দিলেন না কেন?

আর্থিক নানা কারণে, ফী জমা দেবার টাকা পাই নি।

যাক, তবু ভাল, আমি ভাবছিলাম, পারমার্থিক কোন হেতু আছে বুঝি। রবীন্দ্রনাথের যে হেতু ডিগ্রী নেই, সেই হেতু আজকাল অনেকে ডিগ্রী না থাকাটাকেই কবি হওয়ার সপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি ব'লে মনে করেন। আপনার সে কমপ্লেক্স্ নেই দেখে সুখী হলাম। আপনি প্রুফ দেখতে পারেন?

পারি। 'ক্ষত্রিয়' কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখলাম—

দেখেছেন? আমিই দিয়েছি ওটা। আপনাকে কাজটা দিতে পারি। 'ডাম্বেল, মুগুর ও বারবেল' ব'লে আমি একটা বই লিখিয়েছি কয়েকজন ব্যায়ামবীরকে দিয়ে, সেটা ছাপা হচ্ছে। আপনি যদি তার প্রুফ ভাল ক'রে দেখে দিতে পারেন, দৈনিক এক টাকা হিসেবে আপনাকে এখনই আমি বাহাল করতে পারি।

আমি পারব।

আপনি কোথা আছেন?

আমার এক বন্ধুর বাসায় আছি। সেখানেই পেয়িং গেস্ট্ হয়ে থাকব আপাতত ভাবছি।

সেখানে যদি অসুবিধে হয়, আমার একটা আন্‌ইউজ্‌ড নতুন বাথরুম আছে, ইচ্ছে করলে সেখানেও আপনি থাকতে পারেন ফ্রী অফ কস্ট্।

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, দেখি।

বেশ, তা হ'লে বিকেলে আসবেন, 'ক্ষত্রিয়' কয়েকখানা মাত্র বেরিয়েছে, আমাদের মতামত মিলিটারি, আমরা যা সত্য ব'লে মনে করি তা প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে মিথ্যা আবর্জনাগুলোকে ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হবে ব'লেও মনে করি। বিকেলে আসবেন, সেই সময় সব দেখাব আপনাকে।

আচ্ছা।

শঙ্কর নমস্কার করিয়া পথে বাহির হইয়া প'ড়িল।

চলিতে চলিতে সে ভাবিতে লাগিল, কোথাকার অপরিচিত যোগেন রায় মদের ঝোঁকে তাহার খোলা দরজায় নিতান্ত আকস্মিকভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হিরণবাবুর ঠিকানা দিয়া গেলেন! জীবনের অধিকাংশ প্রধান ঘটনার অন্তরালেই এক আকস্মিক যোগাযোগের রহস্য। জন্ম জীবন মৃত্যু—জীবনের এই অতি-প্রত্যাশিত ঘটনাগুলিও ভাবিয়া দেখিলে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের দলেই। আনন্দের আতিশয্যে শঙ্কর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। হিরণবাবু লোকটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। বেশ সুন্দর সুস্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি।

সেই দিন বৈকালেই শঙ্কর দুইটি কবিতা লইয়া হিরণবাবুর কাছে হাজির হইল। তাহার যেন তর সহিতেছিল না। গিয়া দেখিল, আড্ডা গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত চেয়ার কয়টি অধিকৃত, তক্তপোশেরও অনেকখানি ভরিয়া গিয়াছে। ঘোরতর তর্ক চলিতেছে। সিগার-সিগারেটও এত বেগে পুড়িতেছে যে, ঘরের খানিকটা অংশ কুজ্ঝটিকাবৃত বলিয়া মনে হইতেছে। তক্তপোশের এক ধারে ট্রের উপর কতকগুলি চায়ের পেয়ালা ধূমায়িত হইতেছে এবং বালক-ভৃত্যটি একে একে সেগুলি তার্কিকদের হাতে ধরাইয়া দিতেছে।

শঙ্কর প্রবেশ করিতেই সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন।

হিরণবাবু বলিলেন, লেখা এনেছেন?

এনেছি।

কই, দিন।

শঙ্কর সসঙ্কোচে পকেট হইতে কবিতা দুইটি বাহির করিয়া দিল। আশা করিয়াছিল, হিরণবাবু তখনই সেগুলি পড়িবেন এবং পড়িয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবেন। কিন্তু হিরণবাবু সেসব কিছুই করিলেন না। লেখাগুলি একবার খুলিয়া পর্যন্ত দেখিলেন না, ড্রয়ার টানিয়া অতিশয় নির্বিকারভাবে সেগুলি ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আর একটি ড্রয়ার খুলিয়া 'ডাম্বেল, মুগুর ও বারবেলে'র একতাড়া প্রুফ শঙ্করকে দিয়া বলিলেন, কাল বিকেলবেলায়ই চাই।

একটা পেন্সিল কি কলম পেলে এখুনি আমি শুরু করতে পারি।

এত গোলমালে পারবেন?

পারব।

বেশ, পেন্সিল দিচ্ছি আমি, বসুন। ওরে নবনে, ও-ঘর থেকে টুল একটা নিয়ে আয়, এক কাপ চা দে বাবুকে।

টুল আসিল, চা আসিল। চা পান করিয়া শঙ্কর প্রুফ দেখিতে শুরু করিয়া দিল। আড্ডায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলকেই যুবক। শঙ্করের আগমনে তাঁহারা মিনিটখানেকের জন্য চুপ করিয়াছিলেন, আবার শুরু করিয়া দিলেন। আলোচনা চলিতেছিল চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু এবং আধুনিক একজন বিদ্রোহী কবিকে লইয়া। তর্ক-মুখর চটুল বিদ্রূপাত্মক আলোচনা। শঙ্করের খুব ভাল লাগিতেছিল, কিন্তু অনাহূতভাবে আলোচনায় সে যোগদান করিল না। নীরবে বসিয়া প্রুফগুলি দেখিতে লাগিল।

অতিশয় অনাড়ম্বরভাবে তাহার সাহিত্যিক-জীবন শুরু হইয়া গেল।

৩৬

মৃন্ময় আপিস হইতে যখন ফিরিল, তখনও শঙ্কর ফেরে নাই। শঙ্কর আজকাল সকালে উঠিয়াই হিরণবাবুর কাছে চলিয়া যায়, ফেরে রাত্রি দশটা-এগারোটায়। দ্বিপ্রহরের ভোজনটা সে নিকটবর্তী একটা হোটেলে আনা-তিনেকের মধ্যে সারিয়া লয়; আরও তিন আনা দিয়া দুই প্যাকেট সস্তা

সিগারেট কেনে, রাত্রে মৃন্ময়ের বাসায় খায় এবং শোয়। ইহার জন্তে মৃন্ময়কে সে মাসে দশ টাকা করিয়া দিবে ঠিক করিয়াছে। মৃন্ময় প্রথমে কিছুতেই টাকা লইতে রাজী হয় নাই; কিন্তু যখন সে দেখিল, টাকা না লইলে শঙ্কর থাকিবে না, তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। এই শঙ্করবাবু লোকটির ব্যবহার, চালচলন এবং আদর্শনিষ্ঠা মৃন্ময়কে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছিল। নিজের আদর্শভ্রষ্ট জীবনে শঙ্করকে পাইয়া তাহার মন অনেকটা যেন স্বস্তিলাভ করিয়াছিল; ভগ্নহাল ছিন্নপাল তরণীর আরোহীদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ মাঝি থাকিলে নৌকা-পরিচালক মাঝি যেমন ভরসা পায়, শঙ্করকে পাইয়া মৃন্ময়ের মনের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়াছিল। শঙ্কর অধিকাংশ সময় বাড়িতে থাকে না, শঙ্করের জীবনযাত্রার সহিত এবং জীবনের আদর্শের সহিত মৃন্ময়ের জীবনযাত্রা অথবা আদর্শের কিছুমাত্র মিল নাই; শঙ্কর বন্ধের এই চাকরিটাও যে মনোবৃত্তির প্রভাবে লইল না, সে মনোবৃত্তির সমর্থন যদিও মৃন্ময় করে না; তবু মৃন্ময় মনে মনে শঙ্করের উপর নির্ভর করিতে শুরু করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ—যখনই যতটুকু দেখা হয়, শঙ্কর সহানুভূতিসহকারে মৃন্ময়ের সমস্ত কাহিনী শোনে এবং আশ্বাস দেয় যে, সব ঠিক হইয়া যাইবে। সব ঠিক হইয়া যাইবে—এতবড় আশ্বাস কয়জন এমন করিয়া দিতে পারে!

বাড়িতে ঢুকিতেই নীচের তলায় ডানহাতি ঘরটায় শঙ্কর থাকে। শঙ্কর যাইবার সময় তালা লাগাইয়া দিয়া যায়—হাসির কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, রাত্রির খাবার রাখিয়া যাইবার জন্ত। মৃন্ময় ঢুকিয়া বন্ধ তালাটার পানে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্করবাবু ফেরেন নাই তাহা হইলে। তাহার বগলে একটা প্যাকেট ছিল। শঙ্করবাবুকে আগে দেখাইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু—। খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া মৃন্ময় অবশেষে উপরে উঠিয়া গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে হাসি চুল বাঁধিতেছিল। হাসির সমস্ত মুখখানাতে কেমন একটা বিষাদের ছাপ পড়িয়াছে। মৃন্ময় যে

স্বর্ণলতাকে ভালবাসে—এ কথা জানিয়া অবধি হাসির জীবনে অন্ধকার নামিয়াছে। স্বর্ণলতা যে মৃন্ময়ের পূর্বপক্ষের স্ত্রী, অপর কেহ নহে, ভালবাসাটা যে তাহার ন্যায্য পাওনা—এ বার্তায় সে অন্ধকার কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। বরং স্বর্ণলতার প্রতি এই প্রেমটা যদি অবৈধ প্রণয় হইত, তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে একটা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এবং মৃন্ময়কে একটু ন্যায়ত লাঞ্ছিত করিবার একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া হাসির আক্রোশ হয়তো কিছু কমিত। কিন্তু বিবাহিত বিগত স্ত্রীর প্রতি যদি কোন স্বামী প্রেম পোষণ করে, তাহার বিরুদ্ধে কি বলিবার আছে! মৃন্ময় প্রবেশ করিতেই সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল এবং কাগজের বাক্সটা দেখিয়া প্রশ্ন করিল, ওটা কি?

কাপড়।

কার কাপড়?

ভন্টুর যে পরশু বিয়ে, ভুলেই গেছ?

ও।

চুলের বিনুনিটা ঠিক করিতে করিতে হাসি আগাইয়া আসিল।

কি কাপড় কিনলে?

মৃন্ময় হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতেছিল (হয়তো সেইজন্যই তাহার মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল), কোন উত্তর না দিয়া জুতার ফিতাই খুলিতে লাগিল। হাসি আগাইয়া আসিয়া কাগজের বাক্সের ডালাটা খুলিয়া ফেলিল।

দুখানা কাপড় কেন?

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতেই মৃন্ময় উত্তর দিল, একখানা তোমার জন্যে। ওই ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়িটা—

আমার শাড়ি চাই না।

বাক্সটা তাচ্ছিল্যভরে ঠেলিয়া দিয়া হাসি পুনরায় আয়নার কাছে গেল এবং দাঁত দিয়া ফিতাটি কামড়াইয়া পুনরায় প্রসাধনে মন দিল। মৃন্ময় এই আশঙ্কাই করিতেছিল, তাহার লাল মুখখানা সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, পছন্দ ক'রে এনেছি—

আমার চাই না।

তাহার পর সহসা ফিরিয়া বলিল, তুমি মাইনে তো এখনও পাও নি, দাদামশাই যে টাকা দিয়ে গেছেন তার থেকেই তো সংসার চলছে, বাড়ি-ভাড়া এখনও দেওয়া হয় নি, তুমি কাপড় কেনবার টাকা পেলে কোথা ?

মৃন্ময় যে শঙ্করের সাহায্যে শালখানা বাঁধা রাখিয়াছিল, হাসি তাহা টের পায় নাই। মৃন্ময় হাসিকে এখনও সে কথা বলিল না, মিথ্যা কথা বলিল।

একটা চেনা দোকান থেকে ধারে এনেছি। মাইনে পেলে পরে দিয়ে দিলেই হবে।

ধার ক'রে বাবুয়ানি করবার দরকার কি ?

মৃন্ময় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না ; তাহার ঠোঁট দুইটা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল মাত্র।

আগে হাসি এমন করিত না, স্বর্ণলতাকে আবিষ্কার করিয়া অবধি তাহার মন কেমন যেন নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণলতা নাগালের বাহিরে, তাহার কিছুই সে করিতে পারে না, মৃন্ময়কে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া তাই সে মনের জ্বালা মিটাইতে চায়। অথচ হাসিই একদিন মৃন্ময়ের সামান্যতম কষ্ট দূর করিবার জন্য কি না করিতে পারিত !

৩৭

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শঙ্কর 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার লেখক, প্রুফ-রীডার, ম্যানেজার এবং প্রকাশক হইয়া পড়িল। যদিও হিরণবাবু তাহাতে সংশ্লিষ্ট রহিলেন এবং প্রকাশ্যত হিরণবাবুর বন্ধু জ্যোতির্ময়বাবুর সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপা হইতে লাগিল, কিন্তু আসলে শঙ্করই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। হিরণবাবু এবং জ্যোতির্ময়বাবুর নিকট সাহিত্যচর্চা খেয়াল মাত্র ছিল, কিন্তু শঙ্করের ইহা অন্তরের বস্তু। সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া

সে ইহার উন্নতিকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল এবং তাহার একাগ্রতা দেখিয়া হিরণবাবু তাহার হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একদা যে শঙ্কর দুইটি কবিতা লইয়া সসংকোচে হিরণবাবুর নিকট আসিয়াছিল (একটি হিরণবাবু মনোনীত করিয়া ছাপিয়াছিলেন, অপরটি তাঁহার পছন্দ হয় নাই), আজ সেই শঙ্করের নিকটই হিরণবাবু নিজের লেখা আনিয়া বলিতেছেন, দেখ তো, এটা তোমার কাগজে চলবে কি না?

বস্তুত কাগজখানা যেন শঙ্করের নিজেরই হইয়া গিয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উহা লইয়াই তাহার কাটিতেছে। 'ডাম্বেল, মুগুর ও বারবেল' নামক পুস্তকের প্রুফ দেখিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না, বাকি সময়টা সে 'ক্ষত্রিয়' লইয়া থাকে। তাহার নিজের মনের মধ্যে যে নিরস্ত্র ক্ষত্রিয় এতদিন রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতেছিল, হঠাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও সুযোগ লাভ করিয়া সে যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি-আধুনিক-মার্কা ডেঁপো ছোকরাদের চাবকাইয়া পিঠের ছাল ছাড়াইয়া দিবে সে। ইহারা অতীতের মহত্ত্ব স্বীকার করে না, দেশের লোকেদের চেনে না, বিদেশী আলট্রা-মডার্নিজ্‌মের নকলে 'নতুন কিছু' করিয়া বাহাদুরি দেখাইতে চায় এবং সেই উপলক্ষ্যে নিজেদের নপুংসক কামনা-কণ্ডুয়নকে কখনও সুবোধ্য, কখনও দুর্বোধ্য ভাষায় প্রচার করে। ইহাদের ভণ্ডামিটাকে চূর্ণ করিতে হইবে। অতিশয় উত্তেজনার মধ্যে তাহার দিন কাটিতেছে। অনেকগুলি ভাল লোকের সঙ্গেও আলাপ হইয়াছে। ভাল লোক মানে, লোকগুলিকে শঙ্করের ভাল লাগিয়াছে। জ্যোতির্ময়বাবু—যিনি নামে কাগজের সম্পাদক—তিনি বেশ একটু অদ্ভুতপ্রকৃতির লোক। নিজে যদিও তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, কিন্তু ব্রাহ্মদের গালাগালি দিয়া তিনি যত আনন্দ পান, অন্য আর কিছু করিয়া ততটা পান না। রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত অদ্ভুত। তিনি আমাদের পরাধীনতাটাকে টাইফয়েড-জাতীয় একটা ব্যাধি হিসাবে গণ্য করেন। বলেন, তাড়াহুড়া করিয়া লাভ নাই, নিজের প্রাণশক্তি-প্রভাবে ব্যাধি যদি সারিবার হয়, আপনিই সারিবে। আমাদের দেখা উচিত,

চিকিৎসার ছুতা করিয়া রাজনৈতিক নেতাগুলি যেন আমাদের সর্বস্বান্ত না করেন। আর একটি বিচিত্র লোক সুরেন্দ্রনাথ সোম। বেঁটেখাটো মানুষটি, অত্যন্ত রোগা, মাইনাস ফাইভ চশমা, নিরামিষাশী, স্কুলে মাস্টারি করেন। যদিও মাত্র বি. এ. পাস, কিন্তু অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। হেন বিষয় নাই যাহার সম্বন্ধে দুই-চারি কথা না জানেন। মদ এবং শিকার বিষয়ে তিনি তো বিশেষজ্ঞ। নিজে যদিও কখনও জীবনে মদ স্পর্শ করেন নাই, সিগারেট পর্যন্ত খান না, কিন্তু কোন্ মদে কত অ্যাল্‌কহল আছে, কি রকম গ্রেপ হইতে ভাল মদ প্রস্তুত হয়, সস্তা মদ এবং দামী মদের তফাত কি, কি রকম সেলারে মদ রাখা উচিত, মদের বোতলের কাচ অ্যাল্‌কালি-ফ্রী হইলে বা না হইলে কি ভাবে মদের গুণে তারতম্য ঘটিবার সম্ভাবনা, মদের ব্যবসা কোন্ দেশে কি ভাবে চলে, সাহিত্যসৃষ্টির উপর মদের প্রভাব কি, এবং তাহা কতদূর বিজ্ঞানসম্মত—এ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে। শিকার বিষয়েও তাই। ইংরেজী সাহিত্যে তো বটেই, ফরাসী সাহিত্যেও লোকটির অগাধ অধিকার। মাঝে মাঝে আড্ডায় আসেন এবং ক্বচিৎ কখনও ভারী ওজনের প্রবন্ধ লেখেন। সুরেনবাবু 'ক্ষত্রিয়' কাগজটির প্রতি স্নেহশীল—সাহিত্য-প্রীতিবশত ততটা নহে, যতটা হিরণদার সহিত ঘনিষ্ঠতাবশত। যে জন্যই হোক, তিনি 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে ততটা নয়, যতটা সংশোধক হিসাবে। মাস্টার মানুষ, ভুল কিছুতেই তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে না। তিনি 'ক্ষত্রিয়ে'র ভুল তো সংশোধন করেনই, অন্য কোন কোন পত্রিকায় কি কি ভুল বাহির হইয়াছে তাহা শঙ্করকে আনিয়া দেন, এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শঙ্করের লেখনী হিংস্র হইয়া উঠে। শঙ্করের লেখনীতে যে এমন একটা হিংস্রতা ছিল, তাহা শঙ্কর নিজেও এতদিন জানিত না; নিজের এই তীক্ষ্ণ-নখদন্ত-সমন্বিত নব রূপ সে নিজেই সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। ছবি রায় এই আড্ডার আর একজন অসাধারণ ব্যক্তি। কখনও কবিতা লেখে না, কিন্তু মনে-প্রাণে কবি। মাথায় রুক্ষ

তৈলহীন অবিন্যস্ত চুল, চোখে আকুল উতলা দৃষ্টি, মুখে বেণী কীট্স্ ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথ, পরনে আধময়লা ঢিলা-হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে স্যাণ্ডাল। প্রত্যহ সকালে বাজার করিতে যাইবার মুখে থলিটি হাতে করিয়া আড্ডায় প্রবেশ করে, খানিকক্ষণ আড্ডা দেয়, কবিতা আওড়ায়, এক-একদিন ভাবের আবেগে কাঁদিয়া পর্যন্ত ফেলে। মদ খাওয়া অভ্যাস আছে, অথচ উপার্জন কম, সেইজন্য দুর্দশাটা আরও বেশি। বয়স খুব বেশি নয়, কিন্তু একপাল ছেলে মেয়ে। দশটা পাঁচটা একটা আপিসে কেরানীগিরি করে, বৈকালে মনিহারী দোকানে গিয়া তাহাদের বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য লেখে, সন্ধ্যাবেলায় এক জায়গায় টুইশনি করে, তবু কুলায় না। 'ক্ষত্রিয়' কাগজের সহিত তাহার মতের মিল নাই, কিন্তু হিরণদাকে সে দেবতার মত ভক্তি করে। হিরণবাবুও তাহাকে স্নেহ করেন, এত স্নেহ করেন যে মাঝে মাঝে নিজের পকেট হইতে পয়সা খরচ করিয়া তাহাকে মদ খাওয়ান। শঙ্করেরও ছবিকে বড় ভাল লাগে! আরও অনেকে আড্ডায় আসে। দীপেন, জ্যোতিষদা, চঞ্চল, বরেন, নিপু, শ্যামল এবং আরও অনেকে; সকলেই যুবক, সকলেই সাহিত্য-রসিক। কেহ ধনীর সন্তান, কেহ চাকুরে, কেহ বেকার, কেহ বিজ্‌নেস করিতেছে। হিরণবাবু সকলেরই হিরণদা। শঙ্করও আজকাল হিরণবাবুকে হিরণদা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে। হিরণদা যদিও এই আড্ডার প্রাণস্বরূপ, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজেকে কখনও জাহির করেন না। তিনি কেন্দ্রেই বাস করেন বটে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে। তাঁহার পছন্দ-অপছন্দ মতামত আড্ডায় কাহারও অগোচর নাই, সকলেই তদনুসারে চলেনও; কিন্তু হিরণদা উগ্রভাবে নিজের দলপতিত্ব কখনও প্রকাশ করেন না। হিরণদার সম্বন্ধে একটা কথা ভাবিয়া শঙ্কর অবাক হয়, লোকটার প্রতিভা যে কিরূপ, তাহা বোঝা যায় না। সাহিত্যচর্চা যে খেয়ালমাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নানা বিষয়ে কৌতূহল, এবং 'ক্ষত্রিয়' নামক পত্রিকা প্রকাশ তাঁহার বহুমুখী কৌতূহলের একটা মুখ মাত্র। শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ এই কাগজটা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ঠিক সেই মনোভাব লইয়া,

যে মনোভাব লইয়া দুষ্ট ছেলে দুষ্টামি করে। বঙ্গদেশরূপ মহারণ্যের নানা বৃক্ষে নানাজাতীয় পতঙ্গ নানারকম চক্র নির্মাণ করিয়া গুঞ্জন করিতেছে, প্রত্যেক চক্রে এক-একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া দেখাই যাক না, কি রকম মজাটা হয়! এতদিন তিনি নিজেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এখন শঙ্করের মধ্যে একজন সক্ষম লোষ্ট্রনিক্ষেপক আবিষ্কার করিয়া তিনি তাহার হাতে এ কার্য ছাড়িয়া দিয়া অপর দিকে মন দিয়াছেন। একটা কুস্তির আখড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সেখানে অনেকগুলি যুবক এবং কুস্তিগীর পালোয়ান জুটাইয়া বক্সিং, জুজুৎসু এবং শরীরচর্চার নানারূপ আয়োজন তিনি করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অশক্ত অসুস্থ বলিয়াই আমরা ভীরু দার্শনিক হইয়া পড়িতেছি। জীবনযুদ্ধের নির্মম সত্যগুলিকে সুস্থভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই কুস্তির আখড়াতেই তাঁহার সমস্ত চিত্ত নিবদ্ধ নহে, আরও নানাদিকে তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত। জন্তু-জানোয়ারের বিষয়ে ঝোঁক আছে। বাড়িতে শুধু কাবুলী বিড়াল এবং অ্যালসেশিয়ান কুকুর নয়, বাঘের বাচ্চাও পুষিয়াছেন। ইহা ছাড়া ডাকটিকিট সংগ্রহ, দিয়াশলাইয়ের বাক্স সংগ্রহ, পুরাতন শাল সংগ্রহ, সেকেলে বাসন সংগ্রহ প্রভৃতিতেও তাঁহার আগ্রহ কম নয়। হিরণবাবু বড়লোকের ছেলে, সর্বঘটবিহারী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বেকার। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যই নিজের কিছু করিবার নাই বলিয়া বোধ হয় তিনি নিজের শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি অনুযায়ী সব কিছুতেই সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন। পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই, সুতরাং বাধা দিবার কেহ নাই। যোগীনদাও নাকি এককালে এই ধরনের ছিলেন, একটা চাকরি জোটাতে আজকাল সব থামিয়া গিয়াছে। যোগেন রায়ের পরিচয় শঙ্কর পাইয়াছে। তিনি বিলাতী ডিগ্রী ও সুপারিশের জোরে একটি নামজাদা বিলাতী লাইফ ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানির ম্যানেজার হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসেন এবং বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে কয়েকদিন কাটাইয়া যান। যখন কলিকাতায়

থাকেন না, তখন বীডন স্ট্রীটের বাড়িটা খালি পড়িয়া থাকে, বাড়ি দেওয়া তিনি পছন্দ করেন না। যোগীনদাও অবিবাহিত, রসিক, কিন্তু নি মাতাল। আর একটি নূতন ধরনের লোকের সহিত শঙ্করের পরিচয় হইঃ ডাক্তার মুখার্জি। ইনি একজন রিটায়ার্ড আই. এম. এস. অফিসার, বিলা এম. ডি., রিটায়ার্ড লেফ্‌টেনান্ট-কর্নেল। এককালে হিরণবাবুর পিং ছিলেন, এখন হিরণের বন্ধু। এমন কি সিগার আদান-প্রদান চ লোকটিকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। বিদ্বান বহুদর্শী লোক, কিন্তু এতটুকু অহং নাই। গোঁফদাঁড়ি কামানো, ফরসা রঙ, ভারী মুখ, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, গা ঢিলা গলাবন্ধ সাদা চায়না কোট, পরনে সাদা থান, মুখে প্রকাণ্ড সিগ এবং প্রশান্ত হাসি। মাঝে মাঝে যখন আড্ডায় আসেন, সমস্ত আড্ডা যেন ভরাট হইয়া উঠে। সাহিত্যরসিক, স্পষ্টবাদী, শক্তিশালী ব্যক্তি-।

এই নূতন সমাজে নূতন প্রেরণা লইয়া শঙ্কর নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছে অল্পদিনের মধ্যে নিজের একটা বিশিষ্ট স্থানও করিয়া লইয়াছে। কিন্তু একা ক্ষুদ্র চিন্তা তাহাকে মধ্যে মধ্যে আকুল করিয়া তুলিতেছে, হিরণদার 'ডাম্বেল মুগুর এবং বারবেল' পুস্তকের প্রুফ দেখা হইয়া গেলে সে কি করিবে অর্থোপার্জনের স্থায়ী রকম কোন ব্যবস্থাই তো সে এখনও পর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে শঙ্কর ভাবিতেছিল, ডাক্তার মুখার্জি তাহাকে একটা চাকরির আশ্বাস দিয়াছিলেন কয়েক দিন পূর্বে, কিন্তু তাহার পর হইতে আর তিনি আসেন নাই। তিনি কোন্ ঠিকানায় থাকেন, তাহাও শঙ্করের জানা নাই···সহসা অমিয়ার মুখখানা মনের উপর ফুটিয়া উঠিল, ভীরু সলজ্জ চোখ দুইটি। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল, অমিয়ার কথা সে তো মোটেই ভাবিতেছিল না! এমন হয় কেন? ইহার নাম টেলিপ্যাথি? অমিয়ার মুখখানাই অসংলগ্নভাবে মনের ভিতর যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর পুনরায় প্রুফে মনঃসংযোগ করিল। প্রুফগুলাতে কি অদ্ভুত ভুলই থাকে! সমস্ত দন্ত্য 'ন'গুলা উল্টা এবং সমস্ত 'থ' 'থ' হইয়া গিয়াছে।

যে ঘরে হিরণদার আড্ডা বসে, ঠিক তাহার পাশের ছোট ঘরটাতে (অর্থাৎ আনৃইউজ্‌ড বাথ-রুমটিতে) শঙ্কর নিজের জন্ম ছোট একটি আপিসের মত করিয়া লইয়াছিল। হিরণদা একটি ছোট টেবিল, শেল্‌ফ এবং চেয়ার দিয়াছিলেন। এই ছোট ঘরটিতেই শঙ্কর পড়ে, লেখে, প্রূফ সংশোধন করে। ইহাই 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আপিস। কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ এতদিন 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আপিস হিরণদার টেবিলের ড্রয়ারেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে শঙ্কর আড্ডায় গিয়া যোগ দেয়। আড্ডা সাধারণত শুরু হয় বৈকাল হইতে এবং চলে রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। সেদিন রবিবার, একটু সকাল সকালই আড্ডা শুরু হইয়াছে এবং পাঁচটা নাগাদ বেশ গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতিষদার গলা-খাঁকারি, চঞ্চলের উচ্চহাস্য হইতেই তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে হিরণদা শঙ্করকে শুনাইয়া শুনাইয়া সকলকে সতর্ক করিতেছেন, অত চেঁচিয়ে নয়, শঙ্কর চ'টে যাবে, প্রূফ নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে ও।

শঙ্কর জানে, হিরণদার এই সতর্ক বাণীর অর্থ কি। অর্থ—উঠিয়া এস। শঙ্কর উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হিরণদা বলিলেন, আমার দোষ নেই কিন্তু, আমি সেই থেকে সবাইকে মানা করছি।

শঙ্কর হাসিয়া টুল টানিয়া উপবেশন করিল।

হিরণদা হাঁকিলেন, নবীন, এক কাপ চা।

ডাক্তার মুখার্জী আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব'স ব'স, দাঁড়িয়ে উঠলে কেন সব? শঙ্কর, তোমার চাকরি ঠিক ক'রে এলুম, 'সংস্কারক' আপিসে প্রূফ-রীডার, মাসে চল্লিশ টাকা ক'রে পাবে। আপাতত ওইতেই ঢুকে পড়—তারপর দেখা যাবে।

'সংস্কারক' কাগজে তাহার চাকরি হইয়াছে! শঙ্কর নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। হীরালাল মজুমদার সম্পাদিত 'সংস্কারক' কাগজে! ইহা যে সে কল্পনাও করে নাই।

কয়েক দিন পরে শঙ্কর, ভন্টু ও মৃন্ময় গড়ের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। খানিকক্ষণ নীরবতার পর ভন্টু বলিল, ঝুলে তো পড়লাম ভাই খুজবুজকে নিয়ে, এখন অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

ভন্টুর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দুমতীকে লাগছে কেমন?

উচ্ছ্বসিত ভন্টু বলিল, চমৎকার ভাই, ঠিক মাখন-লদ্‌কানো টোস্টের মত, বেশ নরম নরম অথচ মুচমুচে। বিড়্‌ডিকার তো একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তুই অমিয়াকে আনছিস কবে?

শিগ্‌গিরই আনব।

এনে ফেল্‌।

মৃন্ময় একটি কথাও বলে নাই, চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

ভন্টু ভাবিতেছিল ইন্দুমতীর কথা, তাহাদের অবস্থা-পরিবর্তনের কথা, নূতন গহনা পাইয়া বউদিদির আনন্দের কথা। এতদিন দুঃখে কাটাইয়া বউদিদি এইবার বোধ হয় সুখের মুখ দেখিতে পাইলেন।

শঙ্কর ভাবিতেছিল সাহিত্যের কথা। 'সংস্কারক' পত্রিকার সংস্পর্শে সে যখন আসিতে পারিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি! শেক্‌স্‌পীয়ার, দান্তে, টলস্টয়, ডস্টয়েভ্‌স্‌কি··· মহিমান্বিত, মূর্তিগুলি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতেছিল··· বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ··· এই দেশের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কল্পনা-বিহঙ্গম মৃত্তিকা ছাড়িয়া বহু উর্ধ্বলোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥